দু'একটি কথা

বিদগ্ধ সমালোচক, অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় অনেক যত্নে বহু সময় ব্যয় করে এই বিশেষ পর্যায়ের গল্পগুলি নির্বাচন করেছিলেন। কোন বিখ্যাত প্রকাশকের অনুরোধে তিনি কার্যটি সম্পন্ন করেছিলেন। একটি অতি শোভন সংস্করণের আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে ভূমিকা পর্যন্ত মুদ্রিত হয়ে প্রকাশকার্য বন্ধ করা হয়। অতঃপর রথীন্দ্রনাথ রায়ের অকাল মৃত্যু ঘটে। বইখানি বিস্মৃতির মধ্যেই ছিল।

সম্প্রতি বইটি প্রকাশে তৎপর হ'লাম। দুঃখের বিষয় নির্বাচক স্বয়ং স্বরচিত ভূমিকা সম্বলিত 'প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ' দেখতে পেলেন না। এটাই অপরিসীম ক্ষোভ গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষে।

৭৩, সাদার্ন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-২৯

রথীন্দ্রনাথ রায়ের পবিত্র স্মৃতি সহ তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী
অধ্যাপিকা ডক্টর ভারতী রায়ের করকমলে—

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে ছোটগল্প যে অল্পকালের মধ্যেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ বিষয়ে আজ সন্দেহের অবকাশ নেই। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের জন্মদাতা রবীন্দ্রনাথ। 'ছোট প্রাণ ছোট কথা'-কে তিনি জীবনের নানাদিক থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরেও বাংলাগল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি। জীবনের অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের উপরেও পড়েছে নবীন-সন্ধানী দৃষ্টির আলোকচক্র। শুধু বিষয়ের নূতনত্বই নয়, টেক্‌নিকের নূতনত্বও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে শ্রীমতী বাণী রায় একটি নূতন স্বর সংযোজিত করেছেন—সে স্বর যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি নবীন সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত। জীবনসত্যের দুঃসাহসিক অনুসন্ধান, সংস্কারমুক্ত মনের স্পর্ধিত পদক্ষেপ, প্রকাশরীতির সুমার্জিত ও অকুণ্ঠ দীপ্তি, বৈচিত্র্যসন্ধানী মনের নূতন নূতন রূপচর্চার বলিষ্ঠ অভিযান, তাঁর শিল্পকে যে বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছে তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীমতী রায় দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্তভাবে লেখনী সঞ্চালন করেছেন। সাহিত্যের বিচিত্রক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। কিন্তু সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের এমন একটি সহজ প্রত্যয় ছিল, যা অনায়াসেই চিনিয়ে দিয়েছিল যে তিনি কারো প্রতিধ্বনি নন—নজির মিলিয়ে অভ্যস্ত পথে পা টিপে টিপে সতর্কভাবে চলা তাঁর স্বভাব নয়। জীবনের অকুণ্ঠ সত্যভাষণ যেখানে দ্বিধাগ্রস্ত, নীতিকথা ও চিরাচরিত সংস্কার যেখানে সত্যকে বিভ্রান্ত করে, আদর্শের নামে যেখানে জীবনের পায়ে জড়তার শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া হয়, শ্রীমতী রায় তার সঙ্গে কোনদিন আপোষ করতে পারেননি। শুধু আপোষ করেননি বললেও সবটুকু বলা হবে না—তিনি তার শতসংস্কারে আবদ্ধ প্রাচীন দুর্গদ্বারে আঘাত হেনেছেন।

গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালীর সমাজমানসে ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে গভীর পরিবর্তন এলো, 'কল্লোল' পত্রিকায় তার সম্ভাবনাদীপ্ত আত্মপ্রকাশ ঘটলো। প্রচলিত সংস্কারের মূলে আঘাত হেনেছিলেন এই পত্রিকার সাহিত্যিকব্রতচারীরা। যে নীতি ও আদর্শবাদের রঙীন কুয়াশায় নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এতকাল মণ্ডিত

ছিল, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের রঞ্জনরশ্মি তাকে ভেদ করে জীবনের নূতন উপকরণ আহরণ করেছে। 'কল্লোল' বাংলাসাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ধ্বনিত হয়েছিল এক দুর্বার জীবনদ্রোহ। কিন্তু জীবনের সহজ স্রোতকে রুদ্ধ করে যে অচলায়তন দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। স্বল্পায়ু 'কল্লোলের' কলধ্বনি ব্যর্থ হয়নি। অনুকূল মুহূর্তে এক-একটি করে তার স্বপ্ন সফল হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে জীবন আর এক নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার আনুষঙ্গিক নানা বিপর্যয় জীবনের মূল্যবোধকে নির্মম পীড়নে লাঞ্ছিত করেছিল। 'কল্লোল' যুগে যার সূত্রপাত ঘটেছিল এই পর্বে তার প্রৌঢ় পরিণাম অগ্নি অক্ষরে স্বাক্ষরিত হলো। সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমতী রায়ের আত্ম-প্রকাশ এই লগ্নেই। বাংলা ছোটগল্প তার বহু আগেই কৈশোরদশা অতিক্রম করেছে। সুতরাং লেখিকা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশের আগেই বাংলা ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করেছে, কয়েকজন শক্তিশালী লেখক তাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। তবু লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন নিজের কথা বলার জন্যই, যা আর কারো পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। তীক্ষ্ণ মননশীলতা, অধ্যয়ন-পরিশীলিত সুমার্জিত মন ও অভিজাতরুচি বৈদগ্ধ্য নিয়ে তিনি আধুনিক জীবনের একটি অনাবিষ্কৃত দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতের' 'নরনারী' রচনায় পাঞ্চভৌতিক সভার অন্যতম সভ্য সমীর বলেছিল : "আমার মুরের নায়িকা আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক না কেন, রেভন্স্বাডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার কাছে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়।" সমীরের মন্তব্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য নারীচরিত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সন্দেহ নেই। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিহৃদয়ের দ্বন্দ্বে নারীচরিত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, পুরুষের দৃষ্টিতে নারীচিত্তের সবটুকু ধরা পড়া সম্ভব নয়। অপর পক্ষে মহিলা ঔপন্যাসিকদের হাতেও নারী-জীবনের বিচিত্রবিকাশগুলি রূপায়িত হয়নি। নীতি ও আদর্শবাদের আতিশয্য

তাঁদের বাধা দিয়েছে। যে দেশে পুরুষদের পক্ষেই সংস্কারকে অতিক্রম করতে বেগ পেতে হয়েছে, সে দেশে মেয়েদের পক্ষে যে তা কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এইখানেই শ্রীমতী রায়ের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বিদ্যুৎবহ্নিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক নারীসমাজ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের তিনি অভ্রান্ত ও নিপুণ রেখায় বিশ্লেষণ করেছেন। প্রেমকে কেন্দ্রশক্তি হিসেবে স্থাপন করে তিনি নর-নারীর সম্পর্কবৈচিত্র্যকে নির্মম সত্যনিষ্ঠায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমের বর্ণবিচিত্র রোমান্স রস, মিলন-বিরহের অনির্বচনীয় লিরিক মূর্ছনা, আদিম পাশবৃত্তি, ঈর্ষা-জিঘাংসার কুটিল ভ্রূভঙ্গি, নিষ্ঠুর নাটকীয় অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স ও নির্মমতম ট্র্যাজেডি মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতর আলোছায়া-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বাণী রায়ের গল্পের নায়িকারা বাংলা কথাসাহিত্যের নূতন নায়িকা। সমাজে তাদের কিছু আগেই দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যে তাদের এই প্রথম প্রবেশাধিকার ঘটলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ধাপের ছাত্রীসমাজের প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্মম উপসংহার, রূপহীন দরিদ্র স্কুল শিক্ষয়িত্রীর জীবনে প্রেমনিয়তির কঠিন বিদ্রূপ, অভিজাত ঘরের অকাল-বিধবা কন্যার অবদমিত কামনা, বিধবা প্রৌঢ়া মহিলার উন্মত্ত স্বৈরিণী-প্রেম, আরণ্যক জীবনের বন্য আবেষ্টনীতে শিক্ষিতা প্রৌঢ়া কুমারীর আদিম ব্যাঘ্রসত্তার কাছে উদ্দীপ্ত আত্মসমর্পণ, প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী বর্ষীয়সী কুমারীজীবনে বঞ্চনার বেদনা, উচ্চশিক্ষিতা প্রতিভাদীপ্তা নারীর মর্মান্তিক আত্মাহুতি—প্রভৃতি নারীজীবনের প্রেমকেন্দ্রিক ও মনস্তত্ত্ব নির্ভর মুহূর্তগুলি বাণী রায়ের গল্প যেমন অকুণ্ঠ সত্যভাষণে ও সংস্কারাহিত্যে দুঃসহ-সুন্দর করে তুলেছে, বাংলাসাহিত্যে তা দুর্লভদোসর। অনেকগুলি গল্প উত্তমপুরুষে রচিত হওয়ার জন্য জীবন্ত ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে। নারীসুলভ সংস্কার তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি—তাঁর নায়িকারা তাই যখন আত্মকাহিনী বলেন তখন কোনো কিছুই অনুচ্চারিত থাকে না। নারীর মুখে এমন বলিষ্ঠ অকপট সত্যভাষণ বাংলাসাহিত্যে এর আগে দেখা যায়নি। চিরপুরাতন বিষয়কে যেমন নূতন করে তৈরী করার দুঃসাহস তাঁর আছে, তেমনি নারীজীবনের অনেক অজ্ঞাত রহস্যকেও তাঁর সন্ধানী মনের আলো উদ্ভাসিত করে তুলেছে। যুগজীবনের সংগ্রাম, গ্লানি ও সংশয় যেমন তাঁর জীবনচিত্রণের পটভূমি রচনা করেছে, তেমনি এর অন্তরালে চিরন্তন কালের রাগিণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

অতিরিক্ত আত্মসচেতনা, প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী আধুনিকী নায়িকার অনাবিষ্কৃত জীবনরহস্যের জটিল গ্রন্থী এখানে উন্মোচিত হয়েছে—বিশ্লেষণ-নিপুণ মনের অতির্যক রশ্মিরেখা আদিম 'আফ্রিকা-হৃদয়ের' কুমারী-মৃত্তিকায় এক অবিস্মরণীয় আগ্নেয় স্বাক্ষর এঁকেছে।

'পুনরাবৃত্তি' বাণী রায়ের প্রথম গল্প-সংকলন। প্রথম সংকলনেই লেখিকার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান। বক্তব্য বিষয় ও বলার টেক্‌নিক্ দুই-ই অভিনব। বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। তাই গল্পগুলির তীক্ষ্ণশাণিতদীপ্তি চকিত বিস্ময়ে অভিভূত করে। সংকলনটির প্রথম গল্প 'লুক্রেশিয়া' যখন 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন বিস্মিতপাঠকদের অনেকেই একে কোনো ছদ্মনামা পুরুষের লেখা বলে সন্দেহ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় পুরাণকাহিনীকে বাংলাদেশের আধুনিক সমাজ জীবনের পাশে সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হয়েছে। লেখিকা পাশ্চাত্যপুরাণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন আধুনিক বাঙালী সমাজের মধ্যে। পটভূমিকা ও যুগের পরিবর্তন ঘটলেও উভয়কাহিনীর মধ্যে একটি চিরন্তন ঐক্যসূত্র আছে। সেই সূত্রটিকে লেখিকা মনস্বিতার সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন। মূলকাহিনীর চারদিকে প্রাচীন পুরাণের যে রোমাণ্টিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে, তা কাহিনীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটকীয়তায় মণ্ডিত করেছে। একটি বর্ণসমুজ্জ্বল তৈলচিত্রের যেন কারুখচিত মূল্যবান ফ্রেম। অথচ ফ্রেমটিকে নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী বলাও চলে না, কারণ চিত্রের গৌরব ও ফ্রেমের গৌরবকে স্বতন্ত্র করে দেখা সম্ভব নয়।—

বর্তমান সংকলনটিতে পুনরাবৃত্তির চারটি গল্প স্থান পেয়েছে। লুক্রেশিয়া গল্পে মালিনী সেন, প্রবীর গুহ ও অমর সোম—তিনটি চরিত্র কেন্দ্র করে প্রেমের ত্রিভুজ রচিত হয়েছে। অমর সোম মালিনীকে ভালবাসে, সে ভালবাসা নীরব পূজার মতোই—প্রতিদান সে কোনোদিনই পায়নি। মালিনী প্রবীর গুহের প্রেমে অন্ধ। অমরের নিষেধ সত্ত্বেও প্রবীরের জ্বলন্ত কামনার কাছে সে আত্ম-সমর্পণ করেছে। অসম্মানিতা প্রেমিকার কাছে প্রতিজ্ঞা করে অমর সোম গভীর রাত্রিতে প্রবীর গুহকে আহত করেছে। কাহিনীর এই সামান্য সূত্রাংশ অবলম্বন করে প্রাচীন রোমান ইতিহাসের একটি বেদনারঞ্জিত অধ্যায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কলোটিনাস-বনিতা লুক্রেশিয়াকে কলোটিনাসের অনুপস্থিতিতে সেক্সটাস নারীজীবনের চূড়ান্ত অসম্মান ক'রে তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছিল। সেই প্রাচীন রোমান কাহিনী আধুনিক জীবনের ব্যঞ্জনায় নবমূর্তি ধারণ করেছে।

শেক্সপীয়রের অমর কাব্যের মহিমা বাংলাদেশের একটি সাধারণ প্রেমকাহিনীকে যে 'চিত্তবিস্ফারক' দুরত্ব দিয়েছে তার তুলনা নেই। প্রাচীন রোমের একটি রোমাঞ্চকর অশ্রুগম্ভীর কাহিনী আধুনিক কলকাতার সমাজ জীবনে তার দোসর খুঁজে পেয়েছে। উপসংহারে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি টাইবার তীরবর্তী প্রাচীন রোম ও গাঙ্গেয় কলকাতার মধ্যে যে যোগসূত্র রচনা করেছে তার তীক্ষ্ণ ও বেদনাময় ইঙ্গিত গল্পটিকে শিল্পসমুজ্জল করে তুলেছে: "রোমের প্রাচীন গাথার ও মহাকবি শেক্সপীয়রের কাব্যে একটি ভুল ছিল, আমার জীবনে সংশোধন হইয়া গিয়াছে। আমার লুক্রেশিয়া আজীবন সেক্সটাসে আসক্তা।" —এই বেদনাদীর্ণ দীর্ঘশ্বাসই গল্পটির যথার্থ ফলশ্রুতি।

মীডিয়া অচরিতার্থ প্রেমের জন্য নির্মমতম প্রতিহিংসার কাহিনী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রী কঙ্কা জয়ন্তকে ভালোবাসে। কিন্তু অভিভাবকদের নির্দেশ ও কঙ্কার পিতৃপরিচয় জয়ন্তকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। জয়ন্তের সঙ্গে এক জমিদার কন্যার বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ-বাসরে জয়ন্তের নব-পরিণীতার সুন্দরমুখে নাইট্রিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করেই সে ক্ষান্ত হয়নি তার কাছে লেখা জয়ন্তের চিঠিগুলিও সেইসঙ্গে নব পরিণীতাকে উপহার দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। এই কাহিনীর সঙ্গে গ্রীকপুরাণের মীডিয়ার কাহিনীকে নিপুণ কৌশলে সূত্রান্বিত করা হয়েছে। ঈটিসের রাজ্য থেকে, জেসন মীডিয়ার যাদুবলেই স্বর্ণ মেষরোম অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু অকৃতজ্ঞ জেসন পত্নী ও পুত্রদ্বয়কে ত্যাগ করে করিন্থ রাজকন্যাকে বিবাহ করে। মীডিয়া-প্রেরিত বিষাক্ত পোশাক পরে তার সপত্নী দগ্ধ হয়েছেন, স্বহস্তে সন্তান হত্যা করে সে স্বামীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। গ্রীকনাট্যকার ইউরিপিডিসের মীডিয়া দেশ-কালকে অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় নবজন্মলাভ করেছে। গ্রীকপুরাণের প্রতিহিংসা-পরায়ণা সন্তানহন্ত্রী মীডিয়ার অশান্ত আত্মা নিখিল নারী হৃদয়ে আজো সর্বনাশা আগুন ছড়ায়। গল্পরচনার এই পরীক্ষামূলক শিল্পকৌশলটি এখানে সার্থক-তরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। 'লুক্রেশিয়া' গল্পে মূল গল্পাংশের সঙ্গে গ্রীক কাহিনীর সংযোজনের মধ্যে যতটুকু ফাঁক ছিল এখানে ততটুকু ফাঁকও নেই। ঈটি সদুহিতা মীডিয়ার সঙ্গে চণ্ডালকন্যা কঙ্কার কোনো পার্থক্য নেই। গল্পটি চরিত্রপ্রধান কঙ্কা চরিত্রের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব রসই গল্পটির প্রধান আকর্ষণ। লেখকা যেন পাষাণশিলায় মূর্তিটি খোদাই করেছেন। কঙ্কা চরিত্রের আরম্ভ ও পরিণতির মধ্যে একটি নিগুঢ় সামঞ্জস্য আছে। নাইট্রিক অ্যাসিড এখানে যেন বাইরের

কোন রাসায়নিক পদার্থ নয়, কঙ্কার ধ্বংসকরাল ব্যক্তিসত্তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র তার চরিত্রের মধ্যেই বজ্র-বিদ্যুতের জ্বালাময় সম্ভাবনা ছিল। পিতৃপরিচয় ও বাল্যকালের ইতিহাস সংযুক্ত হয়ে এই সম্ভাবনাটিকে নিগূঢ় করে তুলেছে।

'সেমেলি' গল্পটি এক তরুণী শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এক বিবাহিত ও সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রৌঢ় পুরুষের প্রেমকাহিনী। তরুণী তার অধিকারের বাইরে পা বাড়িয়েছিল—ফলে তার জীবনে নেমে এলো নিষ্ঠুর অভিশাপ। মানসিক অশান্তি দৈহিক অসুস্থতায় পরিণত হলো। স্কুল থেকে দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য পাড়াগাঁয়ে বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রৌঢ় পুরুষের কামনাবহ্নি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে সে ভস্মীভূত হয়েছে। থিবস্ রাজদুহিতা সেমেলির প্রেমজীবনের বিষাদময় পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই কাহিনীতে। বহুবল্লভ দেবরাজ জুপিটার এই তরুণী রাজকন্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। জুপিটার প্রেমের খেলায় নিপুণ, তিনি 'নিজমূর্তি কোমল-মাধুর্যে ধরা দিয়েছিলেন।' কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণা জুপিটার পত্নী জুনোর মন্ত্রণায় সেমেলি প্রণয়ীকে তাঁর স্বরূপ মূর্তিতে দেখতে চেয়ে তাঁর বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে। 'সেমেলি' গল্পটিতে জুনো অদৃশ্য—কিন্তু এখানে অদৃশ্য জুনোর 'আপাদমূর্তির প্রতিকৃতি'ই যথেষ্ট। প্রণয়নিপুণ বাঙালী জুপিটারের প্রৌঢ়মূর্তি ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহনশক্তি গভীর রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। রোগজর্জরিতা তরুণী শিক্ষয়িত্রীর বাঙালী মেয়ে সেমেলির আত্মকাহিনীর আকারেই গল্পটি গড়ে উঠেছে। শিল্পকৌশলটিও অভিনব। সাঁওতাল পরগণার নির্জন পরিবেশে প্রসাধন-টেবিলের সম্মুখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে—স্বচ্ছ মুকুরে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে তার দুঃসহ প্রেমের ইতিহাস বলে চলেছে। কিন্তু গল্পটির শেষে লেখিকা যে নূতন প্রেমের আশ্বাস দিয়েছেন, তা বাহুল্যমাত্র—এই অংশ বর্জিত হলে গল্পটি তীক্ষ্ণতর হতো।

'সাফো' গল্পে একজন দরিদ্রা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর প্রেমবুভুক্ষু জীবনের আচরণ ও নিষ্ঠুর পরিণতির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মন্দিরা সেনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-অচরণ ছিল পুরুষোচিত। দেহে মনে তার ছিল অস্বাভাবিক প্রবণতা। নারী হয়ে নারীর সঙ্গে মিলনেই ছিল তার রুচি। প্রকৃতিই তাকে চরম শাস্তি দিয়েছে। অনলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মেলামেশার পর মন্দিরার হৃদয়ে সর্বপ্রথম প্রেমের একটি নূতন অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তার এই নব-জাগ্রত অনুভূতি অনলের রূঢ় প্রত্যাখ্যানে আহত হয়েছে। সে আত্মহত্যা করে তার বহুনিন্দিত ও বিড়ম্বিত জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। মন্দিরার বিষাদাচ্ছন্ন

ও অস্বাভাবিক জীবন গ্রীক্‌ কবি সাফোর জীবন-ব্যঞ্জনায় নবরূপ লাভ করেছে। লেসবসের মহিলা কবি সাফোর জ্বলন্ত প্রেম, অস্বাভাবিক সমকামিতা, ফেরি-ঘাটের মাঝি ফায়নের প্রতি তীব্র আসক্তি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর মিটিলেনীর নীল সমুদ্রজলে আত্মবিসর্জন—সাফোর জীবনবৃত্তের অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রটি ধরে বহু রোমাণ্টিক আখ্যায়িকা রচিত হয়েছে। এই বিশ্ববন্দিতা মহিলা কবির সঙ্গে বাংলাদেশের দরিদ্রা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে অনেকখানি। কি অস্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রেমজীবনের ব্যর্থতা—এই দুটি সূত্রে একটি গভীর ঐক্যও আছে। কাহিনীর উপসংহারে লেখিকার প্রতিপাদ্য বিষয়টি দেশকাল অতিক্রম করে একধ্রুবোজ্জ্বল রেখায় উদ্ভাসিত: "সহস্র বৎসর পূর্বে সাফো মরিয়াছিল। আজ মন্দিরা মরিল। গ্রীক্‌ নারীর মদিরালাবণ্য, বহু বন্দিতার বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা, কিছুই তাহার ছিল না। সে ছিল অনাথা দরিদ্র স্কুল শিক্ষয়িত্রী" তবু উভয়ের একই পরিণতি।

আধুনিক জীবনের নানা জটিল সমস্যা শিক্ষিত নারীসমাজের মধ্যেও যে বহুবিচিত্র বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তা শ্রীমতী রায় নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রাচীন আদর্শবাদ ও মূল্যবোধের প্রতি কোনো আস্থা নেই। জীবন যে মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল, সে মাটি ফেটে চৌচির হয়েছে। তাই জীবন সম্পর্কে 'সীরিয়াস' হতে পারছে না কেউ. ক্ষণসুখবাদ নিয়েই তারা তৃপ্ত। 'পঞ্চকন্যা' গল্পে আধুনিক পঞ্চকন্যার সান্ধ্য বৈঠকের কাহিনী শোনানো হয়েছে। বালি-গঞ্জের ব্যারিষ্টার-দুহিতা সুলেখা রায় ও তার চারজন বান্ধবীর আন্তরিক কথোপকথন থেকে এ যুগের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পঞ্চকন্যার রূপগুণের অভাব নেই—কিন্তু সকলেই অবিবাহিতা। অবশ্য সকলের সমস্যা এক নয়, কিন্তু এক জায়গায় এসে সকলেরই থামতে হয়েছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অত্যধিক বিচার-প্রবণতা তাদের মনকে সংশয়াচ্ছন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। আধুনিক যুগের বিষ তাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করেছে—জটিলতার চক্রান্তজালে তারা জীবনের সহজ পথ হারিয়ে ফেলেছে। গল্পের শেষে লেখিকার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটিতে এ যুগের শিক্ষিতা কুমারীদের জীবন সমস্যার নূতন ভাষ্য: "হায় আধুনিকী। তোমরা ভুলে যাও তোমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচারশক্তি, আদর্শবাদ। তরল ভাবপ্রবণতা তোমাদের সুখী করবে, মূঢ় ভালবাসা পথ দেখাবে। নির্বিকার নারীত্বে তোমাদের মুক্তি। জনারণ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের মানুষকে কি চিনে বার করা যায়? মনের মানুষ মনেই থাকে।

সমস্যা তোমাদের জটিল। বিবাহ ও প্রেম এক নয়। সেকালের মন নিয়ে হয়তো অজ্ঞান হবে, কিন্তু অসুখী তো হবে না।" লেখিকার বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে যুগব্যাধির স্বরূপ ও তার নিদান—দুই-ই উদ্ভাসিত হয়েছে।

অসঙ্গতি থেকেই ব্যঙ্গ ও শ্লেষপ্রবণতা জন্মগ্রহণ করে। আধুনিক সমাজ জীবনের বিপর্যয় নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের মধ্যেও নানা অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। প্রেমের ছলা-কলা, বেহায়াপনা ও চটুলতাকে বাণী রায় ব্যঙ্গের অব্যর্থ শরসন্ধানে ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে জর্জরিত করে তুলেছেন। প্রেমজীবনের হাস্যকর অসঙ্গতিকেও তিনি বিদ্রুপাত্মক মনোভঙ্গির দ্বারা রূপ দিয়েছেন। 'খেলা নয়' গল্পটি এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ঊনত্রিশ বছরের প্রণয়কলাভিজ্ঞা বিবাহিতা নারী শ্রীমতীর সঙ্গে একুশ বছরের তরুণ জর্জির সম্পর্কের কোনো গভীরতা বা চিত্তআলোড়নকারী রহস্য নেই। শ্রীমতী নিঃসন্তানা, স্বামী কর্মোপলক্ষে প্রবাসী। সুতরাং এই তরুণকে কিছুকাল প্রেমের খেলায় দীক্ষিত করার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তার। জর্জির মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। পাশের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে শ্রীমতীর কাছে প্রেমের দীক্ষা গ্রহণের দিকে তার অধিকতর রুচি দেখা গেল। কিন্তু একদিন শ্রীমতী বুঝতে পেরেছে যে জর্জিও তার সঙ্গে আগাগোড়াই অভিনয় করে চলেছে—প্রেম সম্পর্কে জর্জির কোনো কিছুই জানতে বাকি নেই, এতকাল সে শুধু অজ্ঞতার ভান করেছে। গল্পটির এই অংশে যে কঠিন শ্লেষ আছে, তাই এর প্রাণ। কিন্তু জর্জির মনোভাব জানার পরেও শ্রীমতী পিছিয়ে আসতে পারেনি। কারণ তার যৌবনের ভাঁটার মুহূর্তে "একমাত্র যৌবনের অভিনন্দন, যুবকের মোহই তাকে আশ্বাস দিতে পারে—শ্রীমতী, তুমি এখনো মরো নি।" চটুল প্রেমের কয়েকটি লঘু-চপল রেখা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের তীক্ষ্ণতায় সমুজ্জ্বল। লেখিকার এই কৌশলটি ফরাসী গল্পের টেক্‌নিক স্মরণ করিয়ে দেয়।

'আবিষ্কার' গল্পে চাকুরীজীবি মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের বিচিত্র অনুভূতি ও বেদনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। সাতাশ বছরের তরুণী সুমিত্রা একটি অ্যাড-ভারটাইজিং এজেন্সির উপরের দিকের অফিসার। পাচক-দাস-দাসী নিয়ে সে থাকে—অর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যেরও কোন অভাব নেই। সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত, সাধারণ মেয়ে সুধীরা বিবাহবন্ধনের মধ্যে তাদের জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। নিঃসঙ্গ সুমিত্রা তার বুদ্ধিবৃত্তি, গাম্ভীর্য ও বিচারশীল মন

নিয়ে এমন কাউকে খুঁজে পায়নি যাকে বিবাহ করা চলে। প্রদীপের রোজগার তার চেয়ে কম, কোনোদিনই সুমিত্রা তাকে যোগ্য মনে করেনি। কিন্তু এই বিচারপ্রবণতা তার জীবনকে জটিল ও অসুখী করে তুলেছে। দ্বন্দ্ব-জর্জরিতা সুমিত্রা সর্বশেষে নিজেকে আবিষ্কার করেছে—আত্মঘাতী আত্ম-কেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে নিজের অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা জানতে পেরেছে। তাই, সে যাকে এতকাল অতি সাধারণ মনে করেছে, সেই প্রদীপের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চায়: "আমি চাই অসংখ্য পরিজনকে অসংখ্য স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে; তাদের জন্য প্রাত্যহিক ত্যাগ স্বীকার ও অসুবিধা অনটনের মধ্যে আমার অতৃপ্ত অন্তরের অপরিসীম ভালবাসার প্রবৃত্তিকে ধন্য করতে। নিজেকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমার পূর্বে সহস্র নারী যা করেছে, আমার পরে সহস্র নারী যা করবে, আমিও তাই করতে চাই। একটি সাধারণ ছকের অঙ্গীভূত হয়ে জীবনের জটিলতাকে অতিক্রম করতে চাই।" গল্পটি কড়া রংয়ের ও চড়া সুরের নয়, ঘটনার নাটকীয় বৈচিত্র্যও কিছু নেই, কিন্তু একটি নারী চিত্তের নিঃসঙ্গ বেদনা যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তাকে বিরল রেখায় ও লঘু স্পর্শ তুলিতে রূপ দেওয়া হয়েছে।

'উপলব্ধি', 'প্রহর হলো শেষ' গল্প দুটির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্য আছে। নায়িকা দু'জনা এক শ্রীমতী। সম্পন্ন ঘরের বিবাহিতা বন্ধ্যা নারীর যৌবনা-বসানের বিচিত্র চেতনা গল্প দুটিতে একটি বিষণ্ণ মূর্ছনার সৃষ্টি করেছে। 'উপলব্ধি' গল্পে সৌখীন মানসিক বিলাস ও উন্নাসিক আভিজাত্য দিয়ে শ্রীমতীর দিনগুলি অলস-মন্থর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল। মনোরমার শ্বশুরবাড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আসতে হয়েছে। সেখানকার দারিদ্র্য ও শ্রীহীনতা পদে পদে তাকে সংকুচিত করেছে। মনোরমার কণ্ঠে গান শুনে তার দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের মধ্যেও বন্ধ্যা শ্রীমতী এক অপূর্ব সুন্দর পরিপূর্ণতার আস্বাদন পেয়েছে— সে বুঝতে পেরেছে—"যে দিতে জানে সে বেদনার মধ্যেও দিতে পারে, নিতে পারে।" গল্পটির মধ্যে শ্রীমতীর প্রতিক্রিয়ার বিশেষ কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনায় সেই অনির্বচনীয় বেদনাটিকে সঞ্চারিত করা হয়েছে। এর পরের কাহিনী অনুমান-নির্ভর। তুচ্ছ মানসিক বিলাস থেকে প্রকৃত বেদনার জন্ম হলো—সেই অকথিত কাহিনীর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রতিধ্বনিত হবে বন্ধ্যানারীর যৌবনান্তিক বেদনা।—'উপলব্ধি' গল্পে যার ব্যঞ্জনাদীপ্ত চকিত উপলব্ধি, 'প্রহর হলো শেষ' তারই পরবর্তী কাহিনী। এখানে ব্যঞ্জনা নয়, ব্যাখ্যা। স্বামীর ট্যুরের

চাকরী—শ্রীমতী তাই দীর্ঘকাল পিত্রালয়ে বাসে অভ্যস্ত। পিত্রালয়ে ভক্তদের কণ্ঠে তার রূপবন্দনার উচ্ছ্বসিত হয়। স্বামীর পদোন্নতির পর যখন স্থায়ী চাকরীর পাকা ব্যবস্থা হলো, তখন শ্রীমতী এলো স্বামীর ঘর করতে। স্বামীগৃহেও তার শূন্যতা ঘোচে না। শ্রীমতী এতকাল খেলা করেছে, কিন্তু লেডী ডাক্তারের কাছে তার সন্তান ধারণের অক্ষমতার কথা শুনে সর্বপ্রথম তার বেদনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। গল্পটির সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ হলো বিমান ও শ্রীমতীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ক বৈচিত্র্যের মনস্তত্ত্ব-সম্মত স্বল্পায়তন চিত্রটি।

বিবাহিতা নারীর প্রেমহীন সন্তানহীন জীবনে শূন্যতার বেদনাকে যেমন বাণী রায় দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি বিগত যৌবনা কুমারী-জীবনের অতৃপ্তি, অবসাদ ও অনুশোচনা তাঁর লেখনীস্পর্শে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'তারপর' গল্প এক বিগত যৌবনা চিত্রতারকার মানস-রূপান্তরের কাহিনী। এককালে উদ্ধত যৌবন তাকে অসামান্য করে তুলেছিল। কিন্তু আজ তার উপর পড়েছে আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের বিবর্ণ প্রেতচ্ছায়া, প্রসাধনের সাধনাতেও যাকে আর ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। তাই এই বিগতযৌবনার প্রেম-লোলুপতার সুযোগ নিয়ে রঞ্জন মিত্রের মতো সাধারণ যুবকরাও অভিনয় করে। চিত্রার এই যৌবনাস্তিক বেদনাকে লেখিকা এক নূতন স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৃদ্ধ কীর্তনীয়াব যে পদ তার একসঙ্গে বিরক্তি উৎপাদন করেছিল, সেই পদই আর তার কণ্ঠে 'সস্নেহ্ করুণতায় অপূর্ব হয়ে উঠল'। 'পরাণের পরাণ নীলমণী'-কে ঘিরে যশোদার বাৎসল্যস্নিগ্ধ মিনতি তার কণ্ঠে ভাষা পেল—মাতৃত্বের রসে পূর্ণ হয়ে উঠলো রঙ্গনটীর হৃদয়। চিত্রা জনতার প্রেয়সী, সে কোনদিনই জনকে ভালবাসতে পারেনি। যৌবন হারিয়ে ভালোবাসার মুল্য সে বুঝতে পেরেছে—সে উপলব্ধি দয়িতের প্রেমালিঙ্গনের মধ্য দিয়ে আসেনি, এসেছে বাৎসল্যের প্রশান্ত মহিমার ভিতর দিয়ে।

'বেসিক ট্রেনিং' গল্পের নামকরণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সংযুক্তার জীবনে অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা কোনো কিছুর অভাব সেই। কিন্তু হৃদয়ের পিপাসা তাতে মেটে না। প্রেমহীন জীবন ও সন্তানহীন গৃহ তার কাছে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। অনিয়ন্ত্রিত সম্ভোগসংকুল জীবনস্রোতে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। প্রেমের জন্য এতটুকু দুঃখবরণ করতেও সে প্রস্তুত ছিল না। জীবনের সেই বেসিক ট্রেনিং-এর অভাবেই প্রতিভাময়ী- সংযুক্তার জীবন ব্যর্থ হলো। 'ওল্ড মেড্'-দের জীবনের এই জাতীয় ট্র্যাজেডি চিত্রণে বাণী রায় বাংলা গল্পে নূতন স্বর এনেছেন।

আধুনিক সমাজের প্রৌঢ় কুমারীদের জীবনের তিক্ততা, অবসাদ ও বিষণ্ণ ট্র্যাজেডি বাংলাসাহিত্যে আর কারো গল্পে এমন বিস্তৃত স্থান অধিকার করেনি।

মনস্তত্ত্বমূলক ছোটগল্পই আধুনিক যুগের গল্পকারদের সবচেয়ে বেশী আ কর্ষণ করেছে। ঘোরালো প্লট রচনার চেয়ে চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কারের দিকেই বর্তমান লেখকদের অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়। তাই আধুনিক যুগের মনস্তাত্ত্বিক গল্পে বাইরের ঘটনাকে অনেকখানি সংকুচিত করা হয়েছে। অন্ত-জীবনের অন্ধকার ভূখণ্ডে রহস্যসন্ধানী শিল্পীর কৌতূহলী পদক্ষেপ। ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরে মগ্নচৈতন্যলোকের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত পড়েছে। মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তন্তুজাল শিল্পের ক্ষেত্রেও অধিকার করেছে। বাণী রায় প্রেমজীবনে অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে মননশীলতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'ভ্যাম্পায়ার' গল্পটিতে তিনি নায়িকার জটিল মনের গহনে প্রবেশ করে যে অন্তর্দৃষ্টি ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। ধনীকন্যা অমিতা সহস্র-বন্দিতা। রূপমুগ্ধ পুরুষ তার পায়ে পৌরুষ এমন কি তার সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে চরম পরাজয় বরণ করে নেয়। বহু রূপমুগ্ধ পৌরুষের রক্ত শোষণ করে অমিতার ভ্যাম্পায়ার আত্মা পরিতৃপ্ত হয়নি। অথচ তথাকথিত লঘুচিত্তা বিলাসীনির পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না। অমিতার হৃদয়-বিশ্লেষণটি এখানে মনীষায় দীপ্ত, "তুমি যে ভীতিজনক, নিজের আত্মাকে শুধু হত্যা করিতেছ না, বহুকে হত্যা করিয়া রক্তশোষণ করিতেছ তুমি। অন্যকে হত্যা করিবার পাপ আত্মহত্যারূপে নিজের উপর আরোপ করিয়া কবিতা লিখিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিলাস—মন্দ উপায় নহে। মার্টার সাজিয়া নারীর চিরাচরিত মাসোকিষ্ট-বৃত্তি তৃপ্ত করিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিজের নিকট মহৎ প্রতিপন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত আছ।" আত্মপীড়নে বিচিত্র যৌনানন্দ (Masochism) ও মার্টার কমপ্লেক্সকে অবদমিত বাসনার সঙ্গে যুক্ত করে লেখিকা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অমিতার এই বিচিত্র আচরণকে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিধবা অমিতা প্রাচীন গলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু অভিজাততার রক্তধারা সমাজের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহ করতেও অক্ষম। তাই অবদমিত বাসনা রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। দুঃসাহসিক পদক্ষেপে ও মননশীলতায় গল্পটির তুলনা নেই।

সুবিদিত ইডিপাস্-কমপ্লেক্সকে বাণী রায় তাঁর 'রঞ্জনরশ্মি' গল্পটির মধ্যে রূপ দিয়েছেন। মৃত পুরন্দরের মৃতদেহকে ঘিরে তার কয়েকজন প্রেমিকার

স্মৃতিগুঞ্জন অবলম্বন করে কাহিনীটি বিন্যস্ত হয়েছে। বহুচারী পুরন্দর আসলে কাউকে ভালবাসতে পারেনি। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাই তার বিয়ে হয় নি। আসলে সে জীবনে একজন নারীকেই ভালোবেসেছিল—সে তার মা। তাই সে অনীতা মিত্রকে তার পাত্রী হিসাবে মনোনীত করেছিল—কারণ অনীতার সঙ্গে তার মায়ের ছিল অবিকল সাদৃশ্য।

মনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলির মধ্যে আর একটি অসামান্য গল্প 'কিড্'। এখানেও লেখিকা নিপুণতার সঙ্গে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছেন। সম্পন্ন গৃহের আদরিণী কন্যা এনাক্ষী রায় পঁচিশ বছর বয়সেও কিড্। পঞ্চভ্রাতা ও পিতামাতার স্নেহাতিশয্যে পূর্ণযৌবনা তরুণীর মনে ছিল শিশুসুলভ সরলতা। কিডের আচার-আচরণের মধ্যে সেই সরলতা ও ছেলেমানুষি প্রকাশিত হয়েছে—মা বাবা ও ভাইয়েরা তাতে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সুবীরের প্রেমসম্ভাষণেও কিড্ কোনোদিন সাড়া দেয়নি। কিড্ চরিত্রের দ্বৈতস্বরূপ সুবীরের বোন মল্লিকার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নারীর কাছেই নারীর ছলাকলা ধরা পড়ে। মল্লিকার কাছে কিডের আচরণ স্বার্থপরায়ণতা ও ন্যাকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। পসারহীন সদ্য ডাক্তার সুবীর মুখার্জিকে বিয়ে করার মধ্যে যে কি দুঃখবরণের সম্ভাবনা ছিল, আত্মসর্বস্বা সুবিধাবাদিনী কিড্ তা স্বীকার করে নিতে পারেনি, রূপবান জমিদারপুত্রের গলায় মালা দিয়েছে—নিশ্চিত সহজ জীবনের সহজ সুখ-বিলাসই তার কাম্য। কিড্ চরিত্রের দ্বৈতব্যক্তিত্বের চিত্রণে লেখিকা আশ্চর্য কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। স্বার্থসুখ ও জটিল অভিপ্রায়গুলি গোপন করার জন্যই কিড্ শিশুসুলভ সরলতার আচরণে নিজেকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করত। নারীমনের দুর্গম অন্তঃপুরে যে একটি জটিল ছায়া পড়েছে, বাণী রায় তাদের আবিষ্কার করেছেন, জটিলতার গ্রন্থিগুলি কখনো তির্যক ব্যঞ্জনায়, কখনো বা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে উন্মোচিত করেছেন। 'কিড্' গল্পটিতে কাহিনীবিন্যাসের মসৃণধারার অন্তরালে একটি বিদ্রূপে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আছে। মল্লিকা ও সুবীরের মন্তব্য যুক্ত হয়ে গল্পটি আশ্চর্য ভারসাম্য লাভ করেছে।

বাণী রায়ের গল্পে কামনার বিচিত্র শিখা নানারূপে উদ্ভাসিত। যেমন একদিকে এই কামনা ঊর্ধ্বলোকে গীতিউৎসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি পাতাল-জীবনের ক্লেদপিচ্ছিল অন্ধবিবরে প্রবেশ। শিক্ষা, বংশমর্যাদা. মানসিক অভিজাত্য প্রভৃতির আচরণে মানুষের আদিমপ্রবণতাগুলিকে ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু আদিম

জৈবানুভূতির সঙ্গে মানবসত্তা এক নিগূঢ় সম্পর্কে জড়িত। ডি-এইচ্-লরেন্স তাঁর একখানি চিঠিতে তাঁর জীবন দর্শনকে রূপ দিয়েছেন :

"My great religjon is a belief in the blood, the flesh as being wiser than the intellect. We can go wrong in our minds. But what our blood feels and believes and says, is always true. The intellect is only a bit and a bridle. What do I care about knowledge ? All I want is to answer to my blood, direct without fribbling intervention of mind, or moral, or what not."

লরেন্সকথিত এই 'রক্তের ধর্ম' তত্ত্বটির সঙ্গে মানুষের আদিম প্রবণতাগুলি অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থনে আবদ্ধ। বাণী রায়ের গল্পে শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না নারীজীবনে এই আদিম জৈবানুভূতি প্রবণতা অবিকম্পিত রেখায় ও দ্বিধাহীন বলিষ্ঠতায় আঁকা হয়েছে। 'অনার্য প্রেমিক', 'বার্নিং ব্রাইট', 'মাটির মূর্তি' গল্প তিনটিতে প্রেমের আদিম অসংস্কৃত মূর্তিকে অকপট সত্যনিষ্ঠায় রূপ দেওয়া হয়েছে। 'অনার্য প্রেমিক' এক সুশিক্ষিতা রুগ্না অবসিতযৌবনা কুমারীর স্মৃতিকাহিনী। প্রথম যৌবনে রেণুকাদেবী এক সাঁওতাল যুবকের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিলেন। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, আভিজাত অতিক্রম করে তিনি অসংকোচে এই আদিম 'রক্তের আহ্বানে' সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু রায়সাহেব পিতার শাসন ও রেণুকার শেষ মুহূর্তের মিথ্যাচরণ আর্য ও অনার্যের মাঝখানে চিরকালের জন্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। পর্বতমালা বেষ্টিত সাঁওতাল পরগণা পার্বত্য প্রদেশের জ্যোৎস্নামুগ্ধ রাত্রি, দক্ষিণা বাতাসে শালপুষ্পের মত্ত সৌরভ অনার্য প্রেমের এক কাব্যমণ্ডিত আদিম পটভূমি সৃষ্টি করেছে।

প্রেমের আদিম মাংসলোলুপ পশুসত্তা ও অসংস্কৃত বন্য কামনার অসহ্য-সুন্দর ধাতব-দীপ্তি তরাইয়ের পর্বতসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে যে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল, ব্যঞ্জনাগূঢ় মিতভাষণে তার লিরিক-লাবণ্য উদ্ভাসিত হয়েছে 'বার্নিং ব্রাইট' গল্পটিতে। গল্পটিতে লেখিকা এক সুপরিণত শিল্পপ্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এখানেও পটভূমি ও পরিবেশ মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। এই 'সেটিং' ছাড়া কুরুবকী মিত্রের আফ্রিকা-হৃদয়ের পাশব-কামনার ইতিহাস বিবৃত হতে পারত না। শ্রাবণের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা বন্য পরিবেশে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে—বোদেলেয়ারের কলুষকুসুমের প্রমত্ত সৌরভ আবহাওয়াকে আদিম কামনায় মন্থর করে তুলেছে। প্রৌঢ় কুমারী কুরুবকী এই মুহূর্তেই তার 'আফ্রিকা-হৃদয়ের' আবরণ উন্মোচিত

করেছে—যেখানকার মাংসলোলুপ বাঘের সবুজ চোখে জৈবক্ষুধার অসহ্য দহন। ফুল্লরার ছদ্মনাম নিয়ে কুরুবকী তার আত্মকাহিনী শুনিয়েছে। তরাইয়ের গভীর অরণ্যে জ্যাঠতুতো জামাইবাবু ও তাঁর পারিষদবর্গের বাঘ শিকারের সঙ্গী হয়েছিল সে। এই শিকারীর দলের মধ্যে ছিল এক পার্বত্যজাতীয় তাম্রবর্ণ দীর্ঘদেহ তরুণ শিকারী। কুরুবকী হলো তার লুব্ধ কামনার শিকার। সেই থেকে পাহাড়ী শিকারী চিরকুমারী কুরুবকীর একমাত্র সঙ্গী, তার কামনাঘন রাত্রির একমাত্র ভোগসহচর: "তরাইয়ের ব্যাঘ্রসত্তার নখদন্তের চিহ্নে প্রৌঢ়দেহ তার বিক্ষত। সেই আদিম বনবেষ্টনীতে যে স্বাদ তিনি পেয়েছেন, কোন শিক্ষিত ভদ্রপুরুষ তাঁকে সে স্বাদ দিতে পারবে না। কলুষকুসুম একবার যে ডালে ফুটেছে, সে ডাল দ্বিতীয় কুসুমপ্রসূ হয় না।" গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশ মনে পড়ে:

"অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ; নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত······"

আদিম জৈবকামনার 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে লেখিকা আধুনিক ছোটগল্পের সমুচ্চ শিল্প-প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন। বাহুল্যবর্জিত তীক্ষ্ণচূড় মিতাক্ষর কাহিনীটি যেমন ঘন-সংহত, তেমনি স্বল্পভাষী ব্যঞ্জনায় অর্থগূঢ়। একটি মুহূর্তের চকিতদীপ্তি জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছে। গল্পটির লক্ষ্যভেদী স্বল্প-সংক্ষিপ্ত রূপের জন্য দায়ী দুটি বিশিষ্ট কলাকৌশল: প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনা ও ব্যাঘ্র-প্রতীক। তরাইয়ের সতেজ সঘন আরণ্যক ভূখণ্ডের সঙ্গে সভ্য পৃথিবীর এক আদিম সম্পর্ক আছে। বাইরের দিকে তা যতই পৃথক হোক না কেন, একই প্রাচীন রক্তধারা তাদের ধমনীতে প্রবহমান। তাই সভ্য পৃথিবীর এক অভিজাত ঘরের তরুণী এই বনপ্রকৃতির বিচিত্র ছন্দে তার বাসনার তরঙ্গ রচনা করেছে, "সেখানে রক্ত হয় সৌরভ, মাংসের দেহ শৃঙ্গ-উপত্যকা সমন্বিত অরণ্য হয়ে যায়। চুলের শিবিরে মৃগনাভির গন্ধ ভাসে। সোনালী তরঙ্গ ওঠে, উত্তপ্ত দিক-সীমায় বিহ্বল বাসনা উদ্দাম নীবিবন্ধ উন্মোচন করে আহ্বান জানায়।" দ্বিতীয়ত, অন্তর্জীবনের বিচিত্র আবর্ত প্রকাশ করতে আধুনিক গল্পলেখকেরা অনেক

সময়ে প্রতীক (symbol) ও রূপকল্পের (image) আশ্রয় গ্রহণ করে। সহজ বিবৃতির পথ ছেড়ে ছোটগল্প অনেক ক্ষেত্রে তাই প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে—স্ফটিকের স্বচ্ছ আধারটির মধ্য দিয়ে তাই বিচ্ছুরিত হয় তির্যকরশ্মি ব্যঞ্জনা। 'বার্নিং ব্রাইট' গল্পে ব্যাঘ্রপ্রতীক ও সঙ্কেতময় কাব্যধর্মী বর্ণনা তীক্ষ্ণতার সৃষ্টি করেছে। বালজাকের 'এ প্যাশান্ ইন্ দি ডেজার্ট' গল্পে পশু ও মানুষের আদিম আসক্তিকে রূপ দেওয়া হয়েছে—পশু এখানে এক বাঘিনী। কিন্তু আলোচ্য গল্পটির ব্যাঘ্র প্রায় সম্পূর্ণটাই প্রতীক। শিক্ষিতা নারী-হৃদয়ে পাশব আসক্তির দ্বিধাহীন চিত্রণে, কাব্যধর্মী বর্ণাঢ্য বর্ণনায়, প্রতীক-ব্যঞ্জনার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে, কেন্দ্রসংহত ও মিতাক্ষর ভাষণে গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের একটি বিশিষ্ট সংযোজক।

প্রেমের আর একটি আদিমসত্তা 'মাটির মূর্তি' গল্পটিতে প্রকাশিত হয়েছে। অক্সফোর্ডে শিক্ষিতা মাধবী মিত্র দেশসেবার উন্মাদনায় সরকারী কলেজের অধ্যাপিকার পদত্যাগ করে দেহাতী গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। ছাত্রী রঞ্জনাকে সে মেয়ের মতো মানুষ করেছে। ভাস্কর নীলাঞ্জনের আবির্ভাবে এক জটিল প্রেমের ত্রিভুজ রচিত হয়েছে।—প্রৌঢ়া নারীর তরুণ প্রেমিক! রঞ্জনার মূর্তি গড়তে গিয়ে শিল্পী ও রঞ্জনা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হলো। কিন্তু এক বর্ষাব্যাকুল রাত্রিতে মাধবী ও নিলাঞ্জনের প্রকৃত সম্পর্ক উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রেমের বিনিময়ে বেকার শিল্পী মাসিক অর্থসাহায্য পেতো—এই-ভাবেই প্রৌঢ়া মাধবী মিত্রের উন্মাদ সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ হতো। রুগ্না ছাত্রী রঞ্জনা যে মাঝখানে দাঁড়াতে পারে এ কথা মাধবী ভাবতে পারেনি। একজন তরুণকে নিয়ে প্রৌঢ়া নারীর ও তার কন্যাসমা তরুণীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তীক্ষ্ণ রেখায় বিকীর্ণ হয়েছে।

বাণী রায়ের অনেকগুলি গল্পে কবি ও কথকের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। ছোটগল্প ছাড়া কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর একটি সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। ছোট গল্পের মধ্যেও কবি বাণী রায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কখনো কখনো। কিন্তু কিছু গল্প আছে যেখানে লিরিকের সূক্ষ্ম ও নিটোল মর্মকোষের চারদিকে এক একটি গল্পের পাপড়ি ফুটে উঠেছে। 'বর্ষাবিজয়' এমন একটি গীতি-মাধুর্যের প্রণয়গাথা। কল্লোল ও পদ্মিনীর প্রেমকাহিনী মূল কথাবস্তু হলেও এ কাহিনীর আসল নায়িকা নিবিড় বর্ষার সম্মোহন। বর্ষার স্বপ্নমধুর পরিবেশ পদ্মিনীর মনে জাগায় রামগিরি পাহাড়ে নির্বাসিত প্রবাসী যক্ষের বিরহবেদনা।

এমন একটি নিবিড় বর্ষণের মুহূর্তেই কুঁড়ে ঘরে পল্লবের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল—বাইরের দুরন্ত ঝড় সেদিন তার হৃদয়েও বাসা বেঁধেছিল। আবার এমনি আর এক বর্ষার দিনে উন্মত্ত পার্বত্য উৎসের মত্ত ধারায় তার চরম-বেদনা ও পরমতম আত্মীয়ার একই সঙ্গে সলিল সমাধি হলো। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় গতি সঞ্চারিত করার জন্য পদ্মিনীর মায়ের একটি কলঙ্কিত ইতিহাস যুক্ত করা হয়েছে। পাশব কামনার আর একটি রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে পদ্মিনীর বিধবা মাতার চরিত্রে। এই স্বামীহন্ত্রী স্বার্থপরায়ণা নারী অর্থলালসা ও পাশববৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য একমাত্র মেয়েকেও লালসার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে বর্ষার নিবিড় মায়াজাল কাহিনীকে এক অখণ্ড গীতিমাধুর্যে ভরে তুলেছে।

'তিরিশ দশকের এক গল্প' পূর্বাপর একটি স্মৃতিমন্থর লিরিক। পাওলার-বাগান-বাড়ীতে মেয়েদের আড্ডা বসেছে। সেখানে মধ্যবয়সী শুক্তি সেন তার প্রেমকাহিনী শুনিয়েছে। কাহিনীর পটভূমি তিরিশ দশকের জার্মানী। ব্যাভেরিয়ার পল্লী অঞ্চলে সূর্যতপ্ত নীল আল্‌পসের সানুদেশে, পাইনবনের ছায়ায় রচিত একটি নিটোল প্রেমকাহিনী। জার্মান যুবক বেসিলের সঙ্গে প্রবাসিনী বাঙালী কন্যার এই প্রণয় সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পিতার সতর্ক-শাসন ও বান্ধবীর চক্রান্তে তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। জার্মানীর লোকসাহিত্যের নায়ক হংসবাহন লোহেনগ্রিনের প্রণয়গাথা সুরের যাদুকর ভাগ্‌নারের মায়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে।—বর্ণময় একটি রূপজগৎ সৃষ্টি করে লেখিকা তাকে সুরের ইন্দ্রজালে সংগীতস্পন্দী করে তুলেছেন।

বাহুল্যবর্জিত তীক্ষ্ণতা ও ইঙ্গিতগর্ভ পরিসমাপ্তি ছোটগল্পের দুটি প্রধান লক্ষণ। কাহিনীকে লঘুস্বচ্ছ ফেনার মতো করে কত সহজে তাতে কত গভীর আইডিয়াকে প্রতিফলিত করা যায় বাণী রায় তা দেখিয়েছেন। এ যেন একটি শিশিরবিন্দুর মধ্যে অনন্ত আকাশের অশ্চর্য প্রতিফলন। 'জীবনাতীত' গল্পে যেটুকু কাহিনী আছে, তা নিতান্তই গৌণ—আসল কাহিনীটি এখানে অনুচ্চারিত। গল্পটি সম্পূর্ণরূপেই ভাবমুখ্য—ঘটনামুখ্য বা চরিত্রমুখ্য নয়। ঘটনাকে কমিয়ে এনে একটি বিশেষ ভাববিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রায়িত করতে গিয়ে মুখর ভাষণকে স্তব্ধ করতে হয়—এক অব্যক্ত অনুচ্চারিত ব্যঞ্জনা সূক্ষ্মদেহী গন্ধধূপের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শান্তস্নিগ্ধ ভাবমুখ্য গল্পের রাজা হলেন চেকভ্। 'জীবনতীত' গল্পে বাণী রায় চেকভ্‌পন্থী। খরদীপ্ত আয়রনি

নয়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণও নয়, উন্মীলনপন্থাই এখানে অবলম্বন করা হয়েছে। একজন প্রৌঢ়া অধ্যাপিকার প্রেমহীন নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে আকস্মিক অভিনব চেতনার স্ফুরণ গল্পটিকে ভাবগম্ভীর করে তুলেছে। বান্ধবী তরুর কন্যা বনানীর সঙ্গে সে দিদির ছেলে নন্দনের বন্ধু মোহনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে চেয়েছিল। বিয়ের কথা শুনে মোহন খুব হেসেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বিয়ে আর হয় নি। এরপরে আবার এক সন্ধ্যায় মোহনের সঙ্গে তার দেখা হলো। মোহনকে বিবাহ প্রসঙ্গে হাসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে—

আমার চোখের দিকে সোজা তাকাল মোহন। দীর্ঘ-নিষ্কম্প চোখের পল্লব, চোখের তারায় উষ্ণ উত্তাপ। কি সে আমাকে বলতে চায়? কেন? আমার অভিসারিকা আত্মা বনানীর দেহ কি মাধ্যম প্রার্থনা করেছিল?

মোহন কি বলতে চেয়ে বলল না, কথা তার ঠোঁটের উপর অদৃশ্য কম্পনে কাঁপতে লাগল। কবে তার আমাকে বলবার মত কথা সংগৃহীত হল আমি জানি না।

কি বলতে যেয়ে মোহন বলতে পারল না। বঙ্কিম হাসির সঙ্গে উত্তর দিল, "হেসেছিলাম—? এমনি।"

আমি মুহূর্তে সংবৃত-সত্তা হয়ে স্থির, অভ্যস্ত প্রৌঢ় কণ্ঠে বললাম, "আমরা মাসী-পিসীর দল, যোগ্য ছেলের বিয়ে তো খুঁজবই।"

"আমার রাগ-রক্তিম লাল-ফুল দিনটি এক মুহূর্তে একটা মরা মাকড়সা হয়ে গেল। আমার জীবনাতীত জীবন আমার জীবন থেকে অদৃশ্য হল।"

সজ্ঞান চেতনা ও নির্জ্ঞান বাসনার দ্বৈতলীলাকে লেখিকা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এর সামান্য অংশই ব্যক্ত, আর প্রায় সবটুকু অনুচ্চারিত। একজন খ্যাতনামা মার্কিন সমালোচকের মতে ছোটগল্প হলো একটি 'Unity of Impression'. 'Impression' শব্দটি সবরকম ছোটগল্প সম্পর্কে সমান প্রযোজ্য এ কথা বলা যায় না, কিন্তু চেকভ্‌পন্থী ভাবমুখ্য গল্পলেখকেরা লঘুস্পর্শ ইম্প্রেশ্যানের ছায়ায় অনতিব্যক্ত সত্যটিকে উদ্ভাসিত করে তোলেন। একটি ভাবঘন মুহূর্তে বাণী রায় জীবনসত্যকে তেমনি করে প্রকাশ করেছেন।

'ধাক্কা' গল্পটিতেও স্বল্পতম গল্পাংশের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনে একটি সতের বছরের কিশোরচিত্তের অন্তঃস্থল আলোকিত করা হয়েছে। পদ্মাপার থেকে আনন্দ কাজকর্মের চেষ্টায় খিদিরপুরের বস্তি অঞ্চলে একটু আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। সুধাই তার একমাত্র আশ্রয়। মাঝে মাঝে কাজ থেকে ফিরবার মুখে সুধার জন্য

বাদাম ভাজা নিয়ে এসে সে তৃপ্তি পায়। আনন্দের প্রথম যৌবনের অস্পষ্ট স্বপ্ন সুধাকে ঘিরেই রচিত হয়। দেশনেতা ত্রিদিবের আহত দেহটি যখন সকলে নিয়ে এলো তখন তার স্বপ্নজাল ছিন্ন হলো এক রূঢ় বাস্তবের প্রচণ্ড ধাক্কায়। ত্রিদিব সম্পর্কে সুধার মনোভাব নিয়ে সে অনেক চিন্তা করেছে। ত্রিদিবের ভাবী স্ত্রী করুণা এসে যখন তাকে নিয়ে গেল, তখন সুধার দুর্বলতা দেখে আনন্দ দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেল। সর্বশেষ ধাক্কায় তার জীবনের একটি মীমাংসা হয়ে গেল। সুধার মুখে আনন্দ যেদিন শুনলে, যে তার ছোট ভাইটি হয়ে সে থাকবে, সেইদিন তার মনের গ্লানি গেল কেটে। আনন্দের সম্মুখে জীবনের দ্বারগুলি ছিল রুদ্ধ—রুদ্ধদ্বারে সে বারবারই ধাক্কা খেয়েছে। এই ধাক্কায় তার চেতনাকে জাগ্রত করে তুলেছে, তার অনুভূতিকে করেছে প্রখর ও স্পর্শকাতর। কিশোর মনের সদ্যজাগ্রত ছায়াময় কামানুভূতিকে দু'একটি স্বল্প সংক্ষিপ্ত রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সর্বশেষ ধাক্কা তাকে প্রার্থিত জীবনের উপকূলে পৌঁছিয়ে দিল। কৈশোর যৌবনের সন্ধিসীমার ছায়াময় অনুভূতির চিত্রণে লেখিকা আশ্চর্য সাফল্য দেখিয়েছেন। এই প্রশান্ত-মধুর নিটোল গল্পটি লেখিকার একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

বাণী রায়ের অনেকগুলি গল্পই চরিত্রমুখ্য। আধুনিক ছোটগল্পে ঘটনার স্থান সংকুচিত। মধ্যযুগের ইতালীয় ও ফরাসী নভেলগুলিতে ঘটনার চমৎকারিত্ব অনেকখানি স্থান অধিকার করত। 'টেল্' জাতীয় কাহিনীর দীর্ঘ-মন্থর বিবৃতি-ধর্মিতার সঙ্গে ও আধুনিক ছোটগল্পের শিল্পরীতিগত কোনো মিল নেই। আধুনিক যুগের গল্পকারেরা চরিত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও তার মনোজীবনের জটিল গ্রন্থি মোচনের দিকেই তাঁদের প্রধান আকর্ষণ। একদিক থেকে ঔপন্যাসিকদের চেয়েও গল্পকারদের দায়িত্ব বেশী। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় ও বহুশাখায়িত কাহিনীর পল্লবিত বিস্তারে চরিত্র বিকাশের যে অবকাশ আছে, ছোটগল্পে তা অনুপস্থিত। কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা বা কয়েকটি চকিত মুহূর্ত ছাড়া চরিত্রকে উদ্ভাসিত করা সম্ভব নয়। ছোটগল্পে চরিত্রের সবটুকু অংশ বিশ্লেষণ করে দেখানোও চলে না। অথচ সেই স্বল্পরেখ চরিত্রটির মধ্যেই জীবনরহস্যের গভীরতা প্রকাশ করতে হয়। এই দুরূহ শিল্পকর্মে যিনি সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁকে সার্থক শিল্পীর গৌরব দিতেই হবে।

শ্রীমতী রায়ের গল্পে চরিত্রগুলিকে জোরালো করে আঁকা হয়েছে। তাঁর বেশীর

ভাগ গল্পেই চরিত্রগুলি গভীর রেখায় অঙ্কিত। ব্যক্তিত্ব ও মানসিক শক্তি তাঁর নায়িকনায়িকার প্রধান দুটি চরিত্রলক্ষণ। বক্তব্যটিকে আরো স্পষ্ট করলে দাঁড়ায় এই যে, ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক ঋজুতা ও অতিরিক্ত আত্মসচেতনকারী মানসিক শক্তি তাঁর নায়িকাদের ট্রাজেডির প্রধান কারণ। অতিব্যক্তিত্বের চাপেই তাদের জীবনের ভারসাম্য ব্যাহত হয়েছে। সম্ভবতঃ শিল্পী বাণী রায়ের সর্বোত্তম সাফল্য এইখানেই। ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন এখানে একই বিধাতার রচনা। সে বিধাতা বিদগ্ধ কিন্তু নির্মম। ব্যক্তিত্বের প্রবলতাকে শিল্পের মাধ্যমে তিনি রূপ দিয়েছেন। জলন্ত অঙ্গারের অগ্নিরেখায় তাঁর চরিত্রগুলি স্পষ্টোজ্জ্বল।

'গর্বিত হৃদয়' গল্পটি এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মনে পড়ে। শর্মিষ্ঠার তুষার-স্তম্ভিত কঠিন অভিমান ও জটিল ব্যক্তিত্বেই এর কেন্দ্রমূল। শর্মিষ্ঠা যেন কঠিন পাষাণ শিলায় অঙ্কিত একটি নির্মম চিত্র। মন্দারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, কিন্তু কিড্‌নির কঠিন অসুখে এক বছর পরেই মন্দারের মৃত্যু হলো। কঠিন অসুখের কথা তার বাপমায়ের জানা ছিল, কিন্তু সময় মতো তাঁরা বিয়ে করতে নিষেধ করেননি। শর্মিষ্ঠা এখন অধ্যাপিকা। দু'বছর পরে শ্বশুর শাশুড়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধে সে দু'দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে আসে। কিন্তু তার কঠিন আচার-আচরণের মধ্যে তীব্র আঘাত-প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্তম্ভিত হন, কিন্তু আহত হন তার চেয়েও বেশী। শর্মিষ্ঠা যেন তাদের আঘাত দিতেই এসেছিল। শর্মিষ্ঠার শ্বশুর-শাশুড়ী চরিত্র দুটিও সুন্দর ফুটেছে। পুত্রহারা জনক-জননীর মর্মবেদনা, পুত্রবধূর দিকে চেয়ে একটি অপরাধ প্রবণতার ভাব, তার রূঢ় আচরণের আঘাত—সামান্য দু একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শর্মিষ্ঠা তাঁদের বেদনা বুঝতে পারে নি। তাই নিরামিষ খেয়ে ও সাদা শাড়ী পরে পুত্রের স্মৃতিকে তাঁদের মনে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। শর্মিষ্ঠা তার গর্বিত মনকে নানাভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইজন্য ভিতরে ভিতরে তার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত, অবসন্ন। তাই প্রতীক্ষারত নূতন প্রেমের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে। স্তম্ভিত তুষার যেন প্রেমের উত্তাপে বিগলিত হলো। এমন তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণ লেখিকার অসামান্য শক্তির পরিচয় দেয়।

'অনন্তযৌবনা' একটি মিলনান্তক প্রেমকাহিনী। কিন্তু বারুণী চরিত্রটিকে দৃঢ় রেখায় এঁকে এর কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হয়েছে। বারুণী প্রসাধন-পটিয়সী। রূপচর্চা ও প্রসাধনের সাহায্যে সে যৌবনকে ধরে রাখতে চায়। আর্ট কলেজ

থেকে পাশ করে যে শুধু ছবিই আঁকে না, নিজেকেও বিচিত্র অঙ্গরাগে চিত্রিত করে। এই প্রৌঢ়া সুন্দরীর বয়োকনিষ্ঠ স্তাবক ও পাণিপ্রার্থীদের অভাব হয় না। কিন্তু তাদের স্তাবকতা যতই ভালো লাগুক না কেন, এই লঘুচিত্ত তরুণদের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে তার কোন দিনই আগ্রহ জাগেনি। নিজের চেয়ে তিন বছরের বড়ো সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ প্রৌঢ় নীলাঞ্জনকে সে মনে মনে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু রূপগর্বিতা প্রৌঢ়া সুন্দরী প্রসাধনের বিচিত্র চাতুর্যে তার বাঞ্ছিত মুহূর্তটিকে হারাল। নিজের রূপের উপর বিশ্বাস হারিয়ে যখন সে সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে ফেললো, তখন তার যৌবনাস্তিক বিবর্ণরূপের কাছে বাঞ্ছিত ধরা দিল। শান্তমধুর উপসংহারটির মধ্যে বারুণী চরিত্রের মানসপ্রবণতা সুকৌশলে অঙ্কিত। বারুণীর মানসপ্রবণতা কুমারসম্ভবের উমার ব্যঞ্জনায় মহিমা-সুগম্ভীর। তার সমস্ত চটুলতা ও প্রসাধনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করে প্রেমের সেই ক্ল্যাসিক্যাল মহিমাই ধ্বনিত হয়েছে—নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী।

বাণী রায় প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। প্রেমের চটুল লীলাবিলাস ও উন্মাদ সম্ভোগের চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি আত্ম-বিলোপকারী প্রেমের দুঃসাধ্য ব্রতচারণা ও দুরূহ আদর্শবাদের কাহিনীও তিনি শুনিয়েছেন 'তুহিন-ক্রান্তি' গল্পতে। দার্জিলিংয়ের বৃষ্টি-কুয়াশা-মথিত স্বপ্নময় পটভূমিকায় সুজাতার প্রতি শৈবালের প্রেম শতশিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সুজাতা শৈবালের কাছে রহস্যময়ীই থেকে গেল। আবেগবিরল কণ্ঠ, ভাবনাতুর মন ও গভীর মৌনতা নিয়ে সুজাতা নিজের মতো করে একটি জগৎ রচনা করেছিল। সে জগতে শুধু শৈবাল কেন, সকলেরই প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। সুজাতা তার পূর্ব প্রেমিকের জন্য তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছে। —গরীব ঘরের অতিসাধারণ এই প্রেমিকের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য সে ডাক্তারী পড়েছে; তাকে স্যানিটারিয়ামে রেখেছে, কিন্তু বাঁচতে পারে নি। স্বয়ংবৃত ব্রহ্মচর্য ও গৈরিক বসন তাকে তপস্বিনীর মর্যাদা দিয়েছে। বারুণী প্রেম-তপস্যার উমা, সুজাতা প্রেম সাধনার মহাশ্বেতা।

বর্তমান সংকলনটির 'সে অভিনেতা' গল্পটি নিজেই একটি শ্রেণীর, তার কোনো দোসর নেই। কাহিনীরসের সঙ্গে নাটকীয়তার গভীর সমন্বয় ঘটেছে। গল্পটিকে নিয়ে একাঙ্কিকা রচনার কোনো বাধা নেই। বাণী রায়ের অধিকাংশ ট্রাজেডিই নারী চরিত্রে, কিন্তু আলোচ্য গল্পটিতে প্রৌঢ় অভিনেতা চন্দ্রাপীড় চৌধুরীর ট্রাজেডি রচনায় তিনি গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

অমিত সেন কাহিনীর কথক মাত্র, কাহিনীর সঙ্গে তার সামান্য যোগ থাকলেও কাহিনীর ফলশ্রুতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সাঁওতাল পরগণার ডাকবাংলোয় দুটি বিচিত্র চরিত্রের নরনারী তাদের ক্ষণিকের বাসর বেঁধেছে—রাণীসাহেবা ও জমিদারজী। রাণীসাহেবা হিন্দুরাজার মুসলমানী রক্ষিতা। দেওয়ানের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে ক্ষত্রিয়ের তরবারি তার মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। নামমাত্র মাসোহারায় দিন চলে তার।—আয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিকার খুঁজে বেড়ান। জমিদারজী নয়, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের একদা-বিখ্যাত অভিনেতা চন্দ্রাপীড় চৌধুরী। মদ্যপানে ও অত্যাচারে কালব্যাধি ধরেছে। কিন্তু তার জীবনের সংকটময় মুহূর্তে সে অভিনয় করতে ছাড়েনি। চন্দ্রাপীড় তার জীবনের শেষ অভিনয়ে মহিমা হারায়নি—জীবনের শেষ সম্বল দিয়েও সে তার শেষ অভিনয়েও মূল্য দিয়েছে। গল্পটির প্লট রচনা ও সিচ্যুয়েশ্যান সৃষ্টির চাতুর্য লক্ষণীয়। একটি রাত্রির রোমাঞ্চিত মুহূর্ত বিচিত্র নায়কের অভিনয়-মহিমায় অনবদ্য হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবনা, ক্লাইম্যাক্স ও উপসংহার সুবলয়িত মণিখণ্ডের মতো। চন্দ্রাপীড়ের জীবনের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক অভিনয়টি মানব জীবনের যে রহস্য সুগভীর অশ্রুগম্ভীর মহিমা প্রকাশ করেছে, তা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরই অধীর জীবন-জিজ্ঞাসা।

বর্তমান যুগে ছোটগল্পের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। ছোটগল্পের শ্রেণীবিন্যাস করা যেমন দুরূহ, তেমনি দুরূহ তার স্বরূপধর্ম ও সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। উনিশ শতকের গল্প লেখকদের প্লটের মোহ কাটে নি, গল্পরসের উপরেই ছিল তাদের অসাধারণ আকর্ষণ। আধুনিক যুগের গল্প লেখকেরা তাই 'বিশুদ্ধ গল্প' বর্জন করার পক্ষপাতী। এর ফলে টেক্‌নিকের বৈচিত্র্য আধুনিক গল্পকে বিচিত্র রেখায় শিল্পিত করেছে। বাণী রায় দীর্ঘকালব্যাপী শুধু গল্পই লেখেন নি, তার নানা টেক্‌নিক নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বহুবর্ণ-রঞ্জিত তৈলচিত্র থেকে আরম্ভ করে বিরলতম রেখা পর্যন্ত তাঁর গল্পের বিচিত্র শোভাযাত্রা রচনা করেছে। বিলম্বিতলয়ের 'টল্'ধর্মী গল্প থেকে দ্রুততাল মণ্ডিত একাঙ্গীকাধর্মী গল্পের নানা পথে তাঁর সঞ্চরণ।

গল্পবয়নের রীতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্পরচনায় 'ডাইরেক্ট মেথড্'-এর চেয়েও আত্মজীবনীমূলক রীতিতেই (Autobiographical method) তাঁর অধিকতর প্রবণতা। এই পদ্ধতির মধ্যেও তিনি অনেকগুলি পথ আবিষ্কার করে বৈচিত্র্যহীনতা দূর করেছেন। এই পদ্ধতিতে একটি চরিত্রের জবানিতে

গোটা গল্প বলা হয়। এই পদ্ধতির একটি সুবিধা হলো এই যে, বাস্তবতার ভাবটি এখানে অধিকতর পরিস্ফুট হয়। বক্তা নিজে কাহিনীর একটি চরিত্র, ঘটনাংশের অনেকটারই তিনি দ্রষ্টা। বাণী রায়ের অনেকগুলি গল্পই এই পদ্ধতিতে রচিত। অনেক সময় এমন একজন গল্প বলেছেন, যাঁর সঙ্গে গল্পাংশের কোনো যোগ নেই বললেই হয়। যেমন 'সে অভিনেতা' গল্পটি। এই রীতিটি যেমন পুরাতন, তেমনি নূতন। পুরাতন এই অর্থে যে প্রাচীন যুগের কাহিনীগুলি প্রধানত এই পদ্ধতিতেই রচিত হয়েছে। এই নির্লিপ্ত কথক ও কথয়িত্রীরাই 'আরব্য উপন্যাস', 'কথাসরিৎ সাগর', 'দেকামেরন', 'হেপ্তামেরন' প্রভৃতি গল্পমালার কাহিনী বয়ন করেছেন। নূতন যুগের গল্পকারদের মধ্যে মোপাসাঁই সর্বপ্রথম গল্প বলার এই রীতিকে একটু সংস্কৃত করে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করলেন। বাণী রায় এই পদ্ধতির অনেকগুলি বিকল্প রচনা করেছেন। একাধিক কথকের কাহিনীর মধ্য দিয়ে গল্প অগ্রসর হয়েছে (যেমন 'রঞ্জনরশ্মি'), আবার 'ডাইরেক্ট' ও আত্মজীবনীমূলক পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে 'কিড্' গল্পে। 'বেসিক ট্রেনিং' গল্পেও দু'জনের গল্পের মাধ্যমে কাহিনী গড়ে উঠেছে। ফর্মের মতো বিবৃতির ভঙ্গীকেও লেখিকা নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন।

ভাষা ও বর্ণনাশক্তির কথা না বললে বাণী রায়ের গল্পের অনেকখানিই বাদ থাকে। তাঁর ভাষার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এমন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুনির্বাচিত শব্দ চয়নে, তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারে, বাগ্‌বিন্যাসের ঘনবদ্ধ সংহতিতে তাঁর ভাষা দৃঢ়তায় ও ঋজুতায় বিশিষ্ট। কিন্তু প্রয়োজন হলে এ ভাষাকে বাঁকানো যায়, সহজ-নমনীয় করা যায়—বুদ্ধির চোখ-ধাঁধানো অসিক্রীড়াও এ ভাষার দ্বারা সম্ভব। এ ভাষা আবেগদীপ্ত ও বর্ণময়। অলংকারে, প্রসাধনে, মহার্ঘ বেশভূষায় এ ভাষার সম্রাজ্ঞী-মহিমা। আভিজাত্য-মন্থর পদক্ষেপে এ ভাষার সম্ভ্রান্ত শালীনতা, গতির ছন্দে এখানে গানের নূপুর ধ্বনিত। গল্প রচনা করতে গিয়ে ভাষার দিকে লক্ষ্য থাকে না অনেকেরই। বাণী রায়ের এ ভাষা দীর্ঘকাল চর্চার ফলে অনুগত হয়েছে। ভাষার সঙ্গে বর্ণনাভঙ্গীর কথাও মনে করা যায়। কখনো এ ভাষা গীতি-কবিতার মতো অনির্দেশের ব্যঞ্জনায় বিধুর করে, কখনো বা বর্ণময় বহুবিচিত্র চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন করে, আবার কখনো বা নিপুণ ভাস্করের মতো রূপরচনায় উন্মুক্ত। প্রকৃতির বর্ণনায় ও

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিবিড় গ্রন্থনে ও উদ্দীপ্ত মুহূর্তের আবেগ-বিহ্বল বর্ণনাতে এই ভাষার সর্বোত্তম সিদ্ধি।

বিদেশী সাহিত্যের, সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে অনেক উপমা, ইমেজ ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সেখান থেকে আনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে বিজাতীয় বলে মনে হয় না, লেখিকার স্টাইলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেই স্বীকৃত হওয়া উচিত। বৈদেশিক নাটক, কাব্যের বহু অংশ তাঁর গল্পে চূর্ণ মুক্তার মতো ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যে সুকর্ষিত ভূমিতে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার রসের সঙ্গে এদের কোনো বিরোধ ঘটেনি। পাশ্চাত্য কবি-মানসের এই উজ্জ্বল বাণীকণিকাগুলি গল্পের মধ্যে একটি নূতন আস্বাদনের সৃষ্টি করেছে। বহু. চিত্ররঞ্জিত সুবিস্তৃত রাজকীয় আস্তরণের উপর যেন নিপুণ শিল্পীর মনিমুক্তার কারুকার্য।

ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের এমন নিপুণ গ্রন্থন কদাচিৎ দেখা যায় না। জীবনের গভীর মর্মমূল থেকে যে বেদনা উৎসারিত, তারই রক্তলেখায় গল্পগুলি রচিত। নারী চরিত্রগুলিই এখানে মুখ্য। নারীজীবনের কামনা, প্রেম, আশাভঙ্গের মর্মান্তিক বেদনা, বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ও পরিতৃপ্ত সাফল্য—সব কিছুর মূলেই আছে লেখিকার নিগূঢ় ব্যক্তিত্বের গভীর রস। বাণী রায়ের গল্প পাঠককে ডরোথি রিচার্ডসনের 'পিলগ্রিমেজ' গল্পের নায়িকার মত বলতে হয়: I don't read books for the story, but as a psychological study of the author'. এই ব্যক্তিত্বরসের উৎস সন্ধান প্রচেষ্টাই বাণী রায়ের গল্পগুলির সবচেয়ে বড়ো আস্বাদন।

রথীন্দ্রনাথ রায়

লুক্রেশিয়া

"গতকল্য রাত্রে গড়িয়াহাট রোডে একটি থানার পার্শ্বে একটি সুন্দর সুবেশ যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রহারজনিত ক্ষতের চিহ্ন ছিল। যুবকটিকে অবিলম্বে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।"

*　　　*　　　*

"গড়িয়াহাট রোডে যে যুবকটিকে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম শ্রীযুত প্রবীর গুহ বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ-বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র। প্রকাশ, শ্রীযুত গুহ গতকল্য অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে তিনি গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার পকেটের টাকা, ঘড়ি ও হাতের হীরার আংটি প্রভৃতি কিছুই অপহৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ আততায়ীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া প্রহারে অচৈতন্য করিয়াছিল, কিন্তু কোন ভয় পাইয়া তাহারা তাঁহার টাকাকড়ি প্রভৃতি অপহরণ না করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার সি. আই. ডি. পুলিস এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।"

সংবাদপত্রে এই সংবাদটিতে কলিকাতায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কর্নেল প্রশান্ত গুহর একমাত্র পুত্র প্রবীর গুহকে কে না চেনে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত লেখক, জনপ্রিয়, কমনীয়মূর্তি প্রবীর গুহ কলিকাতা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত, মনস্বী ছাত্র প্রবীর গুহের এই আকস্মিক বিপদে ছাত্রছাত্রী মহলে সাড়া পড়িয়া গেল।

পুলিস বহুদিন অপরাধীর অন্বেষণ করিল। প্রবীর গুহ আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটি চিরদিনের জন্য অকর্মণ্য হইয়া গেল। তাহার ছাত্রজীবন শেষ হইল নিরাশার অন্ধকারে। তাহার উদ্ধত লেখনী মূক হইল কলম ধরিবার অসামর্থ্যে। শোকাচ্ছন্ন মাতাপিতার সহিত সে কার্শিয়াঙে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইতে গেল। প্রায় এক বৎসর যাবৎ সে সেইখানেই আছে।

পুলিসের নিকট জবানবন্দীতে প্রবীর গুহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সে গড়িয়াহাট রোড দিয়া একাকী ফিরিতেছিল। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের মধ্যে একজন মুখোশপরা লোক সহসা তাহাকে আক্রমণ করে। তাহার পর আর তাহার কিছু মনে নাই। আততায়ীর চেহারা সম্বন্ধে প্রবীর গুহ কিছুই বলিতে পারে নাই।

এই আক্রমণের প্রকৃত ঘটনা এবং আক্রমণকারীর প্রকৃত পরিচয় জগতে তিনটি ব্যক্তি মাত্র জানে—প্রবীর গুহ নিজে, মালিনী সেন এবং আমি।

জানি, এখনও প্রবীর গুহর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়, তাহার প্রতিভার অপমৃত্যুর জন্য অজানা সেই দুর্বৃত্তকে অভিশাপ দেওয়া হয়, ইংরেজ শাসনের নিন্দা করা হয়—পথচারী ব্যক্তির জীবন এখনও নিরাপদ নয় বলিয়া।

আমি জানি, প্রবীরকে নিষ্ঠুরভাবে কে প্রহার করিয়াছিল এবং কেন। আমি জানি, কেন প্রবীর গুহ লক্ষপতি পিতার পুত্র হইয়াও পুলিসের নিকট প্রকৃত ঘটনা বলে নাই। আমি জানি, কেন মালিনী সেনের গর্বিত মস্তক আজ অবনত, কেন প্রবীর গুহের নামে তাহার নয়নে বহ্নি জ্বলিয়া ওঠে।

আমি অমর সোম—বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে পঞ্চবার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র, মালিনী আমার সহপাঠিনী এবং প্রতিবেশিনী।

মালিনার পিতা পাটনায় জজিয়তি হইতে বিরাম লইয়া, হিন্দুস্থান পার্কে আমাদের পাশের বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। মালিনীর এক ভ্রাতা অধ্যাপক, অন্য ভ্রাতা ব্যারিস্টার। বাহির হইতে আই. এ. পাস করিয়া আসিয়া মালিনী আশুতোষ কলেজ হইতে বি. এ. পাস করে।

আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়ি। আমার ইংরেজীতে অনার্স ছিল, মালিনীরও তাই। পাশাপাশি বাড়ি, উভয় পরিবারে সৌহার্দ্য। মালিনীর সহিত আমার সখ্য হইতে বিলম্ব হইল না।

আজ মালিনী আমার কে জিজ্ঞাসা করিলে আমার উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু মালিনী আমার কে নয় তাহার উত্তরও আমার জানা নাই।

মালিনী বাংলার-বাহিরে মানুষ। সমস্ত প্রকৃতিতে তাই তাহার একটা উন্মত্ত বন্যতা। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে অতিমুক্ত লতাটির মত। বাঙালিনীর ভীরু নম্রতা তাহার মধ্যে নাই, আছে অগ্নি, আছে দীপ্তি। তাহার

ক্ষীণ শ্যাম দেহে, আকর্ণবিশ্রান্ত কিন্তু অনতিপ্রশস্ত নয়নে, বক্র রক্ত-অধরে আছে অনল—যাহা পুরুষ-চিত্তকে দগ্ধ করে, জ্বালা দেয়।

মালিনী কবিচিত্ত। তাহাদের বাগানে বসিয়া কতদিন তাহাকে দেশী বিদেশী কাব্য পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমাকে সে চিরদিন সঙ্গদান করিয়াছে কিন্তু আমার নীরব প্রেম সে গ্রহণ করে নাই। বর্ষণমত্ত সন্ধ্যায় তাহার অবাধ্য অলক উড়িয়া আমাকে সঙ্গী করিয়াছে, আকুল নিশীথে আমার সুরে সুর মিশাইয়া সে গান গাহিয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসায় তিলেকের জন্য সে ধরা দেয় নাই। তাহার অনল বন্য শিখাকে খুঁজিয়া মরিত, আমি তাহাকে কেবল শীতল জলই যোগাইয়াছি।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মালিনী আমাদের বাড়ি আসিল, তাহার চঞ্চল চরণছন্দে গৃহ মুখর হইয়া উঠিল।

কি, একা একা বসে কবিতার বই পড়ছ? বাবাঃ, শেলীর কবিতা এখনও পড় তুমি! আমার ও ন্যাকামির ছড়া ভাল লাগে না। খালি ঘ্যানঘ্যানানি! বিকৃত ক্রন্দনের সুরে মালিনী আবৃত্তি করিল—

"Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud
I fall upon the thorns of life—I bleed."

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া মালিনী আমার পাশে কাউচে লুটাইয়া পড়িল।

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। মালিনী আমার হাত হইতে বই কাড়িয়া লইল।

চল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যাক। অনার্সে তুমি আমি কেউই তেমন ভাল করিনি। এবারে গোড়া থেকেই ভাল ক'রে পড়ব—তুমি হবে ফার্স্ট আর আমি সেকেণ্ড; না, আমি ফার্স্ট, তুমি সেকেণ্ড?—মালিনী আমার চুলের উপর হাত রাখিল।

তাহার স্পর্শের উন্মাদ আকর্ষণ প্রাণপণে সংবরণ করিতে করিতে আমি উত্তর দিলাম, তুমিই ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড।

এই গেল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবেশের ইতিহাস।

মাসখানেক পর। বিকাল চারিটায় মালিনী এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একত্রে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, মালিনীর ব্যারিস্টার দাদার গাড়িতে আমরা ফিরিতেছিলাম—পথে কোর্ট হইতে তাহার দাদাকে তুলিয়া লইতে হইবে।

সেনেট হলের পাশ দিয়া আসিতে হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়া আকুল স্বরে মালিনী বলিয়া উঠিল, অমর, ও কে?

চাহিয়া দেখি, গাড়ি চলার পথ করিতে লোহার গেটে একটি হস্ত স্থাপন করিয়া প্রবীর গুহ দাঁড়াইয়া। শিশুর মত স্ফুরিত ও সুগঠিত তাহার অধরোষ্ঠে জলন্ত সিগারেট। প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার জ্যোতি, দীর্ঘ সারসগ্রীবা একটু পশ্চাতে হেলানো। নারীসুলভ কমনীয় মুখে ঈষৎ বিরক্তি ও অপার আত্মমর্যাদার ছাপ; সাধারণের সহিত তাহার কোন সংযোগ নাই, যেন থাকিতেও পারে না।

মালিনীর উত্তেজিত, মুগ্ধ মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, ওর কথাই তো তোমাকে বলছিলাম সেদিন। ওই হচ্ছে প্রবীর গুহ—গতবারে ইংরেজী অনার্সে ফার্স্ট হয়েছে। আমাদের ইংরেজী কাগজটার সম্পাদক আর সেমিনারের সেক্রেটারি।

ওই প্রবীর গুহ! ভারী সুন্দর লেখে কিন্তু, অমন জোরালো লেখা কমই পড়েছি। আর লেখার সঙ্গে চেহারারও মিল আছে, তাই না?

প্রবীর গুহ তাকাইল না, সোজাসুজি কোন নারীর দিকে সরলদৃষ্টিতে দেখা তাহার জন্মগত অনভ্যাস। তবে মালিনীকে সে পূর্বেই দেখিয়াছিল জানি। দেখিবার বস্তু কোন কিছুতে, বিশেষত স্ত্রীজাতিতে থাকিলে, তাহা তাহার বুদ্ধিপ্রখর দৃষ্টি এড়ায় না।

গাড়ি জনযানবহুল পথে আসিল। প্রবীরের উন্নত, কমমূর্তির দিকে চাহিয়া আধস্বরে, কপোত-গুঞ্জনের মত মালিনী আবৃত্তি করিল—

"সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।"

আত্মবিস্মৃত হাসি তাহার মুখে, নয়নে স্বপ্নের ছায়া।

মালিনীর স্বপ্নালস হাসি আমার চিত্তে দহন আনিল। তাহাকে পরিহাস করিয়া সতর্ক করিলাম।

চেহারাটা বাঁকা তলোয়ারের মতই, কিন্তু চরিত্র? সাবধান মালিনী, প্রবীর গুহের নৈতিক চরিত্রে শিথিলতা আছে। কোন মেয়েই ওর হাত এড়ায় না।

মালিনীর বক্র অধরে শাণিত হাসি ঝলকিয়া উঠিল। প্রতিভার সঙ্গে চরিত্রের যোগ থাকে না অমর। চাঁদ কলঙ্কী ব'লেই সুন্দর। আর—লোকে তো অনেকই বলে! এদেশে তিলকে তাল ক'রে তোলার প্রথা আছে, আমি জানি।

এত সুন্দর কি দেখলে তুমি, মালিনী? তুমি তো কোন পুরুষকে সুন্দর দেখ না?—অজ্ঞাতে হয়তো একটা নিঃশ্বাস পড়িল!

তোমার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়তো প্রবীর গুহকে কেউ বলবে না। কিন্তু আমি দেখছি ওর ব্যক্তিত্বকে, ওর প্রতিভাকে; চেহারা তার আধার মাত্র। কি আশ্চর্য!

তাহার দিন দুই পরে বিতর্ক-সভায় প্রবীর গুহ নোয়েল কাওয়ার্ড সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিল। কুশাগ্র বুদ্ধি তাহার, তীক্ষ্ণ বচন-বিন্যাস। প্রতিপক্ষের কলরব ভেদ করিয়া তাহার উদাত্ত কণ্ঠ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া ফেরে; তাহার যুক্তি অসীম জ্ঞানের পরিচয় দেয়। সম্মুখের আসনেই মালিনী, রক্তপদ্ম-বর্ণের শাড়ী তাহার রূপকে মুখরতর করিয়া তুলিয়াছে। চঞ্চল দৃষ্টি তাহার বারংবার প্রবীরের স্থির প্রদীপ্ত দৃষ্টির সহিত মিলিত হইতেছিল।

তাহার পরের দিনই মেয়েদের বসিবার ঘরের সামনে দেখিলাম, প্রবীর ও মালিনী অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করিতেছে। প্রবীরের পদ্মপলাশ নেত্রে ব্যাধের কটাক্ষ, মালিনীর নয়নে আত্মসমর্পণের অসহায়তা।

সহসা মনে হইল, বিশ্ববিদ্যালয় যেন তিমিরগুণ্ঠনে ঢাকিয়া গেল, যেন আমার চারিপাশে শত শত অলিন্দ স্থপতিশিল্পের নিদর্শনরূপে আমাকে বেড়িয়া ধরিল। সম্মুখে খরস্রোতা টাইবার, তাহার তীরে উচ্চ গিরিশ্রেণীর উপরে আভাস-স্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিল রোম নগরী। কত যুগান্তের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া আমার জন্মান্তরের প্রিয়া যেন অশান্ত ক্রন্দনে আমাকে ডাকিতেছে। 'লুক্রেশিয়া!' ডাকিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম,—আমি তো 'কোলাটিনাস' নহি, পঞ্চমবার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র অমর সোম। আমার নির্যাতীতা, 'লুক্রেশিয়া' তাহার বিষাদম্লান দৃষ্টি, অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি লইয়া ক্ষণতরে দেখা দিয়া সরিয়া গিয়াছে। আমার সহপাঠিনী মালিনী শুধু ষষ্ঠবার্ষিকী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রবীর গুহর সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। আমার 'রোম' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে। কুয়াসাস্তিমিত অতীতের পটে টাইবারের স্রোত ঝিলিক দিয়া আবার বিস্মৃতির তমিস্রায় অন্তর্হিত হইল। আমি তো 'কোলাটিনাস' নহি, তবে কিসের প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ? আমার হস্ত কেন আপনি মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, সমগ্র শরীর আহত ব্যাঘ্রের মত কাহার উপর সরোষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়?

মনে মনে হাসিলাম। রাত্রিজাগরণ ও কাব্যচর্চার মাত্রা কমাইতে হইবে। মালিনীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম; প্রবীর গুহ তখন চলিয়া গিয়াছে।

কি কথা হচ্ছিল তোমাদের? বেশ তো আলাপ হয়ে গেছে দেখছি। —প্রশ্ন করিলাম।

মালিনী উত্তর দিল, একটা চ্যারিটি পার্ফরম্যান্স হবে, তাই গান দিতে বলছিলেন।

কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। প্রবীর গুহের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আভাসে জানি, নারীদেহের প্রতি তাহার দুর্বার লোভ। কুমারীর কোমল অধর তাহার লেখনীকে প্রেরণা যোগায়; পবিত্রতার নীতিশাস্ত্রে তাহার আস্থা নাই। সে প্রতারক নহে, কিন্তু সে শিকারী। সে তাহার লক্ষ্যকে জানাইয়া দেয় যে শরসন্ধান চলিতেছে। হৃদয়হীন সে নহে, অতি-আধুনিক মাত্র।

ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে আমার মুখ হইতে বাহির হইল—

> "If Collatine, thine honour lay in me,
> From me by strong assault it is bereft."

কি বলছ অমর?—মালিনী জিজ্ঞাসা করিল।

বলছি—। আবার অজ্ঞানের মত শুনিলাম আমিই বলিতেছি—

> "Yet die I will not till my Collatine
> Have heard the cause of my untimely death;
> That he may vow, in that sad hour of mine
> Revenge on him that made me stop my breath."

কোথা থেকে বলছ, অমর? কোলাটাইন নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।—মালিনীর চক্ষুতে নিবিড়তা নামিয়া আসিল। সুদূর আকাশে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে নামটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল।

লঘুকণ্ঠে বলিলাম, শেক্সপীয়রের লুক্রেশিয়ার আক্ষেপ বলছি, বুঝলে? যখন প্রবীর গুহের সঙ্গে কথা বলছিলে, কেন জানি না, কেবলই তোমাকে লুক্রেশিয়া ব'লে ভুল করছিলাম। স্বামী কোলাটিনাস বাইরে। নির্জন ঘরে লুক্রেশিয়াকে সেক্সটাস আক্রমণ করেছে তার সর্বনাশের জন্য। কোলাটিনাস অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছিল।

মালিনী হাসিয়া উঠিল। পাথরের মালা যেন মেঝেতে ছিঁড়িয়া পড়িল, এমনই রাগিণীময় তাহার হাস্য। একটি কৃশকায় ছাত্র চলিতে চলিতে ফিরিয়া চাহিল। একজন ছাত্রী বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

অদ্ভুত কল্পনা তোমার! আমি রোমান সুন্দরীই বটে! আচ্ছা, প্রবীরকে কি মনে হ'ল?

সেক্সটাস।

তীব্র দৃষ্টিতে ভৎর্সনা হানিয়া চাপা গলায় মালিনী বলিল, ছিঃ!

ছয় মাস পরে।

মালিনীর গৃহে সান্ধ্যভোজন। উপলক্ষ্য কিছু নহে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

প্রবীর বসিয়া ছিল বাঁকানো সেটিতে অলস ভঙ্গিতে। হাতে তাহার ধূমায়মান সিগারেট। সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া উজ্জ্বল হীরক-অঙ্গুরীয়কে অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিম অধরোষ্ঠে ইস্পাতের মত ধারালো কৌতুকের হাস্য। চোখে নরম, প্রেমজড়িত আদরের দৃষ্টি। সকলের সম্মুখে যাহা মুখে আসে না, তাহা যেন দৃষ্টির সহিত সে মালিনীকে নিবেদন করিতেছিল। প্রতিটি কটাক্ষ যেন তাহার এক একটি চুম্বন।

মালিনী আমার পাশে বড় সোফায় বসিয়া ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছিল। আজও সে পরিয়াছে রক্ত-গোলাপ রঙের রেশমী শাড়ি। কালো চুলে জড়ানো তাহার গোলাপের মালা, হাতে লাল গালার জরি-জড়ানো চুড়ি, কানে গলায় লাল প্রবালের গহনা। এ যেন জলন্ত বহ্নি-শিখা, উদগ্র-কামনায় জ্বলিতেছে কাহাকেও আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত।

আর ওই যে স্তিমিত-গৌর তরুণ পুরুষ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অর্দ্ধশয়ান, যাহার ললাটে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হইতেছে, অলস তন্দ্রার ছায়া রমণী-সুলভ আঁখিপল্লবে বাসা বাঁধিয়াছে, যাহার সবল দীর্ঘ তনু প্রেম ও কামনায় প্রোজ্জ্বল—সেও এই একই অগ্নি। আগ্নেয়গিরির ভস্ম-আবরণে সে প্রসুপ্ত। তাহাকে চেনা যায় না; অথচ তাহারই অগ্নি-উদ্গীরণে একদিন ধ্বংস আসে—কত পম্পিয়াই তাহার লাভাস্রোতে ভাসিয়া যায়। একই বহ্নি উভয়কে আকর্ষণ করিতেছে প্রবল বেগে, শুধু তাহার রূপ বিভিন্ন। সর্বনাশা এই মোহ, কে কাহাকে গ্রাস করিতে পারিবে ঠিক নাই।

আমার অবশ দেহে মালিনীর রক্ত-অঞ্চল বহুবার লাগিতেছে। তাহার চপল বাহু কতবার আমাকে ছুঁইয়া গেল। কতবার আমার কাঁধে সে করাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া আমার চোখের উপর নত হইয়া হাসিল। কি অন্ধ আকর্ষণ তাহার দিকে আমাকে অহরহ টানে! প্রতিটি রক্তকণিকা তাহাকে খুঁজিয়া ব্যর্থ প্রতীক্ষায় মন্থর হইয়া যায়। পুরুষের বুভুক্ষু যৌবন নিয়ত তাহাকে প্রার্থনা করে। মনে হয়, কত দিন হইতে চিনি তাহাকে। কত নীল সমুদ্রের পাশে তাহার আঁখি আমাকে সঙ্কেতে ডাকিয়াছে। কত দুর্বার রণক্ষেত্রে তাহার মুখের ছবি আমার শত্রু-রক্ত-স্নাত হস্তে বল যোগাইয়াছে। আমি তাহাকে চিনি। জন্মজন্মান্তর হইতে তাহার সহিত আমার যোগাযোগ। কিন্তু এ জন্মে অমর সোম বৃথাই মালিনী সেনকে চাহিয়া মরে। মালিনী জনারণ্যে তাহার সে চেনা মুখখানি ভুলিয়া গিয়াছে।

যাই বল মালিনী, ছেলেমেয়েতে বন্ধুত্ব আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে 'আবাহনে' একটা কবিতা লিখেছিলাম আমি বছরখানেক আগে। আর নিছক নিরামিষ বন্ধুত্বের প্রয়োজন কি? যদি মনে দোলা লাগে, লাগুক। কারও কোনও ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুখ পেলে কেন ছেড়ে দেব?—হাতের সিগারেটের দিকে চাহিয়া প্রবীর চিন্তিতভাবে বলিল।

মালিনী হাসিল। মনে হইল সে যেন ধরিয়া লইয়াছে, প্রবীরের উচ্ছৃঙ্খল কথাবার্তার সহিত তাহার চরিত্রের কোন যোগ নাই। অধিকাংশ শিল্পীর মত প্রবীরও আত্মপ্রতারক। উন্নতমনা, সংযমী প্রেমিক তাহার মধ্যে চিরজাগ্রত। মুখের কথায় প্রবীর অন্তরকে গোপন করিতেছে।

মনে হইল চীৎকার করিয়া বলি, মালিনী, মালিনী! এত তেজ, এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভুল ক'র না। প্রবীর গুহর খেলাই এই। সে যা মনে করে, হাসির ছলে অন্য পক্ষকে পূর্বেই তা জানিয়ে দেয়। অপর পক্ষ যদি সেটাকে পরিহাস বা মুখের কথা মাত্র মনে করে, তবে দোষ প্রবীরের নয়।

প্রবীর চুম্বনের ভঙ্গিতে অধর অগ্রসর করিয়া সিগারেট ধরিল। মৃদু টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল, বিবাহের প্রয়োজন নেই, নিরামিষ বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন নেই। জগৎটা কেবল দেখে যাও। আনন্দ, আনন্দই সার। জীবন ক্ষণিকের। তাই বলি মালিনী, পুরুষের বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'র না। কারণ—

"Friendship's cool water
Any moment can change into wine."

মালিনীর দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলাম, বন্ধুত্বের শীতল পানীয় তাহার কাছে বহু পূর্বেই সুরায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

সকলকে বিদায় দিয়া মালিনী বাগানে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চৈত্রের রাত্রি, আকাশে ভরা জ্যোৎস্না তাহার বক্র অধরে, তীক্ষ্ণ নয়নে, কালো চুলে।

প্রবীরকে নিয়ে একটু বাড়িয়েছ, মালিনী। এখনও সাবধান হও। প্রবীর ভাল ছেলে নয়।

মালিনীর দীপ্ত সৌন্দর্য জ্বলিয়া উঠিল। ভাল কি মন্দ, তা নিয়ে লোকের মাথা-ব্যথা কেন? ভাল ছেলে দেখে দেখে আমার অসহ্য হয়েছে। আমি শিশু নই অমর, মনে রেখো।

মরিয়া হইয়া বলিতে লাগিলাম, প্রবীরদের বাড়ি অত্যন্ত সেকেলে। আর, তুমি তো জান, ও বিবাহে বিশ্বাস করে না। এখন তো দূরের কথা, কোন দিনই হয়তো বিয়ে করবে না মালিনী, বিপদে পড়বে তুমিই, কারণ তুমি ওকে যতটা ভালবেসে ফেলেছ, ও তোমাকে তা বাসেনি।

আহতা সর্পীর মত মালিনী দেহ আকুঞ্চিত করিল, সুর্মালাঞ্ছিত ছুরির ফলকের মত সঙ্কীর্ণ তাহার চক্ষু সর্পীর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চোখে ঘৃণা ও দম্ভ।

কি পাগলের মত বকছ, অমর? বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না এখানে। প্রবীরকে আমি হয়তো ভালবেসেছি; না জেনে অস্বীকার করব না। কিন্তু আমি জানি, আমার ভালবাসার ও যোগ্য। লোকে ওকে বোঝে না, ওর প্রতিভার মূল্য মিনমিনে বাংলা দেশ দিতে পারে না। তোমরা, তথাকথিত শুদ্ধ শান্ত ভাল ছেলেরা, ওর মুখের কথা, বাইরের ব্যবহার দেখে ভুল কর। বড় সুন্দর মন প্রবীরের। আমি ওকে ঠিক চিনেছি। সমস্ত সামাজিক বন্ধন, সংস্কারের ওপরে প্রবীর গুহ। অসাধারণ ওর ব্যক্তিত্ব।

নদীর ধ্বংসমুখী তীরে দাঁড়াইয়া আছে আমার প্রিয়া। তাহাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। অদৃশ্য বিপদ তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সরল শিশুর মত নিজের পবিত্র নির্ভরশীল মন দিয়া সে বিশ্বের বিচার করিতে চায়।

আবার তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, তুমি প্রবীরকে বোঝনি মালিনী, যতই তোমার বুদ্ধি থাক বা দীপ্তি থাক। চিরকাল বাংলার বাইরে তুমি

মানুষ, সরল খোলা জীবন তোমার, মানুষের জটিলতা-কুটিলতার সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। মালিনী, তুমি সৎ মেয়ে, অসৎ পুরুষের কামনা বোঝা তোমার সাধ্যের বাইরে। প্রতিভা আছে প্রবীরের, কিন্তু সে প্রেমিক নয়, কামুক।

অমর, অনেকক্ষণ তোমার ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা সহ্য করেছি, আর নয়। মনে রেখো, প্রবীর আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই। আমার সঙ্গে প্রবীরেরও বন্ধুত্ব আছে, তোমারও তাই। কিন্তু সে তো কখনও আমাকে উপদেশ দিতে আসে না?—মালিনী সম্মুখের গাছ হইতে দুইটি ফুল ছিঁড়িয়া সরোষে কুটিকুটি করিয়া ছড়াইয়া ফেলিল।

যন্ত্রণায় আমার মুখ নীল হইয়া গেল। চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো মালিনীর অর্ধচন্দ্র ললাটে নিজের ছায়া দেখিতেছিল। শিথিল তাহার কেশবন্ধন, আঁখিতটে বিপুল শ্রান্তি। বক্র রক্ত-অধরে তাহার চাঁদের আলো। আজ যেন সে অধর তত বক্র, তত উদ্ধত নয়। যেন অন্য অধর তাহাকে নিজের বলে নত করিয়াছে। তাহার অধরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতি কষ্টে আবার বলিলাম, উপদেশ দিচ্ছি না, মালিনী, বন্ধুত্বের দাবীতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। তোমার ভাবালু কবি মন এ পৃথিবীতে চলে না। প্রবীর তোমার মত নয়। তুমি যা, বাইরে সে তারই ভাণ মাত্র। কিন্তু ও কি মালিনী, ও কি তোমার ঠোঁটে—প্রবীর কি—? মালিনী, মালিনী, উত্তর দাও।

আহত পশুর মত বেদনায় আমার স্বর নির্জন রাত্রিতে বীভৎস শুনাইল।

গর্বিতা রাণীর ভঙ্গিতে মালিনী গ্রীবা বক্র করিল।—হাঁ। যা অনুমান করেছ সত্যি। প্রবীর আমাকে চুম্বন করেছে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো তাকে ভালবাসি।

তাহার পর প্রায় পনেরো দিন মালিনীদের বাড়ি যাই নাই, কথাবার্তাও হয় নাই। ক্লাসে দেখি, সম্রাজ্ঞীর মত মালিনী নির্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসে, কোন দিকে না চাহিয়া ক্লাসের শেষে চলিয়া যায়। আর মাঝে মাঝে দেখি বিকালে তাহার গাড়িতে প্রবীর গুহকে।

সন্ধ্যার ছায়া টাইবারের তীরে তীরে নামিয়া আসিয়াছে। কুঞ্চিত কেশ মেষপালকেরা অঙ্কুশহস্তে দুগ্ধফেনের মত শুভ্র মেষকুলকে গৃহে লইয়া যাইতেছে। দূরে উচ্চ পর্বতবক্ষে মিনার, গম্বুজ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। গোধূলির মুমূর্ষু

আলো রোমকে স্বর্ণফলকে মুড়িয়া তুলিয়াছে। স্বপ্নকুহেলিমণ্ডিত প্রাসাদগৃহে সুপ্তা সুন্দরী। কত যুগের অন্ধকার-বিস্মৃতি যেন দূরে সরিয়া গেল, মনের গহন অতল হইতে নিদ্রিত অনুভূতি আবার জাগিয়া উঠিল। আবার প্রতিশোধের অনল দেহে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। সেক্সটাসের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া লোলুপ অসি উদ্যত হইতে চায়।

নিরুদ্ধ কামনাভারে দেহ মূক। লুক্রেশিয়ার ঘুমন্ত অধরে সেক্সটাসের অধর। লুক্রেশিয়ার দেহবল্লরীর উপরে সেক্সটাসের কঠিন দেহ নামিয়া আসিতেছে ধীরে—অতি ধীরে।

বদ্ধকণ্ঠে স্বর আসিল না, চমকিয়া জাগিয়া দেখিলাম, শয্যা ঘর্মাক্ত। প্রবীর গুহ তাহার কাগজের জন্য একটি কবিতা চাহিয়াছে, তাহাই লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নের স্পর্শ তখনও যেন চোখে লাগিয়া আছে। তখনও যেন কানে লুক্রেশিয়ার আর্ত হাহাকার ভাসিয়া আসিতেছে। কত দূর শতাব্দীর পারে বসিয়া সে যেন আহ্বান করিতেছে। তাহার হৃদয়মথিত করুণ রোদন আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, কোলাটিনাস! কোলাটিনাস!

এ ডাক না শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার চিত্ততন্ত্রী এই এক সুরে বাঁধা যুগ যুগ হইতে। জানি, আমাকে যাইতে হইবে।

ক্ষিপ্রহস্তে বেশভূষা সারিয়া লইলাম। মালিনীর বাড়ি সন্ধ্যার পর পৌঁছিলাম; বাহিরের ঘরে মালিনীর অধ্যাপক-দাদা ও ব্যারিষ্টার—দাদা উচ্চস্বরে আলোচনায় রত। মালিনী মাতৃহীনা, তাহার বড়বউদিদি রাস্তার দিকের জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সাদর আহ্বান চিরদিনই মালিনীর বাড়িতে পাই। প্রশ্নের উত্তরে শুনিলাম, মালিনী কলেজ হইতে এখনও বাড়ি ফেরে নাই, সঙ্গে গাড়িতে আছে কেবল প্রবীর গুহ। অধ্যাপক বলিতেছে, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমার। স্ত্রীশিক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারিতা। ব্যারিষ্টার আমার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, এ তোমার বেশি বলা হচ্ছে, দাদা। কলেজের বন্ধু, ভদ্রঘরের ছেলে। তার সঙ্গে বেড়াতে গেছে তাতে ক্ষতি কি? মেয়েদের কি এতই ঠুনকো মনে কর—এতই দুর্বল? আর মালিনী সে জাতের মেয়ে নয়। নিজের ভার সে নিজে নিতে জানে।

আমার দিকে চাহিয়া অধ্যাপক চুপ করিলেন। হায়! তাঁহারা মনে করেন, মালিনীর বরমাল্য একদিন আমার কণ্ঠেই পৌঁছিবে।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। যে যাহার কাজে চলিয়া গেলেন, আমারই প্রতীক্ষা শুধু শেষ হইল না।

অবশেষে গভীর রাত্রে এক গাড়ি আসিয়া থামিল। দেখিলাম, এক ছায়ামূর্তি নামিয়া অসংলগ্ন দ্রুতপদে পিছনের দ্বার দিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলাম, মালিনী!

সহসা তাহার ক্ষীণ দুই বাহু আমার কণ্ঠে বেষ্টন করিয়া ধরিল, আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া মালিনী কাঁদিয়া উঠিল। দেবতার মন্দিরে পূজারীর মত সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় দুই হাতে আমি সেই চিরপ্রিয় মুখখানি তুলিয়া দেখিলাম।

চক্ষু তাহার আরক্ত, অধর বিশুষ্ক ও স্ফীত। কবরীর বন্ধন অর্ধেক খুলিয়া চুল জটাতে পরিণত হইয়াছে; শাড়ির স্থানে স্থানে কাদা, গায়ের জামা ছিন্ন, সমস্ত শরীর তাহার যেন কেহ শুষিয়া মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আমার নিকটে মালিনী কম্পিত ভগ্নস্বরে সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। সে ও প্রবীর বেড়াইতে গিয়াছিল লেকে, ফিরিবার পথে প্রবীর তাহাকে গড়িয়াহাটার নির্জনতম কোণে তাহাদের একটা বাগান-বাড়ি দেখাইতে লইয়া যায়। তাহার উদ্দেশ্য মালিনী বুঝে নাই, মালিনী তাহাকে বিশ্বাস করে। গাড়ি অনেক দূরে ছিল, বাগানবাড়ি নির্জন। বসিবার ঘরে প্রবীর তাহাকে লইয়া প্রেমাভিনয় আরম্ভ করে। মালিনী প্রথমে তাহাকে প্রশ্রয়ই দিয়াছিল, কিন্তু শেষে প্রবীরের কামনার মাত্রা দেখিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পলাইতে সমর্থ হয় নাই। কুমারী-জীবনের চরম অসম্মান তাহার হইয়া গিয়াছে।

সর্বশরীর মালিনীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, নিদারুণ শ্রান্তিতে, আত্মগ্লানিতে সে অবসন্ন। শিশুর মত তাহাকে বক্ষে তুলিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলাম, সস্নেহে শয্যায় শোয়াইয়া দিলাম। চক্ষের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, ডাক্তার ডাকি?

না অমর, না। আমার লজ্জার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ যেন জানে না। উঃ, লোক-জানাজানি হবে ব'লে কুকুরটাকে শিক্ষাও দিতে পারব না, এই আমার ক্ষোভ!—নিরুপায় ক্রোধে মালিনী শুভ্র মুক্তাদন্ত দিয়া বিছানার চাদরখানা ছিন্ন করিতে লাগিল।

লোক-জানাজানি হবে না, তাকে শিক্ষাও তুমি দিতে পারবে, মালিনী। আমি এখনই যাচ্ছি। এখনও তো সে গড়িয়াহাটার বাগান-বাড়িতে আছে বলছিলে না?—অসহ্য হৃদয়াবেগ দমন করিয়া শান্তস্বরে বলিতে পারিলাম।

তুমি যাবে? তুমি যাবে অমর?—উত্তেজনায় মালিনী শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, দুই হাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যাও। আমি, আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি, সেই কষ্ট সেটাকে দিতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর অমর, এর শাস্তি তুমি দেবে তাকে? দয়া ক'রে ছেড়ে দেবে না? মাটিতে তার মাথা লুটিয়ে দিয়ে সেই মুখ জুতো দিয়ে থেঁতলে দিও। যে হাতে ঘৃণ্য প্রবৃত্তিতে আমাকে ধরেছে, সেই হাত তার জন্মের মত ভেঙে দিও। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ভাল সে আমাকে বাসেনি। আজ স্পষ্টই বলে দিল।

আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। আবার শতাব্দীর বিস্মরণের পরপার হইতে সেই গীতি বাজিয়া উঠিল।

"Revenge on him, that made me stop my breath !"

দরজার বাহিরে আসিতেই কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আহ্বান আসিল দুর্বল ভগ্নস্বরে, অমর!

দেহ তখন আমার রোমান বীরের বীর্যে উদ্বেল, তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য হয় না। কিন্তু যে কণ্ঠের একটি মাত্র আহ্বান আমাকে মৃত্যুর তীর হইতেও ফিরাইতে পারে সে কণ্ঠের আহ্বানে আবার ফিরিলাম।

বালিশে মুখ লুকাইয়া, অস্পষ্ট স্বরে মালিনী কহিল, কিন্তু, তাকে প্রাণে মেরো না, অমর।

প্রবীর গুহের সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই রাত্রে গড়িয়াহাটার রাস্তায়। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম পথের পাশে।

প্রবীর আমাকে চিনিয়াছিল, কারণ আমি মুখে কোনও মুখোস ধারণ করি নাই, এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্বে প্রস্তুত হইবার সময় দিয়া আক্রমণের কারণ খুলিয়া বলিয়াছিলাম। তাহার পরের ঘটনা সকলেই জানিয়াছে। প্রবীর শক্তিশালী, নিজেকে রক্ষার চেষ্টাও তাহার প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু

আমি, আমি তো তখন শুধু বিংশ শতাব্দীর অমর সোম ছিলাম না, আমি তখন কোলাটিনাস।

প্রবীর আমার নাম পুলিসের নিকট করে নাই, ইহাও তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয়।

মালিনী আজও বাঁচিয়া আছে—আমিও আছি। লুক্রেশিয়ার পরিণতি তাহার হয় নাই। কিন্তু সে আমার কাছে আজ মৃতা। সে অন্যোপভুক্তা বলিয়া আমি দূরে সরিয়া যাই নাই—অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কিন্তু আমার যাহা জানিবার, তাহা সেই চরম অবমাননার সময়ে তাহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি। তাহার যন্ত্রণা আমি ভুলিতে পারিয়াছি, ভুলিতে পারি নাই কেবল তাহার মুখের একটা কথা—তাকে প্রাণে মেরো না, অমর।

রোমের প্রাচীন গাথায় ও মহাকবি শেক্সপীয়রের কাব্যে একটি ভুল ছিল, আমার জীবনে তাহার সংশোধন হইয়া গিয়াছে।

আমার লুক্রেশিয়া আজীবন সেক্সটাসে আসক্তা।

মীডিয়া

অন্ধকার বিস্মরণীর তীরে আজও মীডিয়ার অশান্ত আত্মা বর্তমানকে স্পর্শ করিতে চায়। নারী আজও প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে জানে। আজও সে প্রতিশোধ লইতে ভুলিয়া যায় নাই। সহস্র যুগের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া নিখিল নারীর মধ্যে মীডিয়া আজিও চির জাগ্রত!

আমার মন একটি ঘোলা জলের হ্রদ। তরঙ্গ নাই, স্রোত নাই, স্বচ্ছ জলশোভার একান্ত অভাব। বাহির হইতে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ হইলে একবার মাত্র আন্দোলিত হইয়া ওঠে। আবার সে নিস্তরঙ্গ, নির্বিকার। কিন্তু আজকাল আমিও স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি। আমি স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি সেইদিন হইতে, যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী নিমন্ত্রণ বাটিতে এক বিবাহিতা রমণীর মুখে নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ নিক্ষেপ করে।

আজও স্বপ্ন দেখি। কত স্বপ্ন! দূরে, বহুদূরে তমিস্রার পটভূমিতে গ্রীক বীর জেসন্,—পঞ্চাশক্ষেপনীতে নৌকা দ্রুত চলিয়াছে। কোথায় কলকিস্, কোথায় স্বর্ণময় মেষরোম। দাক্ষময়ী আথীনা পথনির্দেশ করিতেছেন: সন্ধান পাইলে রাজ্যহারা রাজপুত্র রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।

পঞ্চাশক্ষেপনীতে নৌকা চলিয়াছে—বন্য পার্বত্যভূমি তীর রচনা করিয়া দূরের ইঙ্গিত পাঠাইতেছে। হারকিউলিসের হাস্যধ্বনিতে সমুদ্রতরঙ্গ প্রকম্পিত। পার্শ্বে সমাসীন যুগল অশ্বিনীকুমার—'ক্যাষ্টর্' ও 'পোলাক্স্'।

তরণী চলিয়াছে—দূরে, বহুদূরে যেখানে মীডিয়ার তরুণ আঁখি-পল্লবে প্রেমের স্বপ্ন। আরো দূরে উদ্যানের শ্যামশোভাকে প্রদীপ্ত করিয়া জ্বলিতেছে সেই পুরাণ-কথিত স্বর্ণময় মেষরোম। নীচে তাহার রক্ষী চিরবিনিদ্র ড্রাগন্। যাদুকরী তাহাকে নিদ্রাগত করিল। স্বর্ণময় মেষরোম ঈটিসের রাজ্য হইতে অপহৃত হইল। অপহরণকারী জেসনের সহিত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সভ্য গ্রীসে চলিয়া গেল—ঈটিসের কন্যা মীডিয়া। হায় প্রেমের সম্মোহন শক্তি।

পট পরিবর্তিত হয়। আবার স্বপ্ন দেখি। কোথায় কুয়াশাচ্ছন্ন ছায়াভূমিতে বিচরণ করিতেছে মীডিয়া। সে শুভ্র মরালগ্রীবা ফিরাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে।

আর তাহার সে অশ্রুতে জেসনের রাজ্যসম্পদ ধীরে ধীরে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। অগ্নিময় পরিচ্ছদ জেসনের নবপরিণীতাকে দগ্ধ করিল, দগ্ধ করিল তাহার পিতা নৃপতি ক্রীয়নকে।

সভয়ে দেখিলাম জলন্ত অগ্নিশিখা রাজপুত্রীকে বেড়িয়া ধরিয়া অনির্বাণ ক্ষুধায় জলিতেছে। এলায়িত কেশে তাহার জলিতেছে জলন্ত কিরীটি—সপত্নীকে মীডিয়ার উপহার। সভয়ে দেখিলাম তাহার মৃত্যুদহন, যেন বিবশ শ্রবণে আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল—"Ah me! Ah me!" ক্রীয়নের ধ্বংস দেখিলাম আর,—আর দেখিলাম রক্তাপ্লুত হস্তে ড্রাগনবাহিত রথে মীডিয়াকে। নিহত পুত্রকন্যার পার্শ্বে ভূমিলুন্ঠিত জেসনকে শুনিলাম বিলাপ করিতে। মীডিয়াকে ত্যাগ করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশোধ তাহাকে মীডিয়া দিয়াছে, স্বহস্তে নিজ পুত্রকন্যাকে হত্যা করিয়া। ঝড়ের গতিতে উদ্দাম রথ ছুটিয়া চলিল, সন্তানহন্ত্রী মীডিয়া অট্টহাস্য করিতেছে—সে উন্মাদ হাস্য। আজও যেন আকাশে বাতাসে তাহার মূর্চ্ছনা ভাসিয়া রহিয়াছে।

বিস্মৃতির সীমান্ত প্রদেশ হইতে কথনো কথনো সে হাসি বর্তমানযুগে চলিয়া আসে, মুহূর্তের জন্য নারীকে পাগল করিয়া দেয়। ভুলাইয়া দেয় সভ্যজগতের পরিবেষ্টন, লজ্জাজড়িত ভীরুতা। আবার প্রত্যাখ্যানের বেদনা, প্রেমের বেদনার উর্ধ্বে জাগিয়া থাকে প্রতিশোধের বাসনা। শিরায় শিরায় অনলশিখা নৃত্য করিয়া যায়. মুহূর্তের বিক্ষোভে বর্তমান ভবিষ্যৎ লুপ্ত হয়। পাপ পুণ্য সমস্ত কিছু অতলে রসাতল লাভ করে, বিশ্বজগতকে সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে আদিম প্রতিশোধ প্রবৃত্তি। যে প্রেম গৃহছাড়া করে, সেই প্রেমেরই প্রতিক্রিয়া এখনো প্রবল। মীডিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র ছাত্রী-আবাসে সন্ধ্যা ছয়টায় আলো জালিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম। ঈশ্বর যখন ধার দেন নাই তখন ভারের আবশ্যকতা বুঝিয়া অহোরাত্র নোটখাতা এবং ছোট অক্ষরে ছাপা পুস্তকের উপর ঝুঁকিয়া অবসর যাপন করিতাম। ইংরেজিতে এম-এ পড়িতেছি বিদেশী-সাহিত্যে অনুরাগিণী বলিয়া নহে, উপার্জনের সুলভ উপায় বলিয়া। আমার পিতৃবংশ সাতপুরুষে কেরানি, বাবা এখনো আসামে তাহাই করিতেছেন। সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর উর্ধ্বে আমার ধারণা উঠিত না। নিভৃত গৃহকোণে

বসিয়া অধ্যয়নতপস্যা ভিন্ন বাইশ বছরের জীবনে আমার কিছু করিবারও ছিল না।

কিন্তু সেদিন ঘোলা জলের হ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষেপ হইল, দক্ষিণের বন্ধ দ্বার খুলিয়া আমার টু-সীটেড্ রুমে 'মেট্রনে'র সহিত প্রবেশ করিল—সে!

অসাধারণ কিছুই সেদিন দেখি নাই আয়ত চক্ষু দুইটি ভিন্ন। সে চক্ষে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা বাসা বাঁধিয়াছে। কেউটিয়ার কৃষ্ণ ত্বক্ অপেক্ষা তাহাদের কৃষ্ণতা আরো নিবিড়। দুর্লভ কালো হীরকখণ্ড কে যেন বাঙালী মেয়ের সাধারণ লালিত্যপূর্ণ, সুশ্রী মুখে বসাইয়া রাখিয়াছে। কালো দুইটি কেউটিয়া! যেন চক্ষু দিয়াই সে কাহাকে মৃত্যু-দংশন করিতে পারে।

'বব্' করিয়া ছাঁটা, তৈলবিহীন ঈষৎ সোনালী চুল নাচাইয়া সে আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আর সেই হাসির সহিত আমার নিঃসঙ্গ জড় চিত্তে সে একেবারে প্রবেশ লাভ করিল।

মেট্রন্ চারুশীলা হাজরা পরিচয় করাইয়া দিলেন—এই তোমার রুম্ মেট্ হোলো, শান্তি। তোমাদের 'ইয়ারেই' ইতিহাসে ভর্তি হয়েছে ও। সব দেখিয়ে দিও-টিও।"

মেট্রন চলিয়া গেলে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি ভাই?"

হাতের 'অ্যাটাশে কেস্' খুলিয়া সবুজ নরম চামড়ার একজোড়া চটি বাহির করিয়া সে চৌকিতে বসিয়া উত্তর দিল, "কঙ্কা।"

চকিতে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একটি নাম স্মৃতিপথে উদয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম "পদবীটা কি?"

নীচু হইয়া পায়ের ফিতা-বাঁধা হাঁটিবার জুতা খুলিতে খুলিতে অস্পষ্ট স্বরে কঙ্কা বলিল, "মণ্ডল।"

"তুমিই কি এবারে ইতিহাস অনার্সে ফার্স্ট হোয়েছো?" মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা হাসিল—"হ্যাঁ।" সে হাসি আনন্দের বা গর্বের নহে, সে হাসি কৌতুকের।

প্রায় দুই মাস পরে একদিন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ চলিলাম কঙ্কার সহিত দেখা করিতে। এক ঘরেই থাকি, তথাপি দুই এক ঘণ্টার অবকাশ থাকিলে তাহারই কাছে যাইবার কথা মনে হয়।

তেতালায় মেয়েদের বসিবার অন্ধকার ও লম্বা ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লাল জুতা-পরা পদদ্বয় আন্দোলিত করিয়া কঙ্কা টেবিলে সমাসীন অবস্থায় তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম নিকটে টেবিল পাইলে সে কখনই চেয়ারে উপবেশন করিত না, আর যেখানেই সে উপবেশন করিত ধীরে ধীরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি জনতা গড়িয়া উঠিত।

আমাকে দেখিয়া মিমি দত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, "স্বাগতম্, এই যে শান্তি মিত্র রুমমেটের সন্ধানে এসে হাজির হয়েছে। নইলে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ আশুতোষ বিল্ডিং-এর মেয়ের পায়ের ধূলো পড়ে কদাচিৎ।"

কোণের ঈজি চেয়ারে অর্ধশায়িতা হলদে-ডুরে শাড়ী পরা কালো মেয়েটি টিপ্পনী দিল—"Mating instinct-টা ওঁর প্রবল দেখা যাচ্ছে।"

হাসি ঠাট্টায় বিব্রতপ্রায় আমাকে কঙ্কা সাদরে আহ্বান করিল, "এসো এদিকে শান্তি। এখন ছুটি বুঝি? বেশ হয়েছে, আমারও তাই।"

আমাদের হস্টেলের বরুণা প্রশ্ন করিল, "কঙ্কা, তুই কেন ইংরেজি নিলি না? তাহ'লে শান্তির এক পলের জন্য বন্ধুবিরহ সইতে হোত না? তুই তো ইংরেজিতে এত ভালো!" কঙ্কা পরম তাচ্ছিল্যে উত্তর দিল, "সিলেবাসের বই খুলে দেখলাম সমস্ত ইংরেজি বইগুলো বহুবার পড়া। তাই অত পড়া জিনিষ আর পড়তে ভালো লাগলো না।"

কয়েকটি মেয়ে হাস্য গোপনের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আমি জানি কঙ্কা সত্য কথাই তাহাদের বলিতেছে। কঙ্কাকে শান্তনির্জীব বাঙালী মেয়েরা সহ্য করিতে পারে না। তাহার প্রখর বেশভূষা, মুক্ত ব্যবহার কিছুই তাহাদের প্রীতিদায়ক নহে। তবু তাহার সহিত আলাপ রাখিলে লাভ আছে। বি-এ তে সে প্রথম হইয়াছে, হয়তো এম-এ তেও হইবে। তাহার নিকট হইতে নোট সংগ্রহ করা এবং তাহার পঠনপ্রণালী শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। তদুপরি কঙ্কা মণ্ডলের ব্যয়কুণ্ঠাহীন আতিথ্য বিখ্যাত। তাই এই সব সুবিধা-বাদিনীরা গোপনে তাহার নিন্দামুখর হইয়া উঠিলেও প্রকাশ্যে তাহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিত। হীরকের উজ্জ্বলতা যে সকলকে আকর্ষণ করিবেই। কঙ্কা অন্যমনস্কভাবে শিস্ দিয়া গান করিতে লাগিল। মেয়েরা কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিবার পরে হলুদ ডুরে ধারিণী বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শিস্ দিচ্ছ কেন? এটা 'কো-এডুকেশনের' কলেজ জানো না?"

তাহার তিক্ততাকে তাড়াতাড়ি ঢাকিবার জন্য মিমি দত্ত সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শিস্ দিলে ভাই তোমার মা বকেন না ?"

উদ্ধত স্বরে উত্তর হইল, "মা-ই নেই। So what ?"

কুটিল দৃষ্টিতে কঙ্কা মিমি দত্তের দিকে চাহিল। মিমি দত্ত অপ্রতিভ স্বরে সান্ত্বনা প্রকাশের চেষ্টা করিল, "আহা আমি ভাই জানতাম না।"

"জেনেও দরকার নেই। শান্তি, চলো বাড়ি যাই।"

চিতাব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতায় কঙ্কা মেঝেতে নামিল।

বরুণা সবিস্ময়ে বলিল, "ওকি, চারটের সময় যে 'এ-কে-আর'-এর ক্লাস ?"

"আজ পড়তে ইচ্ছা করছে না। আমি চললাম।"

বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। কঙ্কার কাগজপত্রে আমাদের ছোট ঘরটি ভরিয়াও সঙ্কুলান হয় নাই। বিস্তর বকাবকি করিয়া মেট্রন্ অবশেষে পাশের বারান্দা ঢাকিয়া বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

টেবিলের দেরাজ হইতে চকোলেটের বাক্স বাহির করিয়া একটি নিজের মুখে দিয়া কঙ্কা বাক্সটি আমার দিকে ঠেলিয়া দিল। আমাদের দুই জনের চৌকির মধ্যে সে একটি বড় আয়না লাগাইয়াছে। সেই দর্পণে আমাদের উভয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

দেখিলাম তাহাকে—প্রাণমদিরায় উচ্ছ্বসিত, পূর্ণযৌবন সুগঠন দেহ। সে সৌন্দর্য উগ্র, কিন্তু পরিপুষ্ট অধরে, হ্রস্ব চিবুকে অনন্ত কোমলতা। পূর্বে লক্ষ্য করি নাই এখন দেখিলাম দীর্ঘ গ্রীবা তাহার রজনীগন্ধার দণ্ডের মত সবল, অলকগুচ্ছ আঙুরের শোভনতায় দোদুল্যমান। অতি পাশ্চাত্য বেশভূষা ও ভাবভঙ্গি তাহার লীলাময় সারল্যে বিন্দুমাত্র বন্ধন দিতে সক্ষম হয় নাই।

দেখিলাম নিজেকে—নিষ্প্রভ, ভীরু দৃষ্টি ; স্বাস্থ্যহীন, ক্ষীণ দেহ, ব্রণলাঞ্ছিত, ভাবলেশশূন্য মুখমণ্ডল। বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা, আনন্দহীন চিত্ত শৃঙ্খলের কঠোরতায় যৌবনকে চাপিয়া রাখিয়াছে। ওই লীলাপ্রতিমার উপযুক্ত সঙ্গিনী বটে ! দুইখানি চিত্তের অসমতায় হৃদয় ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু, তাইতো কঙ্কাকে এত ভালবাসিয়াছি ! আমি জীবনে যাহা হইতে পারিলাম না, অথচ যাহা চিরদিন আমার মানসস্বপ্ন ছিল—তাহাই কঙ্কা আমার চোখের সম্মুখে মূর্তি ধরিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। আমি যাহা হইতে পারিব না কঙ্কা

তাহাই। তাইতো কঙ্কাকে এত ভালবাসি! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, অত সুন্দর চুলগুলো কেটে ফেলেছ কেন, কঙ্কা?"

পরম তাচ্ছিল্যে কঙ্কা উত্তর দিল, "কি হবে চুল রেখে? তেল দাও, চুল আঁচড়াও, বাঁধো! তার ওপর পিঠের উপরে পড়ে গা সির্‌সির্ করে। এই ভালো।" কঙ্কা মাথা বাঁকাইয়া উচ্চস্বরে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। চারিপাশের দেওয়ালগুলিতে সে হাসি বন্দীর ব্যর্থতায় আঘাত করিয়া আসিল। আয়নার দিকে তাকাইয়া চিন্তিত স্বরে কঙ্কা বলিল, "চুল কি আজ কেটেছি? মিস্টার বেথেল নিজে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমি ম্যাট্রিক দিয়েছি মাত্র।"

"মিস্টার বেথেল কে?"

"যে মিশনারি স্কুলে আমি পড়তাম, তারই কর্ত্রী।"

'সত্যি, বাইরের ইস্কুল-কলেজ থেকে এত ভাল করা কঠিন। বি-এও তো ওখান থেকে দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।" কঙ্কা চুপ করিয়া রহিল। কেন জানি না, বাড়ীর কথা সে কখনো বলিতে চাহিত না। এক ঘরে থাকিয়াও তাহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য ছিল। মাতাপিতাহীনা, পিসিমা ও পিসেমহাশয় তাহার অভিভাবক। পিতা তাহার জন্য অর্থ ও ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, মাসে মাসে পিসিমা তাহাকে সেই টাকা পাঠান। তাহার অন্য কোনও ভাইবোন নাই। পাবনা জেলার এক গণ্ডগ্রামে তাহার পৈত্রিক নিবাস। এইটুকু অনেক চেষ্টায় জানিয়াছিলাম। বড় ইচ্ছা হইত তাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিতে। কিন্তু সে কেন জানিনা, স্বীয় স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরব থাকিত। তাই, আমিও আজও নীরব রহিলাম।

বন্ধ জানালাটা সহসা সজোরে ধাক্কা দিয়া খুলিয়া কঙ্কা উগ্র স্বরে বলিল, "কি বিশ্রী ঘটনা? এইটুকু ঘরে দুই বছর ধরে আছ কি করে?"

অপমান বোধ হইল, বলিলাম, "এর চেয়ে ভালো হস্টেলের অভাব নেই কলকাতায়। অপছন্দ হলে সেখানে গেলেই পারো?"

আশ্চর্য সে! একটুও বিরক্ত হইল না। উত্তাপ[illegible] উত্তর দিল, "পিসিমা কিপটে! যে টাকা পাঠায়, ওসব দা[illegible] হস্টেলে থাকিলে [illegible] খরচ করব কি?"

"সে কি কঙ্কা, তোমার তো যথেষ্ট টাকা [illegible]।"
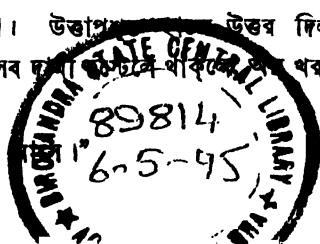
কঙ্কা মুখ ভেংচাইল—"যথেষ্ট! ভারী যথেষ্ট। ওতে কি হবে আমার? কলকাতা যা মজার জায়গা, রাস্তায় বার হলেই খরচ করতে ইচ্ছা হয়। জানো. আমি আগাগোড়া যা স্কলারশিপ পেয়েছি সমস্ত জামা-কাপড় কিনে খরচ করে ফেলেছি। পিসি বকে, বলে ঠিক বাপের ধারা ধরছে মেয়ে।" কঙ্কা গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া গেল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করিবার জন্য বলিলাম, "ওই পাড়াগাঁতে জন্মেও অতদূর পড়েছ সেইটাই আশ্চর্য। তোমাকে দেখে কিন্তু মনেও হয় না পৃথিবীর কোনো পল্লীগ্রামের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।" অনিচ্ছুক ভাবে কঙ্কা বলিল, "আগাগোড়া যে আমি মিশনারি মেমদের কাছে তাঁদের বাড়ীতে মানুষ হয়েছি, পড়াশোনায় ফল ভালো করতাম, তাঁরাও খুব চেষ্টা করেছিলেন, তাই এতদূর পড়া হয়েছে।"

"তোমার মা-বাবা বুঝি তোমার অল্প বয়েসে মারা গেছেন কঙ্কা?"

তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা বলিল, "হ্যাঁ। তুমি বড় বাজে বকো।"

অজানিতে তাহাকে বুঝি আঘাত দিলাম! জানি আঘাত তাহাকে ম্রিয়মাণ করে না, করে ক্ষিপ্ত। কথার মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলাম, "আচ্ছা, কাজের কথাই হোক্ তা হ'লে। বিয়ে-টিয়ে করবে না?"

কঙ্কা হাসিল—"করবো হয়তো। বিয়ে করবার উপযুক্ত পুরুষ তো একটিও দেখলাম না।"

"কি রকম চাও তুমি?"

কুটিল নয়নে কঙ্কার স্বপ্নের ছায়া নামিল—"কি চাই জানি না। যা চাই তা না দেখলে বুঝতেও পারবো না। কি জানি!" অনেকক্ষণ সে কি যেন ভাবিবার প্রয়াস করিল। অবশেষে বিফল প্রয়াস ছাড়িয়া দিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, "তুমি বিয়ে করবে না?"

এ কথা ভাবিবার অবকাশ নাই আমার। আমার পরে আরো চারিটি বোন। কোনক্রমে নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া বাবাকে মুক্তি দিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষার কিয়দংশ ভার লইতে হইবে। আমার ব্যবস্থা? বদ্ধ শিক্ষাসদনে প্রাহরিক চীৎকার, রজনীতে নিঃসঙ্গ শয্যা।

বলিলাম, "আমার মত কদাকারকে কে বিয়ে করবে ভাই?"

কঙ্কা সবিস্ময়ে কি যেন বলিতে যাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া

গেল। নিজের বিছানা হইতে উঠিয়া 'চকোলেট্'-মাখা হস্তে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "Never mind, ছেলেদের ছাড়াও আমাদের দিন বেশ চলে যাবে।"

সন্ধ্যার পর আমার টেবিলে বসিয়া গ্রীক্ নাট্যকার ইউরিপিডিসের মীডিয়া নাটকের ইংরেজি অনুবাদ পড়িতেছিলাম। বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়া আমাকে না লইতে পারিয়া কঙ্কা অন্য মেয়েদের লইয়া তিনটার শো'তে সদ্যাগত হ্যাম্লেটের ছায়াচিত্র দেখিতে গিয়াছে। শেক্সপীয়রের হ্যাম্লেট আমার পাঠ্য তালিকায় পড়ে না, অথচ কাল ক্লাসিক্সের ক্লাসের টিউটোরিয়াল। সুতরাং যাই নাই। কঙ্কার পড়াশোনার প্রয়োজন নাই, পুস্তকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইলেই তাহার চলিবে। কিন্তু আমার আছে। বিড়্বিড়্ করিয়া মুখস্থের ভঙ্গিতে পড়িতেছিলাম :—

"Heard ye not all she said, with a loud voice invoking Themis, who fulfills the vow, and Jove, to whom the tribes of men look up as guardian of their oaths. Medea's rage can by no trivial vengeance be appeased".

বিদ্যুৎগতিতে ঘরে ঢুকিল সে—পা হইতে মাথা পর্যন্ত কালো বস্ত্র তাহার, দু'একটি কালো কাচের গহনা। কাঁধের উপর শ্যাম্পুস্ফীত চুলগুলি বিষধরের ভীষণতায় আস্ফালন করিতেছে। আর তাহার চোখ? উত্তেজিত, মত্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন লাগলো?"

"আঃ, চমৎকার!"চেয়ারে বসিয়া তিন ইঞ্চি কালো কোর্ট্‌স খুলিতে খুলিতে কঙ্কা বলিতে লাগিল, "ফ্রেডেরিক্ মার্শকে করেছে হ্যাম্লেট্, বেসিল্ র‍্যাথ্বোনকে কাকা, এলিসা ল্যাণ্ডি হয়েছে হ্যাম্লেটের মা। আর ওফেলিয়া নর্মা শিয়ারার্। সকলেই ভালো অভিনয় করেছে, বিশেষতঃ হ্যাম্লেট্। শেষ দৃশ্যে যখন কাকাকে ছুরি মারছে"—কঙ্কা সহসা বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া আবার পুস্তকে মন দিলাম।—

—"Accost her not, beware of those ferocious manners and the rage which boils in that ungovernable spirit."

"কি দিনরাত পড় তুমি! আমার হাত হইতে বইখানা কঙ্কা আবার

ঘরে ঢুকিয়া টানিয়া লইল—"কি বই এটা ? মীডিয়া ! ও সেই আধ পাগল মেয়েটার কথা ? ভয়ানক মেয়ে ! স্বামীকে জব্দ করবার জন্য নিজের হাতে নিজের ছেলেমেয়েকে হত্যা করলো।"

চকিতে বইখানা কঙ্কা মেজেতে ছুঁড়িয়া ফেলিল—"সব এক ব্যাপার নিয়ে ! খুন, জখম, রক্তারক্তি ! দেখে এলাম হ্যামলেট্, সে ও তাই, এখানে তুমি খুলে বসেছো মীডিয়া, এ-ও তাই। যত সব !" ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে কঙ্কা ঘরের মধ্যে ফিরিতে লাগিল।

"কি হয়েছে তোমার কঙ্কা, আজ ?" বইখানা কুড়াইয়া লইলাম।

"কি জানি ! ওই সব দেখলে আমি যেন কেমন হয়ে যাই ! কেমন যেন ভেতর থেকে অস্থির লাগে আমার !" কঙ্কা বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সেদিন রাত্রে কঙ্কা বিশেষ আহারাদি করিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। অনেক রাত্রে পড়াশোনা শেষ করিয়া রাত্রি জাগরণের সাক্ষী মোমবাতিটি নির্বাপিত করিবার পূর্বে একবার কঙ্কার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। সে গভীর নিদ্রামগ্ন। চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে তাহার মুখখানি আমার আরো ভাল লাগে। ওই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক দুটি চোখকে সময়ে সময়ে আমিও ভয় করিতে শিখিয়াছি।

গভীর স্নেহে কতক্ষণ চাহিয়া ছিলাম জানি না। কঙ্কার অস্ফুট নিদ্রাজড়িত স্বরের দুটি স্বগতোক্তি আমার চেতনা আনিয়া দিল—"তারা, তারা !"

পরের দিন প্রাতে রসিকতা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই —"যতই না কেন মেমসাহেব হও কঙ্কা, হিন্দুর মেয়ে তো, রাতে ঘুমের ঘোরে দেবদেবীর নামটাই তো মুখে এল !"

তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা বলিল "কি নাম ?"

"বলেছিলে তারা, তারা !"

সবেগে আমাকে নাড়িয়া কঙ্কা উত্তেজিত স্বরে বলিল—"কি ? কি ? আর কি বলেছিলাম ?"

বিরক্ত হইলাম—"এতে অত অস্থির হচ্ছ কেন ? লজ্জার তো কিছু নেই ঠাকুর-দেবতার নামে। আর আবার কি বলবে ? তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম তো ঘুমের মধ্যে নেওয়া যায় না।"

কঙ্কা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক দ্রুততায় উত্তর দিল, "তা হবে !"

সেদিন একটায় ছুটি হইল, ছেলেদের টেনিস্ টুর্নামেণ্ট। আমাদের বরুণার দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই জয়ন্ত চৌধুরী দলপতি। বরুণার প্ররোচনায় আমরা কয়েকজন খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম।

জয়ন্ত ষষ্ঠবার্ষিক ইংরেজির ছাত্র। গত বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবার পরে সে আবার পড়িতেছে। নিখুঁত সৌন্দর্য এবং অনন্যসাধারণ ক্রীড়াকৌশল ভিন্ন বিশেষ কিছু তাহার ছিল না। কিন্তু, সুগঠিত শরীরে ক্রীড়া-উপযোগী পোষাক পরিয়া যখন সে খেলার মাঠে কর্তৃত্ব করিত, তখন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক নারীর বক্ষে বিস্ময় ও আনন্দের দোলা লাগিত।

নেটের কাছে জয়ন্ত শাদা পোষাকে দাঁড়াইয়া মনোযোগ সহকারে হাতের র‍্যাকেট্‌খানি দেখিতেছিল। গায়ে তাহার নীল খেলোয়াড়ের কোট। নভেম্বর মাসে রৌদ্রতাপে গৌরবর্ণে সূর্যের রক্তিম দাক্ষিণ্য। অতিকুঞ্চিত নিগ্রোসুলভ কেশ রৌদ্রকরপাতে জ্বলিতেছিল—golden fleece। সহসা জেসনের প্রার্থিত সুবর্ণময় মেষরোমের কথা মনে হইল। আশ্চর্য!

ব্যগ্র আগ্রহের সহিত খেলা দেখিতে দেখিতে কঙ্কা বলিল, "দেখবে, ওই সুন্দর ভদ্রলোকটি নিশ্চয় জিত্‌বেন।"

আমি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "উল্টো দিকে রঞ্জিত রায়, জেতা মুস্কিল।"

হাতের ক্ষুদ্র রুমালখানিকে নির্দয় পীড়ন করিতে করিতে নিশ্চিত কণ্ঠে কঙ্কা বলিল, "নিশ্চয় উনিই জিত্‌বেন। জিত্‌তে ওঁকে হবে-ই।" তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া গায়ের মধ্যে শির্‌শির্ করিয়া উঠিল। কালো দুইটি কেউটিয়া ফণা ধরিয়া রহিয়াছে!

খেলা শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমাদের ছোট ঘরটিতে ফিরিয়া গলা হইতে 'মাফ্‌' খুলিতে খুলিতে বলিলাম—"বিজয়ী বীরকে কেমন লাগলো কঙ্কাদেবীর? বরুণা তো আলাপ করিয়ে দিল দেখলাম।

"কেমন লাগ্‌বে মানে কি? এ কি রসগোল্লা সন্দেশ, যে চেখে দেখে বলব?" কঙ্কা বিছানায় এলায়িত ভঙ্গিতে অর্ধশায়িত হইল।

"তা যে ভাবে তুমি জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকাচ্ছিলে তা'তে মনে হচ্ছিল সন্দেশ রসগোল্লার চেয়ে লোভনীয় কোনও বস্তু থাকলে সে তাই।"

কঙ্কা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিল।

শীতকালে গলার পীড়ায় প্রায়শঃ ভুগি। টন্‌সিল-সেবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। কঙ্কা নিরুত্তরে দূর সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

ফিরিবার পথে ট্রামে তাহার অন্যমনস্ক বিষাদ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সমস্ত দিনের উৎসাহ উত্তেজনা তাহার কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে! উগ্র বিষধর চক্ষু মন্ত্রমুগ্ধ নির্বীর্যত্বে যেন ঘুমন্ত। কত যুগান্তের স্বপ্ন দেখিয়া যেন তাহারা উঠিয়া আসিল।

গরম জলে গলা ধৌত করিবার জন্য শিশি হইতে ঔষধ ঢালিয়া কঙ্কাকে বলিলাম, "ধন্য তোমার ইচ্ছাশক্তি কিন্তু। শেষ পর্যন্ত জয়ন্তকে জেতালে তবে ছাড়লে। যে ভাবে তুমি 'চীয়ার' করছিলে উনি 'পয়েণ্ট্' পাওয়া মাত্র, তাতে ওঁর তোমার উৎসাহেই জেত্‌বার কথা। মাঝে মাঝে তোমার দিকে তাকাচ্ছিলেন উনি, দেখছিলে না?

কঙ্কা উঠিয়া বসিল—"আমি জানি উনি জিত্‌বেন। আচ্ছা, উনি বরুণার কি রকম ভাই হন জানো?

জলের উত্তাপ সাবধানে পরীক্ষা করিতে করিতে উত্তর দিলাম, "কি জানি, বরুণা তো কাজিন বলে। দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই শুনেছি। বাবা আবার বিয়ে করেছেন, তাই ওঁর মা ওঁকে নিয়ে ভাই-এর বাড়ি থাকেন। ভাই-এরা বেশ বড়লোক, কিন্তু গলগ্রহ তো? জয়ন্ত আবার গতবছর ফেল করে মাটি করে বসেছেন। আর এক বছর মামাদের খরচ চালাতে হবে তো। বাবা তো ওঁদের কোন খবরই রাখেন না।" সাবধানে গরম জলের পাত্রটি ধরিয়া বাথরুমে চলিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি কঙ্কা সেইভাবেই বসিয়া আছে। আমি ঘরে ঢুকিবামাত্র সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তাহলে ভদ্রলোক কি জাত?"

বুঝিলাম এতক্ষণ জয়ন্ত চৌধুরীর সবল দেহ ও সহাস্য মুখচ্ছবি কঙ্কার মনে নানা ক্রিয়াকলাপ করিতেছিল। হাসিয়া বলিলাম, "কেন, ব্রাহ্মণ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বরুণা যে বাগচী।"

কঙ্কার চক্ষে নিবিড় ভীতির ছায়া নামিয়া আসিল। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে সে নিজের মনে উচ্চারণ করিল—"বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।"

বেশিদিন নহে। পরের দিনই সন্ধ্যায় জয়ন্ত কঙ্কার দর্শনপ্রার্থী হইল হস্টেলের ভিজিটর্স রুমে। গোধূলির অন্ধকারে কথাবার্তা শেষ করিয়া কঙ্কা উপরে ফিরিয়া আসিল। মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তখনো আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসি নাই। নিঃশব্দে কঙ্কা তাহার বিছানায় বসিল। ধূসর চীনাংশুক

তাহার পরিধানে, পুরা-আস্তিন কালো ক্রেপ-ডি-শীন্‌-এর জামা। হঠাৎ আবছা আলোতে তাহাকে কেন জানি না বড় অসহায় মনে হইতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার চক্রান্ত করিয়াছে যেন তাহার ধূসর মূর্তিকে গাঢ় কালিমায় অবলুপ্ত করিয়া দিবে। কিন্তু হাল্কা অন্ধকারে পরাজিত করিয়া জ্বলিতেছে তাহার চক্ষু দুইটি। তাহারা যে আরো কালো, আরো গভীর। কোথা হইতে কি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, কিসের সহিত যেন অবিরাম তাহার যুদ্ধ চলিয়াছে। সেইসব শক্তির বিরুদ্ধে সে একা। সে অসহায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, "জয়ন্ত চৌধুরী এসেছিলেন দেখা করতে?" কঙ্কা উত্তর দিল, "ওঁরা টেনিস্‌ গ্রাউণ্ডে মেয়েদের খেলবার ব্যবস্থা করতে চান। আমি আগে টেনিস্‌ খেলতাম। বরুণার কাছে শুনে তাই আমার কাছে এসে ভার নেবার জন্য বললেন। কাল সেক্রেটারির কাছে মিস্টার চৌধুরী এ বিষয়ে প্রস্তাব করবেন। তিনি যা বলেন কাল আমাকে জানিয়ে দেবেন।" কঙ্কা কথা শেষ করিয়া টেবিলের কাছে উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া লঘুস্বরে গান ধরিল, "I ain't nobody's darling." পরিহাস করিলাম—"এখন কে কার 'ডার্লিং' হয় বলা শক্ত।"

সাধারণ পরিহাস! কিন্তু ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে আমার দিকে চাহিয়া কঙ্কা অগ্নিবর্ষণ করিল—"তুমি বড় বাজে বকো, শান্তি।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের ধাক্কায় তাহারই আনীত রক্তগোলাপগুচ্ছ ফুলদানী হতে মেঝেতে পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হইল।

সঙ্কুচিত হইয়া রহিলাম।

ছাত্রীদের পরিচালিত ছাত্রী-আবাস। নিজেরাই ব্যবস্থা করে, নিজেরাই কর্ত্রী; চারুশীলা হাজরা মেট্রন, কিন্তু তিনিও মাত্র বছর দুই পূর্বে পাশ করিয়া শিক্ষাদান করিতেছেন। সুতরাং, শাসনের অবসর নাই, কড়াকড়ি নিয়মেরও একান্ত অভাব। কঙ্কা ও জয়ন্তের ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি করিবার কেহই নাই। তাই, জয়ন্তের সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ প্রাত্যহিক হইবার নির্বিবাদ অবকাশ পাইল।

একদিন দেখিলাম কঙ্কা জয়ন্তের সহিত 'মুভিতে' যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিরুনি ও সুগন্ধি লোশানের সাহায্যে সে বিদ্রোহী অলকগুচ্ছকে বশে আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। বলিলাম,

"দেখো কঙ্কা, সাবধান। এটা মার্চ মাস, জুলাইতে জয়ন্তের পরীক্ষা। শেষে আবার না এবারেও ফেল করেন।"

কঙ্কা নিশ্চিন্তভাবে হাসিল—"আরে না, না। সেইজন্যই তো আমি নিজে জয়ন্তকে পড়াশোনায় সাহায্য করছি। ওর বইগুলো সব পড়ে নিচ্ছি, তারপর সেইগুলো ওর সঙ্গে আলোচনা করে করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" আশ্চর্যে বলিয়া উঠিলাম, "ও হরি! তাই আজকাল ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে অত তোমার বই পড়ার ঘটা দেখি? আমি ভাবি তোমার বোধহয় সুমতি হয়েছে, নিজের কাজই করছো। তা না, এই সব ব্যাগার ঠেলা! অনর্থক ইংরেজি বইগুলো পড়ে সময় নষ্ট করছো। নিজের ভবিষ্যৎটা ভাবো এখন।"

কঙ্কা অবহেলার সহিত উত্তর দিল, "আমার তো এখনো এক বছর দেরি আছে। জয়ন্তের তো এসে গেল। ওর আবার কেউ আলোচনা ক'রে না বোঝালে মনে থাকে না। একা একা পড়তে ওর মনে লাগে না। আর, খেলাতেই ওর মাথাটা খোলে বেশি।"

সহাস্যে বলিলাম "সেজন্যে কোনো পক্ষেই তো কোনও ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে না।"

কঙ্কা একবার আমার দিকে চাহিয়া হাসিল, সুখের হাসি। বুঝিলাম চিরদিন নারী পুরুষের মধ্যে যে রূপ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, সে আদিম কাল হইতে ভালবাসিয়াছে, কঙ্কা জয়ন্তের মধ্যে সেই রূপই দেখিয়াছে। সে রূপ—বীরের।

গাঢ় সবুজ পোষাকের এখানে সেখানে, চুলে, কানের পিঠে, সর্বত্র কঙ্কা পরম তাচ্ছিল্যের সহিত 'স্প্রে' দ্বারা ফরাসী পুষ্পসার বিতরণ করিল। রক্তিম রঞ্জনী ওষ্ঠাধরে বুলাইয়া ভ্রূ-তুলিকার সাহায্যে চক্ষু দুইটি আরো ভয়াবহ করিয়া তুলিল। হাতে রূপার-তারে গাঁথা হাতব্যাগ লইয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাত তুলিয়া বিদায় জ্ঞাপন করিল, "আচ্ছা, Cheorio"। কঙ্কার অপস্রিয়মাণ মূর্তির প্রতি চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম। প্রথম দিনের বিরক্তি ক্রোধ আজ আর তাহার কিছুই নাই। বিষণ্ণ অন্যমনস্কতাও অন্তর্হিত। পুলক-সৌন্দর্যে আজ সে উদ্বেলিত তটিনীর মত যৌবন বন্যায় কুল-প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কোনো দ্বিধা সংশয়ের চিহ্নমাত্রও নাই। নিয়তিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন উপায় কোথায়? কিন্তু মণ্ডল ও চৌধুরী! জানিনা এ প্রেমের পরিণতি সুখাবহ হইবে কি না।

দিন চলিয়া যায়। কঙ্কা-জয়ন্তের অনুরাগ-কাহিনী শাখা-পল্লবে রূপান্বিত হইয়া ছাত্রছাত্রী মহলে গল্পের বস্তু হইয়া উঠিল। একাগ্রতায় কঙ্কার নবরূপ দেখিলাম। অদম্য উৎসাহে জয়ন্তকে পরীক্ষা-বৈতরণী পার করিতে সে ব্যস্ত। এম্-এ পাস করিয়া জয়ন্ত মাতুলাশ্রম ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জনে মন দিবে। গৃহহারা সে গৃহ বাঁধিবে, আর বোধহয় গৃহলক্ষ্মী হইবে কঙ্কা। উদ্দীপ্ত বহ্নিশিখা গৃহ-দেউলে জ্বলিবে প্রদীপের স্নিগ্ধতায়। যে অজানা জ্বালা তাহার নয়নে, যে রহস্যময় দহনে সে সর্বদা অস্থির, তাহার কি নির্বাণ হইবে পুরুষের প্রেমে ?

আমার বাৎসরিক পরীক্ষা আসিয়া গেল। বাধ্য হইয়া চারি বছর পূর্বে পাশ-করা এক বেকার যুবককে শিক্ষক নিযুক্ত করিলাম। সুতরাং জয়ন্ত-কঙ্কার একতলায় ভিজিটর্স্‌ রুমের সম্মুখে আর একটি ভিজিটর্স্‌ রুম বৈকালে আমি দখল করিলাম। ভালোভাবে পাশ আমাকে করিতেই হইবে।

প্রেমালাপের পালাগানের অংশ মাঝে মাঝে কানে ভাসিয়া আসিত পর্দার অন্তরাল হইতে। কখনো সুর নিম্ন, কখনো উচ্চ।

সেদিন দোতালা হইতে বার্কের 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন' বইখানা আনিতে যাইবার পথে কঙ্কাদের ঘরটির সম্মুখে দাঁড়াইলাম অদম্য কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া।

তিরস্কারের বিরক্ত স্বরে জয়ন্ত বলিতেছে শুনিলাম, "দেখতো কি করলে ? জীবজন্তুর মত দাঁত দিয়ে কামড়াও কেন ?"

উত্তেজিত চাপা স্বরে কঙ্কা বলিল, "কেন তুমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার হাত ধরলে ?"

বিদ্রূপের সহিত উত্তর শোনা গেল, "ধরা তুমি যেন দিতেই জানো না ? সেদিন শিবপুর বাগানের কথা মনে আছে ?"

"চুপ করো, সেদিন আমার ইচ্ছা হয়েছিল, আজ ইচ্ছা নেই। You should never force me to anything."

জয়ন্তর উত্তর শোনা গেল না। আর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া উপরে চলিয়া আসিলাম। ঘোলা জলের হ্রদেও আন্দোলন উঠিয়াছিল। আমারই ভীরু দৃষ্টির সামনে মানবমনের এক প্রাগ্-ঐতিহাসিক প্রবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ দেখিলাম। চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করিয়া ডেস্ক্‌ খুলিয়া বই বাহির

করিতেছি, সে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"শান্তি, তোর আইওডিনের শিশিটা দেতো দেখি তাড়াতাড়ি, আর একটু তুলো।" নিরুত্তরে শিশি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে হঠাৎ তাহার কাশ-শুভ্র বস্ত্রাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। সামান্য খানিকটা স্থান রক্তরঞ্জিত। কঙ্কা তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, অজ্ঞাতে মৃদুস্বরে খেদোক্তি করিয়াছিলাম।

সহজ কণ্ঠে কঙ্কা বলিল, "পেন্সিল কাট্‌তে গিয়ে ছুরি লেগে জয়ন্তর হাতের কব্জী কেটে গেছে। প্রথমে কাপড় দিয়ে ধরেছিলাম। এখন দেখছি একটু বেশি কেটে গেছে।" দ্বারপথে কঙ্কা আমার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। ইস্পাতের মত প্রখর, উজ্জ্বল হাস্য। আবার মনে হইল তাহার চক্ষু দুইটি বড় অস্বাভাবিক।

আমার পরীক্ষা হইয়া গেল। জয়ন্তর পরীক্ষাও শেষ হইল। সে মাতুলদের সহিত তাহাদের দেশের বাটির পূজা উপলক্ষে চলিয়া গেল। পরীক্ষার বৎসর বলিয়া আমি রহিলাম। কঙ্কা গেল না, কোথাও নাকি তাহার যাইবার স্থান নাই। কঙ্কাকে বলিলাম, "জয়ন্ত তো 'সেকেণ্ড্ ক্লাস্' পেলেন। গুরু দক্ষিণাটা কি দেবেন?"

বিছানায় শায়িত অবস্থায় কঙ্কা 'Gone with the Wind' পাঠ করিতেছিল। আলস্য-জড়িত স্বরে বলিল, "নিজেকে দিয়েই রেখেছে। I am sick and sullen. My Antony is away."

বলিলাম, "ধন্য আধুনিকা ক্লিওপ্যাট্রা। কিন্তু অ্যাণ্টনি ঠিক থাক্‌বে তো—"

"না থাকবার কারণ কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

তাহার স্মৃতিমগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া এতদিন মনের মধ্যে যে কথা তোলপাড় করিতেছিল দ্বিধার সহিত তাহাই প্রকাশ করিলাম—"কিন্তু মণ্ডল চৌধুরী! বিয়ে আট্‌কাবে না তো?"

"কেন আট্‌কাবে?" কঙ্কা বই ফেলিয়া উঠিয়া বসিল—"আমি জাত মানি না। ও সব আজকাল কেউ মানে না।"

"কিন্তু, যদি এ বিয়ে সুখের না হয়?"

"কি বলছো, শান্তি। একবার ট্রাজেডি হয়েছে বলে কি প্রত্যেক বারই তা-ই হবে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুই সম্ভব হয়, কোনো কিছুরই শক্তি থাকে না মানুষের জীবনে ছায়া ফেলবার।"

কোনো অজানা রহস্যের আভাস পাইয়া প্রশ্ন করিলাম—"একবার কি ট্রাজেডি হয়েছে?" উত্তেজিত, উগ্রস্বরে কঙ্কা বলিল, "কিছু না। শোনো শান্তি, জয়ন্ত ব্রাহ্মণ বলেই জয়ন্ত যেন আমাকে আরো বেশি আকর্ষণ করেছে। দেশে আমাদের ঘরে ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে পূজা করে। সেই ব্রাহ্মণের ভালবাসা! আমি তার সঙ্গে সমান হবো! চিরদিন ছোট জাত বলে অবজ্ঞা পেয়ে এসেছি। এবারে তার শেষ হবে।"

হাসিয়া বলিলাম, "The fruit of that forbidden tree, নয় কি? তাই তোমার মোহ আরো প্রবল হয়েছে। কিন্তু, তুমি বড় বেশি বল্‌ছো কঙ্কা। ব্রাহ্মণ কায়স্থে পার্থক্য তেমন বেশি নয়। কায়স্থকে পাড়াগাঁতেও ছোট-জাত বলে না কেউ। তুমি তো কায়স্থ।"

সতর্ক সর্পের দৃষ্টিতে চাহিয়া কঙ্কা বলিল, "না, ব্রাহ্মণ কায়স্থে অত পার্থক্য সত্যি নেই।"

বলিলাম, "সুতরাং সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু জয়ন্ত আস্‌ছেন কবে ফিরে? আমাদের কলেজ খুল্‌বে তো দু' একদিনের মধ্যে।"

কঙ্কা উদাস ভাবে উত্তর দিল, "জয়ন্ত আজ চিঠি লিখেছে দিন দশেকের মধ্যেই ফির্‌ছে।"

কথাটা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই। শুনিলাম বরুণা ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের বলিতেছে। শরীর খারাপ বলিয়া কঙ্কা সেদিন হস্টেলে ছিল, ইউনিভার্সিটিতে আসে নাই।

বিবাহের কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। জয়ন্ত কিছুদিন হইল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এখনো কঙ্কার ভবনে সে নিয়মিত যাত্রী। ভাবিলাম হয়তো কঙ্কার সহিত এ বিষয়ে তাহার কোনও কথা হইয়াছে।

লাইব্রেরি হইতে 'চসারের' উপরে একখানা বই ধার করিয়া হস্টেলে প্রায় চারিটার সময়ে ফিরিলাম।

নীল বিছানার উপরে শুইয়া কঙ্কা, 'Gone with the Wind' বইখানি শেষ করিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাথা ধরাটা ছেড়েছে, কঙ্কা? নিরানব্বুই-এর উপরে জ্বর আর ওঠেনি তো? ওবেলা জেদ করে স্নান করলে এর ওপরে!"

বইখানি মুড়িয়া কঙ্কা আমার দিকে চাহিল—"না, জ্বর আসেনি, কিন্তু মাথার যন্ত্রণা আর শরীরে জ্বালা রয়েছেই। স্নান না করে কি করি? জ্বর

হলেও স্নান আমায় করতে হয়, নইলে শরীর ভয়ানক গরম হয়ে যায়। ওবেলা ভয়ে ভয়ে সামান্য একটু জল খরচ করেছি, এখন গা মাথা দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে।”

ঝি ট্রেতে করিয়া লুচি-তরকারী এবং চা আনিয়া দিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়া বলিলাম, “তুমি চা খাবে না ?” কঙ্কা হাসিল—“আমার আর আজ চা খেয়ে কাজ নেই। একেতেই গরমে অস্থির লাগছে।”

আহার্যে মন দিয়া বলিলাম, “আজ একটা কথা শুনলাম ইউনিভার্সিটিতে।”

“কি কথা ?” ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, “জয়ন্তের বিষয়ে।”

ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে কঙ্কা চাহিল—“জয়ন্তের বিষয়ে, কি ?”

“বরুণা বলছিল জয়ন্তের নাকি বিয়ে ঠিক হচ্ছে। ওঁর মামার বাড়ির দেশের জমিদারের মেয়ে। বিয়ের পর তাঁরা জয়ন্তকে ইংলণ্ড পাঠিয়ে কাজকর্ম করে দেবেন।”

কঙ্কা তীরবেগে উঠিয়া বলিল—“কি ? জয়ন্তের বিয়ে !”

তাহার দিকে চাহিয়া ভয় পাইলাম। মুখ আরক্ত, রুক্ষ-বিক্ষিপ্ত কেশগুচ্ছ—আর দুইটি চক্ষু ? যেন কুণ্ডলীকৃত কেউটিয়া তীব্র আক্রোশে ফণা ধরিয়া উত্থিত হইয়া দংশন করিবার জন্য দুলিতেছে। মানবীর চক্ষে এমন অদ্ভুত সর্পীর দৃষ্টি ! মনে হইল এই কঙ্কাকে আমি চিনি না—হাস্যমুখরা লাবণ্যময়ী লীলাসঙ্গিনী আমার কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এই অর্দ্ধ-উন্মাদ নারী যে-কোনও কাজই করিতে পারে।

সভয়ে বলিলাম, “বরুণা এমনি হয়তো বলছিল। আমার মনে হয় বাজে কথা। আজ তো জয়ন্ত সন্ধ্যায় আসবেন। তুমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো।”

সন্ধ্যায় জয়ন্ত আসিল। কঙ্কা আজ বেশভূষার কিছুমাত্র পারিপাট্যসাধন করিল না। তাহার পশ্চাতে আমিও কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সামনের ঘরটিতে একখানি বই হাতে করিয়া বসিলাম। কেন জানি না আজ আমার বড় ভয় করিতেছে, মনে হইতেছে একটা কিছু ঘটিতে পারে। কঙ্কা সারা বিকাল নীরব হইয়া ছিল, কিন্তু কেন জানি না সেই নীরবতা আমাকে অত্যন্ত অস্বস্তি দিয়াছে।

মৃদুকণ্ঠের কথাবার্তা শোনা যায় না, তবু কান পাতিয়া রহিলাম। জানি আমার এ আচরণ অসঙ্গত, অভদ্র। কিন্তু, আমি যে কঙ্কাকে বড় বেশি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

কঙ্কার উগ্র স্বরের বিক্ষোভ শোনা গেল, কিন্তু কথা বোঝা যায় না। বই রাখিয়া তাহাদের ঘরের পরদার সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইলাম।

সবেগে যবনিকা আন্দোলিত করিয়া কঙ্কা বাহির হইয়া আসিল। উন্মত্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ঘৃণার স্বরে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে শুনছিলে সব? কৌতূহলের নিবৃত্তি নেই তোমাদের? আচ্ছা, শোনো, ভালো করেই শোনো। আমি কঙ্কা নই, আমার নাম মঙ্গলা। নাম বদলে পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু কপাল বদলাতে পারলাম না। আমি জাতে কায়স্থ নই। আগাগোড়া মিথ্যা বলেছি। আমি নমঃশূদ্র—অর্থাৎ চণ্ডাল। আমার বাবা খুনী, এখনো আন্দামানে। যাও, যাও সকলকে বলে বেড়াওগে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? স্পাই!"

সে আমাকে স্পাই বলিয়াছে, তাহার বেদনা ছাপাইয়া কানে বাজিতে লাগিল "আমি চণ্ডাল, আমার বাবা খুনী।"

হতবুদ্ধির মত পরদা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া একাকী সমাসীন জয়ন্তকে ব্যাকুল প্রশ্ন করিয়া কঙ্কার কথার অর্থ বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

কঙ্কা মণ্ডল, অর্থাৎ মঙ্গলার বাবা ধনী। জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামটিতে অর্থের জন্য তাহার প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামে 'মিশনারী' ইংরেজ মহিলারা শিক্ষালয় স্থাপন করায় মঙ্গলার বাবা তাহাকে ভর্তি করিয়া দিল। নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার জোরে মঙ্গলা শীঘ্রই সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়। সে মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। মিশনারীরা আগ্রহে তাহাকে গড়িয়া তুলিবার কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু, বাড়িতে নানা কারণে অশান্তি বাধিয়া মঙ্গলার শিশু-জীবনে ছায়াপাত করিল।

ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কুমারী কন্যা তারার প্ররোচনায় মঙ্গলার বাবা কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সুগঠিত দেহ, বলিষ্ঠ যুবক, চণ্ডাল হইলেও অর্থপ্রাচুর্যে রুচি ও কিঞ্চিৎ শিক্ষার সমন্বয় তাহার ঘটিয়াছিল। প্রবল যৌবন ও চণ্ডালসুলভ তপ্ত রক্তস্রোত তাহার শিরায় প্রবাহিত। অশিক্ষিতা,

নির্জীব পত্নী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা তারার চণ্ডাল-প্রণয়ী জুটিল।

পত্নীর সহিত কলহ-বিবাদ বাধিল তাহাকে লইয়া। সে কালরাত্রি কঙ্কার এখনো মনে আছে। শয়ন কক্ষে মাতা তাহার পিতাকে ভর্ৎসনা করিতেছে—"ও হোলো গিয়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তুমি ওর গায়ে হাত দাও!"

সেই রজনীর ভয়াবহ দৃশ্য আজিও উন্মনা করিয়া রাখে। কলহ অবশেষে প্রহারে পরিণত হয়। ক্ষণিকের ক্রোধে আত্মবিস্মৃত মঙ্গলার পিতা পত্নীকে কন্যার আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে হত্যা করিয়া ফেলিল।

পিসীমা ও পিসেমহাশয়ের হাতে মঙ্গলার নামে সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়া পত্নীহন্তা আজিও আন্দামানে! মিশনারী মহিলারা মঙ্গলার সমস্ত ভার নিলেন। মঙ্গলা আজ তাই কঙ্কা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

বুঝিলাম তাই কঙ্কার সমগ্র প্রকৃতিতে উগ্র স্বাতন্ত্র্য, বিষধর চক্ষু দুইটিতে তাহার পিতার উন্মত্ত যৌবন প্রতীক লাভ করিয়াছে।

জয়ন্ত বিপদে পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। সুকুমারী তরুণীর সহিত সে নির্বিবাদে প্রেম করিয়াছিল। সভ্যতার দীপ্ত আলোকের মধ্যেও যে কাহারো এমন রক্ত-কলুষিত অন্ধকার অতীত লুকাইয়া থাকিতে পারে তাহা সে ভাবিয়াও দেখে নাই।

বিষণ্ণ স্বরে জয়ন্ত আমাকে বলিল, "মিস্ মিত্র, দেখুন কি ব্যাপার। মায়ের কাছে ওর বিষয়ে সব বলেছিলাম। কায়স্থ শুনেই তিনি কেঁদেকেটে মাথার দিব্যি দিয়ে মানা করেছেন। এসব শুনলে তো আমাকে ওর সঙ্গে কথাই বলতে দেবেন না। বাবা মায়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি, ওঁর একমাত্র ভরসা আমি। আমিই বা কি করে মাকে এতবড় আঘাত দেব? আজ রাগের মাথায় কঙ্কা নিজের বিষয়ে সমস্ত বললো আমি ওর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করতেই। কি ভয়ানক সব কথা!"

আমি আর কি বলিব? নিজের মন লইয়া আমি ব্যস্ত। ঘোলা জলে যে আবার তরঙ্গ লাগিয়াছে।

চেয়ার হইতে উঠিয়া জয়ন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল—

"বিয়ের কথা আমার এখনো ঠিক হয়নি। ভেবে চিন্তে মত দেব বলেছি কয়েক দিনের মধ্যে। ওখানে বিয়ে করা ভিন্ন কোনো উপায় নেই। কঙ্কাকে

বিয়ে করলে আত্মীয় স্বজন কেউ আমার মুখ দেখবে না। নিজের নেই চালচুলো, ওকে নিয়ে কোথায় ভাসবো? আর মিস্ মিত্র, আপনি তো সমস্ত জানেন। আমার পক্ষে কঙ্কা একটু বেশি উগ্র। সে আমাকে ভালবাসে সন্দেহ নেই, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ওকে কেমন ভয় হয়। দেখি একটু বুঝিয়ে।" জয়ন্ত চিন্তিতভাবে বাহির হইয়া গেল।

এ কয়েকদিন কঙ্কার মুখের দিকে চাহিতে সাহস পাই নাই। সামান্য যে-দুই-একটি কথা বলিতাম তাহাও চোখ নামাইয়া। আজ প্রায় কুড়ি দিন পরে জয়ন্ত আসিলে কঙ্কা আমাকে ডাকিয়া লইল। "শান্তি, একটু আমার সঙ্গে নীচে এসো। ওর সঙ্গে একা থাকতে চাই না।"

অপ্রতিভভাবে বলিলাম, "আমি আর থেকে কি করবো? জয়ন্ত হয়তো তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চান।"

কঙ্কা উন্মাদের হাসি হাসিল—"পরামর্শ সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। বিয়ে স্থির করে বিদায় নিতে এসেছে।"

উকীলের ভঙ্গীতে বলিলাম, "ওই তোমার অন্যায় কঙ্কা। শোনো না কি বলেন।"

"কি বলবে?. চিঠি লিখেই-তো কয়েক দিন আগে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে। এসো শান্তি। আমি ওর সঙ্গে একা থাকতে চাই না।" নির্মম ইস্পাতের ন্যায় কঙ্কার চক্ষু ঝলকিত হইল।

আমাকে কঙ্কার সহিত দেখিয়া জয়ন্ত একটু অস্বস্তি বোধ করিল। কিন্তু, তাহার পরেই সে যেন নিষ্কৃতি পাইল। একটু ইতস্ততের ভাব দেখাইয়া বলিল, "মিস্ মিত্র তো সব জানেন, উনি কি এখানে—"

কঙ্কা উত্তর দিল—"শান্তি এখানে থাক্।"

জয়ন্ত মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "চিঠিতে তো সব জেনেছ কঙ্কা। বিয়ে করা ভিন্ন আমার উপায় নেই। মামারা সকলে জোর করছেন, মা তো কথাই দিয়ে রেখেছেন। মামাদের অন্ন ধ্বংস করেছি সারাজীবন, তাঁদের কথার বিপক্ষে যাওয়া আমার অসম্ভব। মা সারাজীবন অসুখী, এখন তাঁর মনে এতবড় আঘাত দিতে পারব না আমি।"

কঙ্কা সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বিয়ের দিন হোলো কবে?"

জয়ন্ত অপ্রতিভ স্বরে বলিল, "পরশুদিন দেখো কঙ্কা, জন্ম থেকে পরের দ্বারে মানুষ। এ বিয়ে করলে আমার একটা স্থিতি হবে। নইলে তোমার জীবনটাও নষ্ট করে ফেলবো। তোমার ভবিষ্যৎটাও তো দেখতে হবে।"

কঙ্কার নিরুত্তর মুখের প্রতি চাহিয়া কথা উল্টাইবার জন্য বেতালা প্রশ্নটাই করিয়া ফেলিলাম, "বউ কেমন হচ্ছে?"

জয়ন্ত কঙ্কার মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "মন্দ নয়। মুখখানা খুব সুন্দর।"

দেখিলাম, কঙ্কা পলকবিহীন নেত্রে জয়ন্তের মুখের দিকে চাহিয়া আছে—ঈর্ষাবিদ্ধ দুইটি কেউটিয়া তাহার দুই চক্ষে।

সে দৃষ্টিকে চাপা দিয়া সাধারণ স্বরে কঙ্কা বলিল—"একবার কিন্তু বৌ-ভাতের দিন গিয়ে তোমার বউকে দেখে আসবো জয়ন্ত।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। জয়ন্ত দ্বিধা ও সংশয়ে ইতস্তত করিতে লাগিল।

কোমল, করুণ কণ্ঠে কঙ্কা আবার বলিল, "তুমি এতে না কোরো না, জয়ন্ত। কিছু করব না, শুধু দূর থেকে একবার তাকে দেখে আসব।"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুর নির্মম নিষ্ঠুরতাকে আবৃত করিতে অশ্রুধারা নামিল। আশ্চর্য!

জয়ন্ত বিগলিত, বিব্রতভাবে বলিল, "আহা, তুমি যেও, তাতে কি? তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা তো চিরদিন থাকবে। তোমার কষ্ট হবে ভেবে যেতে বলিনি। আমারও তো কষ্ট! আর একটা কথা, কঙ্কা, তোমাকে যে চিঠিগুলো লিখেছিলাম, সেগুলো আর রেখে লাভ কি? আমাকে সেগুলো দিয়ে দাও।"

অশ্রুকলঙ্কিত মুখ তুলিয়া মর্মস্পর্শী স্বরে কঙ্কা বলিল, "হস্টেলের মেয়েরা দেখবে বলে সেগুলো আমি সব নষ্ট করে ফেলেছি, একটাও রাখিনি। তখন কি জানতাম ওইগুলোই আমার শেষ পর্যন্ত থাকবে?"

এখনো কঙ্কার নিমন্ত্রণ-বাটিতে যাইবার কথা মনে পড়ে। সারাদিন সে বাহিরে ছিল, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া বড় কালো চামড়ার হাতব্যাগে কি সব রাখিয়া বেশভূষায় মন দিল। বুঝিলাম জয়ন্তের স্ত্রীকে দিবার জন্য

উপহার। কঙ্কা সামলাইয়া লইয়াছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপার আত্ম-মর্যাদা তাহার। যেখানে কোনো প্রতিকার নাই সেখানে অহেতুক উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার বোকামী তাহার নাই।

সেদিনের কালো পোষাক কঙ্কা পরিধান করিল। সেই কাকপক্ষ-কৃষ্ণ রেশমের শাড়ী ও কালো কাচের গহনা। আর সমস্ত কৃষ্ণতাকে পরাজিত করিয়া জলিতেছে; তাহার কৃষ্ণ সর্পবৎ চক্ষু দুইটি সাপের মাথার মণির উজ্জলতায়।

আমার দিকে ফিরিয়া শাণিত হাস্যে কঙ্কা প্রশ্ন করিল, "কেমন দেখাচ্ছে?"

বলিলাম, "নাগিনীর মত।"

নাগিনীর মতই সহসা কঙ্কা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল—"তাহ'লে চললাম, শান্তি।"

জীবনে আর তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই।

বিবাহ-আসরে জয়ন্তের নব-পরিণীতার সুন্দর মুখমণ্ডলে নাইট্রিক অ্যাসিড্ নিক্ষেপ করিয়াই কঙ্কা ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার হস্তে জয়ন্তর লিখিত কঙ্কার নামের সমগ্র পত্রাবলী সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। সে পত্র সে নষ্ট করে নাই। লাল ফিতায় বাঁধা প্রেমপত্র। সপত্নীকে মীডিয়ার উপহার!

সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ জানে না। আজও তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

শুধু আমি স্বপ্ন দেখি ড্রাগন-বাহিত রথে মীডিয়াকে, শুভ্র হস্ত তাহার নিজ সন্তানের শোণিতে রঞ্জিত।

নারী আজও প্রেমে প্রতিশোধ লইতে জানে: মীডিয়া আজও বাঁচিয়া আছে।

———

সেমেলি

আচ্ছা, আমি এখানে কেন? প্রসাধন-টেবিলের সম্মুখে আবক্ষ অনাবৃত নিজের মূর্তির দিকে চেয়ে মেয়েটি আপন মনে বলছে, শ্রোতা তার স্বচ্ছ মুকুরে স্বীয় প্রতিবিম্ব।

মর্মরশুভ্র কোল্ডক্রীম তর্জনীতে তুলে গণ্ডে মার্জনা করতে করতে মেয়েটি ব'লে যাচ্ছে, আচ্ছা, আমি এখানে কেন? কেন আমি এই সাঁওতাল পরগণার অখ্যাত ছোট শহরে? আমার স্কুল প'ড়ে রয়েছে সুদূর কলকাতায়। আমি কেন এই পাড়াগাঁয়ে গভীর রাত্রে ব'সে নীলার ড্রেসিং-টেবিল ব্যবহার করছি?

বাহিরে অন্ধকার সমুদ্রের মত সীমাহীন। ঝড়ের বেগে হাওয়া ঝাউগাছকে আঘাত ক'রে যাচ্ছে।

জানি, তুমি পালিয়ে এসেছ। তুমি ব'লে আসনি, তুমি ঠিকানা দিয়ে আসনি।—আয়নায় প্রতিফলিত মূর্তি কম্পিত অধরে বলল।

না, আমি এসেছি স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য। আমার অসুখ করেছে, আমি অসুস্থ। দিনের আলোতে চেয়ে চেয়ে দেখো আমার দিকে। চোখের দৃষ্টি আমার নিষ্প্রভ, মালিন্য আমার ত্বকে। যৌবন-লালিত্য আমার বাইশ বৎসরের দেহে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখছ না বিশীর্ণ করাঙ্গুলি? আমি অসুস্থ।—শিথিল অঞ্চল তুলে মেয়েটি সতেজে প্রতিবাদ করলে।

কিন্তু অসুখটা করেছে কেন? পালিয়ে থাকবার জন্য নয়? ডাক্তারের শিশি শিশি ওষুধ গলাধঃকরণ করলে রোগ সারে না।—ছায়া অর্থপূর্ণভাবে হাসল।

অসুখ তো কলকাতা থেকেই, পালানো কথাটার মানে কি?

আয়নার মেয়েটি আবার হাসল, পালানো তো সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

আমার অসুখ ভাল হচ্ছে না কেন? সত্যিই আমি বড় অসুস্থ। এ

হৃদয়ঘটিত দুর্বলতার জন্য প্রবাস নয়, বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে। তাই তো অসময়ে স্কুল থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি পেলাম। পড়াতে আর পারতাম না, কবে পারব জানি না।

বয়স্কা কুমারীদের এ রকম অসুখ হয়, না?

শখের অসুখ? আচ্ছা দেখ।—মেয়েটি দেহ হ'তে অঞ্চল নামিয়ে দিল। সম্মুখের প্রতিচ্ছবির শুভ্র গাত্রে দেখা গেল অসংখ্য চক্রাকার স্ফীতি, সারা দেহে যেখানে সেখানে। সমস্ত চর্মের উপর রক্তিম আভায় সেগুলি বিষদহনের পীড়া দিচ্ছে।

দেখ, আমার শখের অসুখ! জান না এর যন্ত্রণা? একে বলে 'আর্টিকেরিয়া'। পিত্তচাকার অস্বস্তি জান? সারা দেহে মনে হয় আগুন জ্ব'লে উঠেছে। সতীরা কি সহমরণের অগ্নিদাহ এর চেয়ে বেশি অনুভব করেছে? ওঃ, কি নিদারুণ যন্ত্রণা! সমস্ত শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়! অসংলগ্ন, ব্যগ্র করাঙ্গুলিতে মেয়েটি স্ফীতিগুলিকে সবেগে পীড়ন করতে লাগল পাগলের মত। নখর-লাঞ্ছিত স্থানে ফুটে উঠল রক্তচিহ্ন।

ডাক্তার বলেছে, 'ইন্‌টেস্টাইনা অ্যালার্জি,' তাই এইসব। তাই তো আহারাদির পর অসহ্য ব্যথা ওঠে হৃৎপিণ্ডের নীচে থেকে। সে ব্যথা অবশ ক'রে দেয়। আর সহ্য করতে পারি না, আর সহ্য করতে পারি না।

নীলা কবি, আমি কবি নয়। নিজের অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করবার পৈশাচিক বিলাস আমার হ'ত না কবি হলেও। স্বামীর চাকুরি-স্থল এই জঙ্গলে প'ড়ে থাকলেও নীলার কবিতার হাত নষ্ট হয়ে যায় নি! তার প্রমাণ শোন—

> বেদনার সিন্ধুতলে ডুবে যাই আমি,
> প্রতি অঙ্গে জড়িমার মন্দ আন্দোলন,
> পদতল আকুঞ্চিত হয় ক্ষণে ক্ষণে,
> বেদনায় কেশমূলে বাজে শিহরণ।
> অঙ্গুলির বৃন্ত যেন নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়—
> অর্ধচন্দ্র নখরেতে অগ্নির প্রদাহ,
> অধর বিশুষ্ক আর কম্পিত ব্যথায়,
> দূরে গেছে দৈনন্দিন জীবন-উৎসাহ।

বক্ষ জ্বলে অনির্বাণ খাণ্ডব-দাহনে,
অঙ্গ যেন বর্শাবিদ্ধ বেদনার রণে,
কণ্ঠ হয় শ্বাসহীন ; বৃশ্চিকের জ্বালা
শত শত অনুভূত দেহ-কণ্ডুয়নে।
বেদনার সিন্ধুতলে অচেতন আমি—
ভাল কেহ বাস যদি দেখ সিন্ধুজলে,
যে তনুতে অমৃতের পরম প্রকাশ,
বিষের সাগর আজ ওঠে পলে পলে।

আমারই শারীরিক যন্ত্রণার বর্ণনা। আমাকে লক্ষ্য ক'রে দেখে আমার কাছে শুনে নীলা লিখেছে। কেমন, এখন বিশ্বাস হ'ল আমার রোগের কাহিনী ? জানি, কাব্য ক'রে বললে বলবার কথার মূল্য অনেক বেড়ে যায়।

হয়তো ভাল হব না, এই রোগজীর্ণ দেহ টেনে টেনে ক্লান্তির চরম সীমায় অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর জন্যে। ভাল হব না, সুস্থ শরীর কাকে বলে জানব না। ধ্বংস আমার সমাগত।

না না, ভাল আমি হবই। আমার কিছু হয় নি। সামান্য সাময়িক অসুখ মাত্র। ভাল আমাকে হতেই হবে। আবার ফিরে যাব নগরীর উন্মত্ত জীবন-যাত্রায়। প্রমাণ করিয়ে দেব প্রেম আমাকে ধুলাশায়ী করেনি।

প্রেমের সঙ্গে সম্পর্ক কি ? সম্পর্ক নেই। আমি এসেছি আমার মাসতুতো বোনের কাছে শরীর সারাতে। নীলা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করছে, জায়গাটি ভাল। তবু ভাল হচ্ছি না।

প্রেম কর, তাই হচ্ছে তোমার বয়সী কুমারীর লিভারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ টনিক। ভালবাসা পাওনি বুঝি ?

ভালোবাসা পাইনি ? অত ভালবাসা স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করে নি। শিশুকাল থেকে যেসব উপাখ্যান প'ড়ে লুব্ধ হয়েছি, তাদের মলিন ক'রে দিয়ে কি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব হয়েছিল! নিঃসঙ্কচিত্তে দেবরূপ ধারণ ক'রে এসেছিল প্রেম—বাসনাবিহ্বল, কামনাপুলকিত। আজও একাকীশয্যা আমার স্মৃতিমন্দির।

কোথায় ছিলাম আমি ? একটা বাড়ীতে—চার নম্বর কলুটোলা স্ট্রীট আজ কত দূরে ? আমার সেই শোবার সেকেলে প্যাটানের খাট, মাথার

কাছে একটা কাঠের পরী ক্ষোদিত। আমার কালো কাঠের আলমারি, বইগুলি অপেক্ষা ক'রে থাকত কখন আমার অবকাশ হবে। সে সব এক মাসেই স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। আছে সত্য হয়ে এই পাহাড়ী দেশের রক্তধূলি আর নীলার প্রসাধন-টেবিল।

জুপিটার! জুপিটার! কেন আমার জীবনে তুমি অকস্মাৎ এলে? কেন আমি তোমার নিজমূর্তি দেখতে চাইলাম? সেমেলি, তাই আজ ভস্ম তোমার অবশেষ।

তোমাকে সে প্রথম দিন বলেছিল, পড়ানোর লাইনটা আপনার কেমন লাগে?

তুমি উত্তর দিয়েছিলে, ভাল। নইলে নেব কেন?

তরবারি সহসা কোষমুক্ত হতে দেখেছ? শুভ্র দন্ত—যেন দংশন করবার জন্য তাদের সৃষ্টি হয়েছে, পরে বহুদিন দেখেছিলে তাদের সক্রিয়তা খাদ্যগ্রহণের সময়ে। তখনই মনে হ'ত, হয়তো কিছু নিষ্ঠুরতা আছে কোথাও অন্তরালে। হেসে উঠেছিল জুপিটার। তারপরে কলমদানি থেকে লাল-নীল পেন্সিলটি নিয়ে লোফালুফি করেছিল সহাস্যে। কি ছেলেমানুষ! প্রৌঢ় পুরুষের কত ছেলেমানুষি!

তোমার অখ্যাত কর্মস্থল নবীন শিক্ষায়তনটির সে সেক্রেটারি। দেখা করতে গিয়েছিলে তার বাড়িতে মেয়েদের নাটক-অভিনয় সম্পর্কে কথাবার্তার জন্য। নূতন শিক্ষয়িত্রী তুমি, উৎসাহ ছিল প্রবল।

বসবার ঘরে দেখা হ'ল নির্জন বড় বাড়িতে। সারি সারি পরিচারকদের মধ্যে দিয়ে বার হ'লে লাল কাপড়মোড়া চৌকি যেখানে।—বলিদানের রক্তময় বেদী যেন।

সে দেখা দিল বিদেশী পোষাকে। রৌদ্রের আলোতে ললাটের পার্শ্বে দুই-একটি রূপার চুল। ওষ্ঠাধর পুরুষের পক্ষে বেশি আরক্ত, নয়নে রাত্রির গভীর তমিস্রা। দীর্ঘ গৌর দেহ, প্রশস্ত স্কন্ধের ওপরে প্রকাণ্ড মাথা—রাজকীয় মূর্তি। অধরে তার কতশত প্রেমের নিষ্ঠুর পরিতৃপ্তির ছায়া, নয়নে তার জীবনের বেদনার সুর। চিহ্নিত ললাটে অভিজ্ঞতা আর গাম্ভীর্য, যৌবনের খরদীপ্তি নেই, আছে তবু উত্তাপ। তোমার জুপিটার, সেমেলি।

যে নাটক তোমরা অভিনয় করতে চেয়েছিলে, সে তা আগে পড়েনি।

আপনি সময় ক'রে প'ড়ে শোনাবেন? নইলে মতামত দেব কেমন ক'রে, করা উচিত কি না? আপনি যখন অভিনয়ের ভার নিয়েছেন, এটা আপনার কর্তব্য। নিজে আমি কখনই প'ড়ে উঠতে পারব না। আসবেন?

সদ্য কলেজ-ফেরত তুমি। বাইশ তোমার বয়স। কোন কিছুই অসঙ্গত লাগে না তোমার, বিপত্নীক পিতা অর্থ পাঠান। কাকার বাড়িতে থেকে চাকরি নিয়েছ সম্প্রতি। সুতরাং তুমি স্বাধীনা।

পরের দিন সকালে এক ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বের হ'লে। স্কুলে যাবার পথে তার প্রাসাদে গিয়ে উঠলে। মনে ঈষৎ গর্বের ভাব ছিল, সেক্রেটারি নিজে ডেকেছেন।

প'ড়ে গেলে তুমি নীচু চৌকিতে ব'সে। মার্বেলের ত্রিপদীতে হাত রেখে এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল তোমার আন্দোলিত অধরের দিকে। ছোট নাটক, তাও পড়া শেষ হ'ল না। পরের দিন সন্ধ্যাতে সে সময় দিল।

সকালের দিকে আমার ডিরেক্টরদের মিটিং, বুঝেছেন? সন্ধ্যায় ফ্রী হব। আবার তাড়াতাড়ি না শুনে নিলে ওদিকে প্লে তৈরি করতেও যে আপনার দেরি হয়ে যাবে।

পরের দিন! আধো অন্ধকারে টেবিল-ল্যাম্পের আলো। দীর্ঘ, উজ্জ্বল-গৌর দেহ তার ধুতি-পাঞ্জাবি-মণ্ডিত, অর্ধশয়ান। আলস্যের জড়িমাশিথিল দেহ, যেন কত কষ্টে সংযত হয়ে আছে। প্রদীপ্ত দৃষ্টি তোমার অন্তঃস্থল দেখে যাচ্ছে, তোমার বস্ত্রাবরণ, তোমার রক্তমাংস সব কিছুর পেছনে তার গতি। সহস্র সূর্যের উত্তাপ তার দৃষ্টিতে। দেহ তোমার উষ্ণ হয়ে উঠেছিল সন্ধ্যার আবছা আলোতে। কে যেন তোমাকে আলিঙ্গন করেছে। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এতই সাংঘাতিক।

মনে ঘোর লেগেছিল। অনেকদিন আশ্চর্য লেগেছে তোমার অত তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়ের প্রেমে ব্যাকুল হবার জন্যে। সে প্রেম-নিবেদন করবার পূর্বেই তৃতীয় সাক্ষাতে তুমি তাকে ভালবেসেছিলে কেন সহসা? না আজ তোমার বিস্ময় নেই। কটাক্ষে, ব্যবহারে, সে তোমাকে প্রেম জানিয়েছিল, তোমাকে মোহিত করবার প্রচেষ্টা ক'রে চলেছিল একটি কথাও না ব'লে। তুমি সে প্রেম গ্রহণ করেছিলে মাত্র।

গর্ব হয়েছিল মনে, মোহ তাকে বলা চলে। শোন, আজ সত্য কথা

স্বীকার কর। —আয়নার ছায়া নীরবে তিরস্কার করল। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে অহরহ তুমি চেষ্টা করেছ সারা জীবন ধ'রে। যে চিন্তা মনে অস্বস্তি আনত, সে চিন্তা তুমি একেবারে ত্যাগ করতে, জানি। সত্যের সম্মুখীন হবার সাহস তোমার ছিল না। মুখোমুখি কোন কিছুর প্রকৃত রূপ চোখ মেলে দেখা তোমার প্রকৃতির বিপক্ষে। নানা কথা ব'লে নিজের মনকে শিশুর ঘুমপাড়ানি ছড়ার প্রথায় ভুলিয়ে রাখতে ক্রমাগত। সে সব বিষয়ে পূর্বাহ্নে চিন্তা আবশ্যক, পরে ভেবে দেখবে ব'লে সে সমস্ত ধারণা এক কোণে ঠেলে দিতে। কর্মভীরু কেরানির মত কখনই তোমার হিসাবের খাতা মেলাবার অবকাশ হ'ত না কিন্তু। সেদিন নিজেকে ভুলিয়েছিলে ব'লে আজ তোমার এই পরিণতি। আজও আবার নিজেকে ভোলাচ্ছ তোমার অসুখটা শারীরিক ব'লে।

'টোরেস্টিন' লেখা, চ্যাপ্টা ছোট শিশি থেকে বাসন্তী বর্ণের একটি বড়ি বের ক'রে মেয়েটি জলের সাহায্যে গলাধঃকরণ করল। পাশের টেবিলে ঝি হরলিক্সের পেয়ালা রেখে গেছে।

মুখে পাত্র ধ'রে আয়নার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি আবার বলল, অসুখ নেই আবার? অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে, তা তো মিথ্যা নয়।

যন্ত্রণা কেন জান?—ছায়া উত্তর দিল, অসুখ কেন জান? মন যা চাচ্ছে, জোর ক'রে শরীরকে তার থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য। যাও, ফিরে যাও সেই কামনা-ব্যাকুল বাহুবন্ধনের মধ্যে, লাগুক তোমার অধরে তার শাণিত অধরোষ্ঠ। পালিয়ে এসেছ, আবার ভান করছ অসুখ সারাতে এসেছ ব'লে। পালিয়ে আসবার প্রয়োজন ছিল না, আকর্ষণকে প্রতিহত করার শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তোমার।

·

সেই ম্লান বিজলী-আলোতে প্রেমের জন্ম হ'ল তোমার জীবনে, তোমার হৃদয়ে। সমস্ত কথা তোমার ধীরে ধীরে সে জেনে নিল, তুমি কিছুই জানালে না সেদিন। নির্জন বাড়ি, বয়স্ক পুরুষ—বিবাহিত কিনা বারে বারে প্রশ্ন উঠল চিত্তে। বারে বারে সে প্রশ্ন চাপা দিলে অনিশ্চিততার ভীতিতে। থাক আমার সুখস্বর্গ মনে মনে, যতক্ষণ তার পরমায়ু। নির্মম সত্য শুনতে চাই না।

দরিদ্রকন্যা তুমি। বাড়ি, গাড়ি, আসবাব তোমার চোখ ঝলসে দিল। প্রতাপশালী প্রৌঢ় পুরুষ, তোমার কর্মস্থলের এবং বহুর দণ্ডকর্তা বিধাতা।

সে তোমাকে অকপটে পছন্দ করেছে! সে তোমাকে রবিবারে চায়ের নিমন্ত্রণ করল! তোমাকে—নগণ্য স্কুলশিক্ষয়িত্রীকে, যৌবন ভিন্ন যার কোন সম্পদ নেই।

মোহ হয়েছিল তার অসামান্যতায়, গর্ব হয়েছিল তোমার কাছে সে সহজ-প্রাপ্য ব'লে। ভেবেছিলে, অথবা নিজের মনকে স্তোক দিয়েছিলে এই ভাবনা দিয়ে—স্কুলের সেক্রেটারি উনি। ওঁর সুনজরে থাকলে আমার অনেক লাভ হবে। ওঁকে সন্তুষ্ট রাখা আমার অবশ্য কর্তব্য।

না, আজ স্বীকার কর, প্রৌঢ় পুরুষের আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলে তুমি। এখন সেই আগুনে পুড়ে মর। ওই যে তোমার দেহে অগ্নিদহনের জ্বালাময় অসংখ্য মাংসপিণ্ড, সে জুপিটারের বজ্রাগ্নির চিহ্ন, 'আর্টিকোরিয়া' নয়।

রবিবার সন্ধ্যায় গিয়েছিলে, চায়ের পক্ষে সময়টা বিলম্বিত। সেই রক্তিম সোফা-সেটি, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে মলিন আলোক। হলদে পাত্রে সোনালী চা, চুলের সুরভি, চুরুটের আগুন, আর নির্নিমেষ—দৃষ্টিসমাহিত জুপিটার!

আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ। ছেলেমেয়েকে নিয়ে উনি এখন আছেন কার্সিয়ং।

অবশেষে চরম কথাটা তুমি শুনলে। বিবাহিত। যন্ত্রণায় মনে হ'ল মৃত্যু হয়েছে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে এল সে, তোমার আসনের দুই হাতলে ভার রেখে ঝুঁকে পড়ল তোমার সামনে—তাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে আমার স্ত্রী আছে ব'লে?

লাভক্ষতির প্রশ্ন তখন ওঠে না। সে অন্ধ আকর্ষণে তোমাকে যতদূর সে যেতে চায় টেনে নেবেই—রসাতলে পর্যন্ত।

প্রথম চুম্বন সেই দিনেই।

যার স্ত্রী আছে, তাকে ভালবাসা কি উচিত? কি হবে এই ভালবাসায়, যার কোন পরিণতি নেই? এসব প্রশ্ন মাঝে মাঝে খোঁচা দিত মনে। কিন্তু তখনই তা চাপা দিতে। যা ভাল লাগে না, কেন ভাবব? যা ভাল লাগছে, কেন ক'রে যাব না? ভবিষ্যৎ ভাববার নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে না তুমি, বর্তমানকে উন্মাদের ব্যগ্রতায় ব্যবহার ক'রে যেতে ক্রমাগত। যা হয় হোক,

দিন কেটে যাচ্ছে আনন্দে। এ আনন্দ কেন নেব না? যা হয় হবেই। মিথ্যা ভেবে ভেবে আগের থেকে কষ্ট পাই কেন?

তার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে। তাঁর ওপরে কি অবিচার করা হচ্ছে না? ওসব কথা ভাবতে পারতে না, বুকে যেন ব্যথায় মোচড় লাগত। তাই ভাবতে না ইচ্ছে ক'রে। যেন তার স্ত্রী বায়ুর মতন একটা অনুভূতি-গ্রাহ্য পদার্থ মাত্র, কোন বস্তুতান্ত্রিক রূপ তাঁর নেই; এই ভাবে চলতে তুমি। তার ছেলেমেয়ে? ছেলে আছে, আশ্চর্য! এই প্রেমিকের সন্তান আছে, সে পিতা! বেসুরেতে সব কিছু বেজে উঠত তোমার। তাই ভুলে থাকতে তার প্রবাসী সন্তানদের কথা, সেও ভুলেও তার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলত না। শবাধারে নিহিত আবৃত শবের মত তোমাদের মধ্যে সে জীবন প্রোথিত থাকত। প্রেতমূর্তি ধ'রে কখনও তোমাকে পীড়ন করেনি। কি প্রথায় প্রেম করতে হয়, জুপিটারেরা তা জানে।

দীর্ঘ মোটরভ্রমণ, নৈশ-আলাপন, চিত্রগৃহে—চায়ের দোকানে একত্র সমাগম, বসবার ঘরে ক্রমশ-চুম্বন—দিনগুলি নেশায় কেটে যেতে লাগল। অবশেষে একটি বিন্দুতে তোমার সমগ্র জীবন এসে স্পর্শ করল—সে।

মনকে ভোলাতে খেলা করছ তুমি, যখন খুশি তখন খেলা করছ তুমি, যখন খুশি তখন খেলাঘর ভাঙলে চলবে। কিন্তু খেলা শুধু সহস্রবল্লভ জুপিটার জানে; সেমেলি কখনও খেলা শেখে নি, শুধু শিখেছিল প্রণয়ীকে সর্বতোভাবে পাবার চেষ্টা। তাই গ্রীক্ পুরাণে সেমেলি ভস্ম হয়েছিল। সেও তোমারই মত দেবশ্রেষ্ঠ জুপিটারকে ভালবেসেছিল। জুপিটার তাকে নিজমূর্তি গোপন ক'রে কোমল মাধুর্যে ধরা দিয়েছিলেন। জুপিটারপত্নী জুনোর ঈর্ষামন্ত্রণায় সেই সেমেলি প্রণয়ীর নিজমূর্তি দেখতে চাইল। দেবতা এলেন বজ্র-অগ্নি নিয়ে। সেমেলি দগ্ধ হ'ল। এ আখ্যায়িকাতে জুনো অদৃশ্য। কিন্তু সেমেলি, তোমার পরিণতি ওই ভস্ম।

কাকীমা বিরক্ত হতেন, কাকা রাগ করতেন, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্বের ভার তাঁদের হাতে ছিল না। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলেও এসব কথা কিছু কিছু বোঝা যায়। তোমার আরক্ত কপোল, উজ্জ্বল নয়ন, লোলুপ অধর ধরিয়ে দিত তোমার প্রেমের ইতিহাস। সহকর্মিনীরা বক্র পরিহাস করতেন, কোন কোন বর্ষীয়সী কুমারী ঈর্ষাকুল হতেন। তোমার জগতে কিন্তু আর

কিছু ছিল না—ছিল জুপিটারের মানবাতীত প্রেম। দেহ তোমার হয়ে উঠেছিল বিকচকদম্ব, মন অলস। দেহের সামান্যতম অনুভূতি হয়েছিল তীব্র, মানসিক জড়তা কিন্তু চিত্তকে ভাবনার অবকাশ দিত না। চিন্তা না করতে করতে চিন্তার শক্তিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

সে স্বপ্নজগৎ ভেঙে গেল তোমারই নির্বুদ্ধিতায়, তোমারই মূঢ় কৌতুহলে, সেমেলি তুমি। যে জগৎ স্বপ্ন দিয়ে সৃজন করেছিলে, তার সঙ্গে বাস্তবের বিষম পার্থক্য দেখলে। কাচের বাসনের মতো তোমার প্রেম ঝনঝন ক'রে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সহ্য করতে পারলে না, মোহভঙ্গে পলায়ন করলে। আর দেখা করতে না, টেলিফোন ক'রে নানা অজুহাত দেখাতে। নিজের হৃদয় নিয়ে নিঃশব্দে স'রে থাকতে, রোগ হ'লে যা স্বাভাবিক। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে পলায়ন করলে। জুপিটারের মানবাতীত আশ্চর্য প্রেম তোমার সহ্য হ'ল না।

সেই দিনটি! ডায়মণ্ড হারবারের পিকনিক সেরে সন্ধ্যায় তোমরা গিয়েছিলে গৃহে। মদির প্রেমাবেশের মধ্যে কেন জানি না ব'লে উঠলে, তোমার নিজের শোবার ঘরটা আজ দেখব। কোনদিন দেখিনি।

তার জীবনের কোণগুলি পর্যন্ত তোমার আয়ত্তে আনা চাই, না? নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে তাকে তুমি কল্পনা করতে চাও আরও অন্তরঙ্গ পরিবেষ্টনীতে, যেখানে সে রাত্রি যাপন করে, যে শয্যায় জাগ্রত জুপিটারেরও নয়নে নিদ্রাবেশ আসে, কি বল?

সে মুখ তুলে তোমার দিকে চেয়ে হাসল। আবার সেই নিষ্ঠুর দন্তশ্রেণী যেন হিংস্র আনন্দে উন্মোচিত দেখলে—শেষ বার।

দেখাব। তবে আজ থাক।

যতটুকু সে দিয়েছিল, তাতে কেন সন্তুষ্ট রইলে না? কেন তার স্বকীয়তার চরম সীমা দেখতে চাইলে, নির্বোধ?

তুমি জোর করতে লাগলে আবদার ক'রে, না, আজই। আমি বুঝি তোমার শোবার ঘর দেখব না? এতদিন যে কেন মনে হয় নি!

সে লঘু স্বরে উত্তর দিলে, আগে ঘর তোমার দেখার উপযুক্ত করি, তারপর। চাকরদের হাতে রয়েছি, কোন কিছুই ঠিক সাজানো থাকে না।

তুমি অনুযোগ করলে, আমি বুঝি তোমার পর যে, ঘর সাজিয়ে দেখাতে হবে?

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জুপিটার সহাস্যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তোমার আবদার আর ছেলেমানুষি দেখে যেমন সে চেয়ে থাকে। দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টি-সম্মোহনে। আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নিজেই যাচ্ছি। ওপরে যে ঘরটায় লাইব্রেরি, তার পাশেরটা তো? চললাম।

হাত নেড়ে তাকে উত্তেজিত ক'রে দ্রুতচরণে দ্রুতধাবনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলে। তোমার লীলায়িত গতিভঙ্গির দিকে চেয়ে জুপিটার ভুলে গেল তার মনে যা ছিল। তোমাকে ধরবার জন্য ব্যগ্র বাহু প্রসারণ ক'রে তোমার পেছনে সেও প্রধাবিত হল। হাস্যকলরোলে সিঁড়ি মুখরিত হয়ে উঠল।

প্রবেশ করলে জুপিটারের নিভৃত-নিকেতনে। শুভ্র শয্যা আস্তৃত, দুজনের মতো পালঙ্কে। পাশে ছোট রেলিং-দেওয়া খাট, দুইটি প্রবাসী শিশুর শৈশবনিদ্রাস্থল। চকিত চরণ তোমার স্তব্ধ হয়ে গেল। আয়নার পার্শ্বে সুন্দরী তরুণীর আপাদমূর্তি। সযত্নবিন্যস্ত কেশপাশ থেকে পায়ের উচ্চহীলের জুতা পর্যন্ত তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় তাতে লেখা রয়েছে, সেমেলি, তোমার জগতে স্বপ্নেরও অতীত। পরিপূর্ণ নারীমূর্তি, নয়নে সন্ধানী কটাক্ষ, হাসি তার অভিজ্ঞ, বাসনা-জড়িত। এই জুনো, স্বর্গসম্রাজ্ঞী জুনো, জুপিটারের উপযুক্ত সঙ্গিনী। আর তুমি? তার কাছে তুমি! অন্য পার্শ্বে যুগলমূর্তি—সেই তরুণী আর তোমার জুপিটার, অর্ধ-আলিঙ্গনে উভয়ে প্রেমবিহ্বল। ছোট ত্রিপদীর উপরে দুটি শিশুমূর্তির চিত্র—নিষ্পাপ, কোমল পুষ্পের মত সুকুমার। তাদের স্ট্যাণ্ডে-রাখা ছবির নীচে খোলা অবস্থায় চাপা দেওয়া রয়েছে একখানা চিঠি। সদ্য এসেছে, তাড়াতাড়িতে মালিক পড়া শেষ করে ওই ভাবে রেখে গেছেন। শিশু-হস্তের বড় বড় অক্ষরে আঁকাবাঁকা লেখা, পড়তে তোমার কষ্ট হ'ল না, পড়তে তুমি দ্বিধা করলে না। এক নিমেষে তোমার পড়া হয়ে গেল—

'বাবামণি,

কেন তুমি এত দিন আসছ না? মায়ের খুব রাগ হয়েছে তোমার ওপরে। এবারে এলে তোমার সঙ্গে মা কথা বলবে না, জান? কবে তুমি আসবে

শিগগির লিখো। আমাদের বাগান শেষ হয়ে গেছে, সেবারকার মতো তোমায় কিন্তু ঘোড়া হতে হবে। আমরা তোমার পিঠে চড়ব।

তুমি মাকে যেমন একটা ভেল্‌ভেটের থলে দিয়েছিলে, তেমনই দুটো আমাদের জন্যে আনবে। আমরা পাথর কুড়িয়ে রাখব। আমরা ভাল আছি। তুমি চিঠি পেয়েই চ'লে আসবে।

তোমার বাবুল, রুবি'

এই জুপিটারের নিজ আবেষ্টন। এই জুপিটারের স্বকীয় মূর্তি। জুপিটারের নিজমূর্তি দর্শনে সেমেলি ভস্মীভূত হয়ে গেল।

এই তো আমার গল্প, আর নেই। তা হ'লে সমস্ত জান তুমি? প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, শুনলে তো? ছাই হয়ে গেছি। জীবনে জুপিটারকে ভুলতে পারব না।

কিন্তু আমি জানি, তুমি ভুলে যাবে। আমি জানি, যে তোমার জীবন-ইতিহাস লিখছি যে তুমি একদিন ভুলে যাবে। গ্রীক্ পুরাণকার শুধু ভস্মস্তূপ দেখেছিলেন। ভস্ম থেকে জাত 'ফিনিক্স' তাঁদের চোখে পড়ে নি। ভস্মের শেষ ভস্মই নয়, সেমেলি। আমি জানি, নূতন প্রেম তোমার দিগন্ত-সীমায় আবার দেখা দেবে। আমি জানি, তুমি ভুলে যাবে।

সাফো

"The Isle of Greece the Isle of Greece,
Where burning Sappho loved and Sang !"

এখনও ঈষৎ-বিস্মৃত, অস্পষ্ট এই কবিতার ছত্র দুইটি শুনিলে মনের মধ্যে ধূসর অতীত আবার ফিরিয়া আসে। কত কথা মনে জাগে! কত আধ-ভোলা, কত অদ্ভুত—আশ্চর্য স্মৃতি!

মনে পড়ে আমার জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তিক্ত ও বীভৎস রসের সমবায়ে চিত্তপটে আজও তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে।

মনে পড়ে সাফোকে—হাস্যলাস্যমুখরা কৃষ্ণনয়না গ্রীক্ সুন্দরী; রৌপ্যশুভ্র জানু তাহার, উন্নত বক্ষ কঠিন গজদন্তের মতো, পদাঙ্গুলি তাহার স্বর্ণোজ্জ্বল, নীল ইন্দ্রমণি তাহার চক্ষে! আর, সমুদ্র-উত্থিতা বাসনা ও প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি তাহার উপাস্যা।

আর মনে পড়ে আর একজনকে—উদ্ধত যৌবনের তাড়নায় যাহার সাফো সাজিবার স্পর্ধা হইয়াছিল।

তাম্রের ন্যায় অনুজ্জ্বল—রক্ত তাহার গাত্রবর্ণ, কালো চুল পিছনে ঠাসিয়া বাঁধা। ক্ষীণদেহ একটু অবনত। সঙ্কীর্ণ তীক্ষ্ণ নয়ন তাহার তির্যক ভঙ্গীতে উচ্চ গণ্ডদেশের উপর অবস্থিত। অধর তাহার একটি কাটা দাগে বিভক্ত।

লেস্‌বস্ কোথায় আজ গ্রীক্ সাফোর জন্য কাঁদিয়া মরিতেছে? দ্রাক্ষাকুঞ্জে তপ্ত রৌদ্র আজ বৃথাই সাফোকে খুঁজিতেছে। বন্য অলিভ ও দাড়িম্বকুঞ্জ গোপন অন্তরাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে কাহার পরিতৃপ্তির জন্য? ভায়োলেট ও হেয়াসিন আজও তোমার জন্য বিকশিত হয়। অযথা নীলাভ চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ নারীবক্ষে আজও লুন্ঠিত হইতেছে।

কোথায় তুমি সাফো? প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের সৃষ্টির বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াইয়াছিলে নারী হইয়া! নারী হইয়া নারীর সহিত প্রেম বিশ্বে তোমার আশ্চর্য অবদান। কিন্তু অবশেষে পুরুষের কাছে পরাজয় ঘটিল। বিধাতা প্রতিশোধ লইতে জানেন।

ফায়ন তোমাকে ভালবাসে নাই। তোমার জ্বলন্ত প্রেম, তোমার মুখের

কাব্য দিয়া ফেরিঘাটের মাঝি সে কি করিবে? তাহার দৃষ্টি পড়িল প্রতিবেশী কন্যা লিডিয়ার প্রতি। দুঃসহ বেদনায়, অতৃপ্ত কামনায় অভিমানিনী তুমি, নীলসমুদ্রে জীবনের সমাপ্তি ঘটাইলে।

কিন্তু, কেন সাফো? জগতে আরও অন্য পুরুষ ছিল—অনেক গ্রীক পুরুষ তোমাকে কামনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি করিয়াছিলে একমাত্র ফায়নকে। নারীর সহিত মিলনে তোমার রুচি গেল—সে তৃষ্ণা ফায়নকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়া অজস্র কাব্য সৃষ্টিতে ভাঙিয়া পড়িল :—

"Phaon, quench my raging fire
Ere I die of love's desire."

বাসনা ও প্রেমের হে প্রথম মহিলা কবি, হে অদ্বিতীয়া জগৎকবি, তোমার অসহ হৃদয়াবেগ, উত্তপ্ত রক্তস্রোত আজও তোমার লেখনীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

তাহাকে প্রথম দেখি খড়্গপুর স্টেশনে। গাড়ি বিরাট প্ল্যাটফর্মের একটি কোণে দাঁড়াইয়াছে। দিদির সহিত মহিলা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঘাটশিলা যাইতেছি স্বাস্থ্য কামনায়। সেখানে জামাইবাবু আগেই বাড়ি দেখিয়া রাখিয়া আমাদের নামাইয়া লইতে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কথা লইয়া দরদস্তুর করিতেছি, শুনিলাম শুষ্ক ভদ্রতার স্বরে দিদির—"এই যে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

চাহিয়া দেখি রুক্ষ রৌদ্রালোকে সে দাঁড়াইয়া; তাম্রোজ্জ্বল গ্রীবা, বাহু আবৃত করিয়া সাদা কলার তোলা পুরা আস্তিনের জামা, পায়ে ফিতা-বাঁধা কালো পুরুষালি ঢং-এর জুতা, সাদা সরুপাড় শাড়ী।

পুরুষের মত ভঙ্গি তাহার, হাতে মোটা চামড়ার একটি টাকা রাখিবার থলে। পার্শ্বে ক্ষীণা লতাপল্লবিনী একটি কিশোরী, অসহায়ভাবে চাহিয়া আছে, চক্ষের নিম্নে গাঢ় কালিমা।

"এই বিভাকে নিয়ে এক মাসের জন্য ঘাটশিলাতে যাচ্ছি। ওর বাবা ব্যস্ত আছেন, নিজে যেতে পারলেন না, তাই। বিভার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। একমাস থাকলেও নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে।" পুরুষের ভঙ্গিতে বাম হস্তে ললাট হইতে রুক্ষ কেশ অপসারিত করিয়া মন্দিরা বলিল, "এই বুঝি আপনার বোন?"

তাহার দৃষ্টির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম। নারী হইয়া পুরুষের তীব্র দৃষ্টি সে কোথায় পাইল? খর অনুসন্ধানী চক্ষে আমার সঙ্কুচিত দেহ আপাদমস্তক দেখিয়া সে বলিল "তুমি কি স্কুলে পড়?"

দিদি আমাকে ঠেলিয়া পাশে সরাইয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিলেন—"সুমনা কলেজে পড়ে। পূজোর ছুটিতে ঘাটশিলা চলেছে আমার সঙ্গে। উনি ওখানে জায়গা কিনছেন।"

মন্দিরা ও বিভা তাহাদের কামরার দিকে চলিয়া গেলে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের অপস্রিয়মান মূর্তির প্রতি চাহিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া রুদ্ধ আক্রোশের স্বরে দিদি বলিলেন, "দেখলেই গা জ্বলে ওঠে।"

"কাকে দেখলে গা জ্বলে ওঠে দিদি?"

হাল্কা, শাদা জুতোমোজা-পরা নিজের পা দুইখানি লক্ষ্য করিয়া দিদি বলিলেন, "মন্দিরা সেনের সঙ্গে আলাপ আমার ওঁর চাকরির জায়গা থেকে। ওখানে আমাদের বাড়ির পাশে গ্যের্লস স্কুলে ও পড়ায়, থাকেও হস্টেলে। বিভা মেয়েটি ওর মতোই টীচার। দুজনের অতি বন্ধুত্ব। যত সব কেলেঙ্কারি।"

বিমূঢ় প্রশ্ন করিলাম "এতে আর কেলেঙ্কারির কি আছে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে দিদি বলিলেন "অস্বাভাবিক অনাচারকেই আমরা কেলেঙ্কারি বলে থাকি। ভগবানের নিয়মের বিপক্ষে যাওয়া শুধু পাপ নয় পৈশাচিকতা।"

দিদির গম্ভীর বচনবিন্যাস আমার মনে কি এক অজানা অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিল। কলার কাঁদি বেতের ঝুড়িতে রাখিয়া বলিলাম "কী তুমি বল্‌তে চাইছ, দিদি?" আভাস দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলায় ক্ষতি নেই।

চকিতভাবে আমার পানে চাহিয়া দিদি বলিলেন "সাফোর কবিতা পড়িস নি?"

তখনও সাফোর কাব্যের সহিত পরিচয় হয় নাই, বলিলাম "সাফোর কবিতা পড়িনি, কিন্তু তাঁর বিষয়ে সব জানি। মন্দিরা সেন কবিতা লেখেন বুঝি?"

"কবিতা লেখে না। আধুনিকা সাফোর ওইটুকু শুধু বাদ আছে।"

"তার মানে?"

দিদি অপ্রতিভ হাস্যে লজ্জা চাপা দিয়া বলিলেন, "তার মানে সাফোর প্রেম।"

মুহূর্তে সব বুঝিলাম। তীব্র দৃষ্টি, পৌরুষ ভঙ্গি সকলই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কি বীভৎস, কি ঘৃণিত!

আমার স্তম্ভিত মুখের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া দিদি কহিলেন, "উনি বলেন স্কুল-কলেজে এ রকম কত আছে। মা-বাবা মেয়েদের স্কুলে হস্টেলে কেবল মেয়েদের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্ত হন, ভাবেন আর ভয় কি। কিন্তু যার মনের গতি যেদিকে সেদিকে যাবেই—অযথা শুদ্ধ মেয়েদের সাহচর্যে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট। মেয়েতে মেয়েতে ন্যাকামি, সেটা এরই রূপান্তর মাত্র।"

গাড়ি খড়্গপুর ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধা প্রকৃতির দিকে চাহিলাম। শ্যাম বনশোভার অন্তস্তলে কোথায় বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহার আভায় সমস্ত বনভূমি উদ্দীপ্ত। রুক্ষ লাল মাটির দিকে চাহিয়া উতলা অন্যমনস্ক স্বরে বলিলাম "তাই তো।"

ঘাটশিলায় পাহাড় আছে, সুবর্ণরেখার জলরেখা আছে, অরণ্যানীর নিবিড়তা আছে—আর আছে অনল। জামাইবাবুর ছোট ভাই, এম-এ পরীক্ষার পর দাদার ভূসম্পত্তি দেখিতে আসিয়াছে। আগে কখনও জানিতাম না পুরুষ এত সুন্দর হয়—আজ প্রথম দেখিলাম। দুই বৎসর দিদির বিবাহ হইয়াছে, অনলকে দেখি নাই। বিবাহ-উৎসবে সে যোগদান করে নাই। তাহার তখন অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে অস্ত্রোপচার হইতেছিল।

রমণীর সহস্র কামনা তাহার দেহে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার পরিপূর্ণ রক্ত অধরোষ্ঠের একটি চুম্বনের জন্য ক্রিস্‌চিনা আবার রাজ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন। ঘন কাল বাসনাবিহ্বল চক্ষু তাহার পল্লবসমাকুল। প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটী, দৃঢ় বাহুতে সে প্রকৃত নারী-মনোহর পুরুষ।

গ্রীক সৌন্দর্য দেখি নাই। তবে তাহারই দিকে চাহিয়া অ্যাপোলোর মদিরতা, কিউপিডের চাপল্য, হারকিউলিসের শক্তির একত্র সমাবেশের কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম।

রূপ তাহার অনন্যসাধারণ, মোহন তাহার সবকিছু। কিন্তু বোধহয় ঈশ্বর তাহাকে হৃদয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমার তিলে তিলে জাত প্রেম দুই বৎসর পরে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে অন্য কাহিনী।

গোপালপুর কলোনিতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম সকালের উষ্ণ সূর্যালোকে।

দেখিলাম দূরে মন্দিরা বিভার হাত ধরিয়া ক্ষিপ্র শিকারীর ভঙ্গিতে তাহাকে লইয়া ফুলটুঙ্গি টীলার উপরে উঠিতেছে। সহসা মনে পড়িল কলিকাতার স্নানের ঘরের দেওয়ালে একটি দৃশ্য। বিরাট মাকড়সা হাঁ করিয়া অর্ধগ্রাস করিয়াছে একটি আরশোলাকে। চামড়া-ওঠা মৃত্যু যন্ত্রণায় তাহার সে কি ব্যাকুলতা।

জামাইবাবু চীৎকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া দিদিকে জানাইলেন—"সুজাতা, ওই যে তোমার সাফো।"

"সাফো? ব্যাপার কি বৌদি?" কৌতুহলী দৃষ্টিতে অনল চাহিল। দিদি আস্তে আস্তে তাহাকে কতকগুলি কথা বলিলেন। জামাইবাবু বিদ্রূপমিশ্রিত চাপা হাসিতে উল্লাস ব্যক্ত করিলেন। অনলের কৃষ্ণচক্ষু-তারকা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—"ও, লেস্‌বিয়ান্ লাভ।"

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। ঘাটশিলার নির্জন পথে পথে ম্লান চাঁদের আলোয় ছায়ার মত গ্রীক নারী ঘুরিতেছে। সাফোর মুক্তাশুভ্র পরিচ্ছদ পশ্চাতে ধুলি চুম্বন করিতেছে, বামহস্তে লায়ার যন্ত্র। সূক্ষ্মাগ্র, গোলাপীনখরখচিত তর্জনী তারে আঘাত দিয়া ক্ষীণ ধ্বনি তুলিয়াছে। অন্য হস্তে কুণ্ডাবল্লরী সরাইয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে সে কাহাকে খুঁজিয়া মরিতেছে?

জ্যোৎস্নাবিগলিত লেস্‌বসের রাত্রি। আঙুরের মধুর মতো পাটল, চিক্কণ ত্বকে চন্দ্রালোক ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। পুষ্পবিতানে মর্মর দেবীবক্ষে দুইটি মূর্তি—লঘু মেঘখণ্ড সরিয়া গেল, আলো উজ্জ্বল হইল। আশ্চর্য! উভয়েই নারী!

সুবর্ণরেখার তীরে তীরে আতাম্রবর্ণা মন্দিরা, চক্ষে তাহার হীন কামনার প্রকাশ, দেহে তাহার অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেও যেন কাহাকে চায়! লোলুপ হস্তে মন্দিরা গৈরিক নদীজল স্পর্শ করিতে গেল। তাহার ব্যাকুল হস্তপ্রসারণ এড়াইতে জল সরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ধারা শুষ্ক হইয়া তাহার বক্ষে উপলরাজি ও দগ্ধ রক্তমাটি জাগিয়া উঠিল। নিদ্রাজাগরণে শুনিলাম Radclyff Hall এর আর্তধ্বনি—"Give us the right to live!"

খাবার টেবিলে অনল বলিল, "বউদি ভাই, সাফোকে তো দেখালে কাল। আলাপটা কবে হবে?"

দিদি ঘৃণায় আকুঞ্চিত মুখে বলিলেন, "রামো, রামো! ওইসব কাটখোট্টা পুরুষালি ঢং-এর মেয়েদের দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না আমি। আধুনিক বলেই কি তোমাদের কিছুতেই অশ্রদ্ধা নেই?"

অনল পশ্চাতে গ্রীবা হেলাইয়া হাসিয়া উঠিল—"অশ্রদ্ধার কথা এতে কি আছে, বউদি? কৌতূহল জেগেছে বলেই না আলাপ করতে চাইছি। অস্বাভাবিক কিছু হলেই তাকে জানা-চেনার ইচ্ছা হয়।"

জামাইবাবু টেবিল চাপড়াইলেন—"আমার বদলীর চাকরিতে দেশবিদেশ ঘুরেও সুজাতার সঙ্কীর্ণতা গেল না। আরে, দেখতে বা মিশতে দোষ কি? বিয়ে না করলেই হ'লো।"

"ধন্য তোমাদের আধুনিক শিক্ষা! বিয়ের কথা ওঠে না। যাকে বিদ্রূপ করি তার সঙ্গে মেশবার প্রয়োজন কি?"—দিদি বিরক্ত হইলেন।

"আহাঃ বউদি, আমি হচ্ছি সাইকোলজির ছাত্র। আমি কেবল স্টাডি করতে চাই। ওইতো রূপ, বয়েসেও বোধহয় আমার বড়, তোমার ভাষাতে ওইতো প্রবৃত্তি। কোনও আশঙ্কা নেই, ভাই। একটু মজা দেখতে দাও না।" আমার দিকে ফিরিয়া কোমল অনুরোধের সুরে অনল বলিল "কাল তুমি গিয়ে ওকে এখানে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে বলবে। বৌদির মতো তোমার তো কোনও প্রেজুডিস্ নেই। করবে তো সুমনা?"

তাহার কোন অনুরোধে না বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তখনই রাজী হইলাম।

স্টেশনে দিদির কাছে মন্দিরা বাসস্থানের নির্দেশ দিয়াছিল। ছোট সহর, একতলা বাংলোখানা খুঁজিতে বিলম্ব হইল না। দারোয়ানকে বাহিরে রাখিয়া আমি ভিতরে গেলাম।

নির্জন দ্বিপ্রহর। একখানা ছোট ঘরে ইতস্তত চালডাল ছড়ানো। একপাশে এক স্টোভ। পাশের ঘরের রুদ্ধ জানালা দরজার সংখ্যা দেখিয়া মনে হইল সেখানি বড়। সামনের বারান্দায় দ্বার খোলা থাকিলে গৃহটির একাংশ দেখা যায়।

চারিপাশে নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে ভয় হইল। উঁকি দিয়া জানালা হইতে দেখিতে যাইয়া সহসা মন্দিরার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে স্থির হইয়া গেলাম।

শয্যার একাংশে বিভা নিদ্রিত, তাহার চক্ষু নিমীলিত, মুখ পাণ্ডু-মূর্ছিত। তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্দিরা কি যেন দেখিতেছে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের হিংস্র উগ্রতায় দুই চক্ষু তাহার জ্বলিতেছে, মুখ বিকৃত। মনে হইল কোমল-করুণ, নারীর মুখের সহিত তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই।

অনলকে সমস্ত বলিলাম। পিছনের ঘেরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে সে মোটা ডাক্তারি বই পড়িতেছিল। বইখানা মুড়িয়া আমার দিকে চাহিল—"বোকা মেয়ে, চলে এলে পালিয়ে? কাল আবার যেতে হবে।"

"আর আমাকে বলবেন না, অনলদা।"—নিজপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিলাম "বললেও হয়তো আসবে না। ও-সব মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেশে না।"

"কি জানি! দেখতে দোষ কি চেষ্টা করে? হাতে আমার এখন বিশেষ কোনও কাজ নেই!"—অনলের মুখে ক্রুর ছায়া পড়িল। কিসের নিষ্ফলতায় সে হীরকদন্তে অধর চাপিয়া ধরিল? চক্ষু তাহার সঙ্কুচিত, অধর প্রসারিত।

"বয়েস তোমার কম সুমনা, কিছুই বোঝ না। যে মেয়ে পুরুষের দাবীতে ভাগ বসায় তাকে শাস্তি দিতেই হয়। পুরুষকে বাদ দিয়ে যার চলতে পারে সে তো পুরুষের শত্রু। তাই তাকে জয় করে প্রতিশোধ নিতে হয়। ভগবান চিরদিন নারীকে এখানে পুরুষের কাছে হার মানিয়েছেন। সাফোরও হার হয়েছিল।"

মন্দিরা চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিভার সহিত আসিয়াছিল। তাহার পুরুষালি ঢং-এর বেশবিন্যাসের দিকে চাহিয়া অনল একটু হাসিল। জানি না পুরুষবেশে চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া অর্জুনের অধরোষ্ঠে এমনি সকৌতুক হাসি দেখা দিয়াছিল কি না।

বামহস্তে স্যাণ্ডউইচ্ টুকরায় কামড় দিয়া এবং ডানহস্তে মন্দিরা চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়া অনলের প্রতি লক্ষ্য করিল। রূপপিপাসুর পরিতৃপ্তি ভিন্ন তখনও তাহার চক্ষে কিছু ছিল না। নির্জীব পুত্তলীর মতো বিভা এলোমেলো ভাবে খাইয়া যাইতেছিল, দৃষ্টিতে তাহার ছিল একমাত্র মন্দিরা।

দেখিলাম অনলের অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। সৌন্দর্যের নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব বিকাশ আছে। অনলের লুব্ধ অধরের ঈষৎ আকুঞ্চনে, আকর্ণবিস্তৃত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিক্ষেপের মূল্য হয়তো জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বা বক্তার আজন্ম সাধনার অপেক্ষা নারীচিত্তজয়ে অধিক কার্যকরী।

ঢাকা বারান্দায় চায়ের টেবিল। টিপাইতে রক্ষিত উজ্জ্বল 'ডে লাইট' লণ্ঠনের আশে পাশে অসংখ্য পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়া মরিতেছে, কেহ বা অহেতুক ভ্রমণক্লান্ত হইয়া তপ্ত আলোর উপরেই বসিতেছে। বিচিত্রিত পক্ষ পতঙ্গকুল লাফাইয়া সম্মুখের ঘাসের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে।

সেদিকে চাহিয়া কোমল-মধুর কণ্ঠে অনল বলিল, "মিস্ সেন, আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। সন্ধ্যা হয়ে গেল।"

দিদি মিষ্টান্নের পাত্র সরাইতে সরাইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বিভা চকিত ঈর্ষার দৃষ্টিতে অনলের প্রতি চাহিল। কিন্তু, মন্দিরা সেন রাজী হইল।

গেট খুলিতে যাইয়া মন্দিরা আমার দিকে ফিরিল "বাড়ি থেকে ফটক তোমাদের অনেকটা দূর। তুমি ফিরে যাও, সুমনা। আজকালের মধ্যে আমি আবার আসব। বেশ একসঙ্গে বেড়ানো যাবে।"

আহাঃ, দেখি গেটটা আমাকেই খুলতে দিন, মিস্ সেন। ছেলেরা থাকতে এসব কাজে মেয়েরা কেন?" দ্বি-অর্থক-ভাবে 'ছেলে' ও 'মেয়ে' শব্দের উপর জোর দিয়া যেন প্রভেদ দেখাইয়া অনল বলিল। সাদা গরদের আস্তিন গুটাইয়া অনল মন্দিরাকে সরাইয়া গেট খুলিতে গেল।

দেখিলাম স্বেচ্ছায় অনলের দক্ষিণ হস্ত যেন মন্দিরার দেহ সজোরে নাড়িয়া গেল। স্তিমিত আলোকে চাহিয়া দেখিলাম মন্দিরার বিবর্ণ মুখ আরক্ত, দ্বিধা-বিভক্ত অধরটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

জানি না ফায়ন অনল অপেক্ষা সুপুরুষ ছিল কি না; নারী-হৃদয় জয়ে তাহার অস্ত্র অনল অপেক্ষা মারাত্মক ছিল কি না। শুধু জানি তাহারই জন্য সহস্রবন্দিতা, শ্রেষ্ঠা মহিলা-কবি সাফোর হৃদয় উন্মাদ হইয়াছিল, আর উন্মাদ হইয়াছিল সাফোর যৌবনব্যাকুল গ্রীক্ দেহ। সেই উন্মাদনার শান্তি হইল মিটিলেনীর নীল সমুদ্রজলে। ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধে সাফো বিদ্রোহিনী হইয়াছিল—কিন্তু অবশেষে সেই নিয়মজালে সে বন্দিনী হইল। প্রতিভাপ্রদীপ্ত জীবন বিসর্জন দিয়া সাফো পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

মন্দিরা আসিতে লাগিল প্রায় প্রত্যহ। কোন কোন দিন দুর্বলতার অজুহাতে বিভাকে বাড়ি রাখিয়া অনলের সহিত সে একাকিনী ভ্রমণে বাহির হইত। ঘাটশিলার জলবাতাসের গুণে ইদানীং বিভার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু কেমন যেন একটা অশান্তি, অস্থিরভাব তাহাকে আশ্রয় করিল। মাঝে মাঝে যেন সে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করিত। এক এক সময় নিদারুণ একটা আক্রোশ ও তিক্ত দৃষ্টিতে তাহাকে অনলের দিকে চাহিতে দেখিতাম—দেখিতাম বিফল কোপে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত। অর্ধভুক্ত আরশোলা বোধহয় আর মাকড়সাকে এড়াইতে চাহে না। যাহার উপায়ান্তর থাকিবার কাল শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার অন্য গতি নাই।

দেখিতাম মন্দিরার ক্রমবিবর্তন। কলার তোলা দীর্ঘ আস্তিন জামা সে ত্যাগ করিল, ছোট হাতার রংচঙা ব্লাউস রাত্রি জাগিয়া অনভ্যস্ত হস্তে সেলাই করিল। হাট হইতে রং-করা সস্তা শাড়ী কিনিয়া বিশীর্ণ দেহকে নব রূপ দিবার প্রয়াসে রত হইল। বিহারীদের রূপার ঝুমকা কানে ঝুলাইয়া হাতে গালার জড়ি-জড়ানো চুড়ি পরিয়া রাতা-রাতি সে নারীত্বের পদলাভে উৎসুক হইল। স্বল্প কেশে উচ্চ গণ্ডকে ঢাকিবার ও কাটা ঠোঁটের বিকৃতি গোপন করিবার সে কি তাহার অদম্য প্রয়াস!

দেখিতাম অনলের পরিবর্তন। মন্দিরার প্রতি একান্ত মনোযোগ তাহার ধীরে ধীরে করুণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যে রূপান্তরিত হইতেছিল। ঘৃণামিশ্রিত অবহেলা তাহার আচার ব্যবহারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিজিত হৃদয়ের উপর অধিকার খাটাইতে উদ্যমের প্রয়োজন হয় না।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নদীর ধারে আমরা সকলেই বেড়াইতে গিয়াছিলাম। মন্দিরা বারে বারে অনলের গাত্রের সহিত ইচ্ছা করিয়া গাত্র সংলগ্ন করিতে লাগিল। অঙ্গের বসন অকারণেই যেন তাহার চ্যুত হইতে লাগিল। নারীর স্বভাব যে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে তাহার লজ্জারও অবকাশ নাই।

কিন্তু এ সব কাহার জন্য? নির্লিপ্ত পুরুষের দৃষ্টি পথের গুল্মলতায়। অপার সৌন্দর্য বহন করিয়া তাহার জগতে সে একাকী। মর্মর মসৃণ ললাটে, রোমান নাসিকায়, সূক্ষ্মাগ্র চিবুকে কোন অনুভূতিই ধরা যায় না।

বিভা রাশিরাশি ফুল তুলিতেছিল। লাল কৃষ্ণচূড়া, গোলাপের সহিত সাদা টগর হলুদ ও বেগুনি বন্যপুষ্প মিশাইয়া সে তোড়া বাঁধিয়া ফেলিল। বিনীতা, অনুরক্তা দয়িতার ভঙ্গিতে সে মন্দিরার নিকটে অগ্রসর হইয়া চোখে মুখে কেমন একটা সলাজ অভিমানের ভাব ফুটাইয়া বলিল, "তোমার জন্য ফুল এনেছি।"

অন্যমনস্কভাবে তোড়াটা লইয়া মন্দিরা অগ্রগামী অনলের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সেদিকে চাহিয়া বিক্ষিপ্ত চাপাস্বরে বিভা দাঁত কড়মড় করিল—

"Devil take him. Oh, devil take him!"

পাহাড়ের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম অনল অন্যদিকে

চলিয়া গিয়াছে। দুই হাতে ফুলের তোড়াটি ধরিয়া মন্দিরা একা দাঁড়াইয়া, বন্যপুষ্পের পরাগদলে তাহার আত্মবিস্মৃত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। তির্যক চক্ষে লাঞ্ছিতা অবমানিতার দৃষ্টি। মনের উত্তেজনায় বিভক্ত অধর ঘন আকুঞ্চিত হইতেছে। তাহাকে যেন আরও বীভৎস লাগিল।

আমাদের ঘাটশিলা ছাড়িবার দিন সমাগত হইয়া আসিল। দিদি আর কিছুতেই থাকিতে রাজী হইলেন না। অনলও দিদিকে সমর্থন করিল।

যাত্রা করিবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা অনলের গৃহসংলগ্ন গুদামঘর হইতে আমার ভ্রমণসঙ্গী ছোট অ্যাটাশে কেস্‌টি লইতে আসিয়া মন্দিরা সেনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। দরজার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আমি অনলের ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম।

আরাম-কেদারায় অলস-সৌন্দর্যে অনাসক্তভাবে বই হাতে অনল বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল মন্দিরা।

"বাজে 'কথা বলে নষ্ট করবার সময় আমার নেই"—অনলের দৃঢ় স্বরের উত্তরে মন্দিরা কাতরভাবে বলিল "যাবার আগে আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও। আমাকে কেন তুমি ঘৃণা কর?"

"কেন করি তুমি সেটা ভাল করেই জান।"

"আমার কথাটাও ভেবে দেখ। ছেলেবেলা থেকে হস্টেলে মানুষ, মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। আমার শরীর অন্যরকম। যখন ভালবাসার প্রয়োজন হল তখন পুরুষের দেখা পেলাম না।"

"ছেলেবেলার ভুল ক্ষমা করা চলে। কিন্তু বেশি বয়সেও তোমার সংশোধন হল না?"

"অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে। আর তাছাড়া কোন পুরুষ কোনদিন আমার দিকে তাকিয়ে দেখল না যে।" অত্যন্ত প্রয়াসের সহিত মন্দিরা কথাটি বলিল।

অস্পষ্ট স্বরে একটা বিদেশী শপথের শব্দ উচ্চারণ করিয়া নীরস কণ্ঠে অনল বলিল, "যাই হোক, কথা কাটাকাটি করবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। তোমার মতো মেয়েকে আমি ঘৃণা ছাড়া কিছুই করতে পারি না।" অনল পুস্তকের পাতায় মনঃসংযোগ করিল।

"আমার বেলাতেই তোমরা দোষ দেখ? অথচ গ্রীক্ কবি সাফোও তো এই রকম ছিলেন। তাঁকে তো তোমরা ঘৃণা কর না, তাঁকে তোমরা দেবী বলে পুজো কর।"

এইবার অনল পুস্তক হইতে মুখ তুলিল, তীব্র বিদ্রূপের অর্থাত্মক দৃষ্টিতে মন্দিরার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বিতৃষ্ণার সহিত চাপা গলায় বলিল, "তুমি সাফোই বটে!"

পলকে মন্দিরার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অনলের সহিত সাক্ষাতের প্রথম দিনের ন্যায় তাহার বিকৃত অধর ঘনঘন কম্পিত হইতে লাগিল।

পরের দিন প্রভাতে বিভার ব্যাকুল আহ্বানে আমরা সকলে তাহাদের বাসাবাড়িতে উপস্থিত হইলাম। শয়নগৃহের পাশের ঘরটি মন্দিরা ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তরকারী কাটিবার বড় ছুরিটা সে ব্যবহার করিয়াছিল।

সহস্র বৎসর পূর্বে সাফো মরিয়াছিল। আজ মন্দিরা মরিল। গ্রীক্ নারীর মদিরলাবণ্য, বিজয়িনী প্রতিভা, কিছুই তাহার ছিল না। সে ছিল অনাথা, দরিদ্রা স্কুলশিক্ষয়িত্রী!

লেস্‌বসের বর্ণময় পটভূমিকায় প্রদীপ্তা মহিলা-কবি--আর রূপহীনা, নিঃস্বা মন্দিরা ....

তবু উভয়ের একই পরিণতি।

পঞ্চকন্যা

না না, আমি পুরাণখ্যাতা চিরস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্যে কলম ধরি নি। এ পঞ্চকন্যা আমাদের মধ্যেই বিরাজমানা। ঘরে ঘরে। বালিগঞ্জের ব্যারিষ্টার মিষ্টার জগদীশ রায়ের বিশাল একতলা বাড়ির পাশের ছোট টালির বাংলোখানা আমার। সেখানে দুটি কুকুর, একটি দারোয়ান এবং পুরাতন আয়াকে নিয়ে আমি থাকি। আমার পেশা? সাহিত্য। হ্যাঁ, আজকাল এ দেশেও বিদেশের নজিরে মেয়েরা সাহিত্যকে পেশা ব'লে গ্রহণ করেছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার কথা বেশি বলতে ইচ্ছা করছে না। আজ আমার গল্পের নায়িকা আমি নই, জগদীশ রায়ের একমাত্র মেয়ে সুলেখা ও সুলেখার চার বান্ধবী। মিষ্টার রায় এবং আমার বাংলোর মাঝখানে একটা প্রাচীর আছে, তার গায়ে কালচে-সবুজ শ্যাওলার আস্তর, তার মাথায় মাধবীলতার গোলাপী সাদা রঙের মেলা। সেই প্রাচীরের গায়ে সুলেখার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড ঢালু বারান্দা, বেতের আসবাবে সাজানো। সুলেখার পার্লার। গ্রীষ্মকালে, বিশেষত চাঁদনী রাতে, সুলেখা অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে বন্ধুদের নিয়ে গল্প করে। তাদের উচ্চ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই, তাদের কথা আমি বুঝি। ওই প্রাচীরের পাশেই আমারও বসবার পোর্টিকো, লতাজালে ঢাকা। চারপাশে অজস্র পুষ্পিত গাছের বাক্স সাজানো। সেই কুঞ্জবনের আড়ালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি বসি নিঃশব্দে, হাতে কোন সেলাইয়ের কাজ নিয়ে। প্রবাসী ভ্রাতাদের জন্য নানা উলে জাম্পার বুনি প্রতীক্ষারতা পীনেলোপীর ধৈর্যে। কান থাকে সুলেখা রায়ের বারান্দায়। দোষ মনে করি না। আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী তারা। সুতরাং আমিও বন্ধু।

সুলেখা রায় যেন একটি মহাসাগরের তীর, সেখানে কত যাত্রী আসে, কত জাহাজ নোঙর ফেলে! আবার তারা চ'লে যায়, নূতন দল দেখা দেয়! সে যেন নিজেই ওই ছায়াময় কাননকুন্তলা বাড়িটির সত্তা। কত পাখি বসে, গান গেয়ে যায়! পুরুষদের কথা কিছু বলতে চাই না, কারণ বহুদিন ধ'রে পুরুষ, অশ্রান্তভাবে নিজেদের কথা ব'লে ব'লে লাইব্রেরি ভরিয়েছে। তাদের সে ক্ষমতা আছে। মেয়েদের কথাই এখন বলা দরকার। আমি তাই

সুলেখার মেয়ে-বন্ধুদের কথাই বলব। যারা তার বিশেষ বন্ধু তাদেরই কথা। তারা চারজন ও সুলেখা রায় আমার এই বক্তব্য কাহিনীর 'পঞ্চকন্যা'।

নীল আকাশের ইন্দ্রনীলের সেটিং-এ শুভ্র মুক্তার ঝালরবোনা চাঁদ। আধুনিক ব্রুচ একটি। রায়-বাংলোর তৃণে মরকত, বৃক্ষের গোলাপে চুনি। এক পার্শ্বে ছোট পণ্ডের জল মুক্তার দ্যুতির পাশে হীরক-দীপ্তি ধরেছে। মালী ফোয়ার বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে। অস্থির বাতাস মাধবীর দল ঝরিয়ে ফেলছে। পঞ্চকন্যার পশ্চাৎপটে অসংখ্য সীজনফ্লাওয়ার। আমার বাক্সেবোনা রজনীগন্ধা আর গোলাপী কার্নেশন সুবাস-বিহ্বল ক'রে তুলেছে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা। সুলেখার বাগানে চাঁদ, আমার পোর্টিকোতে অন্ধকার লতার চাঁদোয়ার তলায়। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ব'সে প্রতিটি কথা আমি শুনছি তাদের, হাতে রয়েছে মভ রঙের উল হাতির দাঁতের কাঁটায় গাঁথা। মনে হচ্ছে, নির্লিপ্ত শান্ত ভঙ্গীতে আমি অবসর যাপন করছি নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেলাই হাতে। কিন্তু সেলাই আমার ভান মাত্র, ওদের কথা এমনই চুরি ক'রে শোনা আমার নেশা।

পঞ্চকন্যা অবিবাহিতা। কেন যে, এ কৌতূহল মনে জেগেছে বহুবার! কিছু কিছু কথাও শুনেছি। সম্পূর্ণ কাহিনী আজ উপহার দেব। জানি, আজ এই মদির বাতাসে, দিবা ও রাত্রির এই মিলনের শুভক্ষণে তারা মন খুলবে।

নিত্যকার মত দারোয়ান হাতের কাছে বাদামের সরবৎ ও বিকালের ডাক রেখে গেল। ব্যাঙ্কের শেয়ারে এবার কত ডিভিডেণ্ড পাওয়া যাবে জানবার কৌতূহল নেই এখন। আমার পঞ্চকন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তারা সমবয়স্কা, চব্বিশ থেকে আঠাশের মধ্যে।

গৃহের অধিবাসিনী সুলেখা স্বনামধন্য পিতার আদরিণী কন্যা। বি. এ. পড়া পর্যন্ত কলেজে সময় কাটিয়ে অসুস্থ শরীরের অজুহাতে পরীক্ষা দেয় নি। এই নিদারুণ গরমেও বেতের ইজিচেয়ারের হাতল ও তার পায়ের ওপর দিয়ে একখানা সূক্ষ্ম রেশমের নীলাভ চাদর ঢাকা রয়েছে। পীড়া তার বাতব্যাধি। প্রকৃতির জহরতকে ম্লান করে দিয়ে তার দীর্ঘাকার আঙুল-গুলিতে একটির পর একটি হীরা চাঁদের আলোয় জ্ব'লে উঠছে।

সুলেখার পাশে বেতের সোফায় অর্ধশায়িতা কুমারী মাধবী নন্দী। সুগায়িকা ও কবি। দরিদ্র মাতাপিতার ষষ্ঠ সন্তান।

সুলেখার অন্য পাশের চেয়ারে কুমারী রমলা বসু, বিদেশী শিক্ষার ছাপ-মারা। অত্যাধুনিক পরিবারের অত্যাধুনিকী কন্যা।

রেলিঙে হেলান দিয়ে ব'সে কুমারী অচলা মজুমদার। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

আরও একটু ওপাশে বসেছে কুমারী বকুল সোম। গুণের তালিকা তার দীর্ঘ নয়। কিন্তু নির্মল চাঁদের আলোয় সে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। বকুল অপরূপ সুন্দরী।

রমলা বসু হঠাৎ স্বভাবোচিত উচ্চ হাসির সঙ্গে ব'লে উঠল, "আচ্ছা সুলেখা, আমরা একটা চিরকুমারী সভা খুলি না কেন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে?"

সুলেখা ধীরে ধীরে একটু ন'ড়ে ব'সে অভ্যস্ত বক্রহাস্যে তার অভিজাত-সুলভ মার্জিত নীচু সুরে উত্তর দিল, "সভ্য কিন্তু পাব না। নিজেদের নিয়ে মেতে থাকতে হবে।"

অচলা মজুমদার কালো ফ্রেমের চশমার ঝিলিক হেনে যোগ দিল, "রাইটো। আমাদের আর বাইরের সভ্য দিয়ে কি দরকার? আমরা নিজেরা নিজেতেই সম্পূর্ণ। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব এতদিন টিকে আছে, সভাও টিকে যাবে।"

বকুল সোম মলিন মুখে বলল, "আচ্ছা, একটা অদ্ভুত কথা কি কখনও তোমাদের মনে হয় না? আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?"

"হচ্ছে না অ্যাটঅল। ঠিক ধরেছ তুমি বকুল। অথচ অন্য মেয়েদের চেয়ে, অর্থাৎ যাদের রোজ রোজ বিয়ে হচ্ছে, তাদের চেয়ে আমরা কিছু মন্দ নই।"—অচলা মজুমদার সায় দিল।

রমলা বসু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল,—"আহাঃ অচলা, বল না কেন আমরা অনেক ভাল। গুণ আছে আমাদের সকলের। রূপ? হ্যাঁ সবাই বকুল না হ'লেও কেউই শূর্পণখা নই।"

মাধবী নন্দী চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল,—"আমার অবস্থা খারাপ হ'লেও তোমাদের সকলের টাকাকড়ি আছে। টাকার অভাবে বিয়ে না হওয়ারও কারণ নেই।"

"আর আমাদের চরিত্র,"—অলস ভঙ্গীতে সুলেখা রায় উঠে বসল,—

"হ্যাঁ, chaste as Diana না হলেও আমরা চরিত্রশালিনী। অন্তত, আমার চরিত্র যে ভাল্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসুখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে চরিত্র হারাবার অবকাশ হ'ল না!"

"আমাদের স্বভাব-ব্যবহারও ভাল। কেউ আমাদের নিন্দা করে না। লোকে আমাদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। আমরা হাসিখুশি, আমরা চমৎকার মেয়ে!" বকুল আবার আশ্চর্য হ'ল।

"এদিকে স্বাস্থ্যও আমাদের ভাল। এক সুলেখার সৌখিন অসুখ ছাড়া সকলেই অত্যন্ত সুস্থ। না সুলেখা, I must be frank, তোমার অসুখ মানসিক বিলাস, যেমন ভিয়েনাতে আমার কলেজ-বন্ধু অল্গার ছিল।"— রমলা বসু অকারণে রেলিঙের লতানো গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলল।

"Oh yes, come on Sulekha, be a sport. স্বীকার কর কাজের অভাবে অসুখ তোমার অকাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" নধর-রমণীয় হাতের কররেখা জ্যোৎস্নায় ধ'রে অচলা মজুমদার বলল, "নাঃ আমার হাতে বিয়ে নেই।"

বকুল সোম ব্যথিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "বিয়ে আমি করতে চাই। মাঝে মাঝে জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। আর, তোমরা কেউ বিয়ে-পাগলা না হ'লেও একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে বস নি। আচ্ছা, আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?"

"অথবা আমরা বিয়ে করছি না কেন?"—সুলেখা সংশোধন করল।

চাঁদের ওপর একখানা হাল্কা মেঘ সৌখিন আঁচলের মত বিছিয়ে গেল। চাঁদের ব্রুচে কোন বিলাসিনীর শাড়ি বিদ্ধ হ'ল যেন। চাঁদের আলোয় সুলেখার বাগানের নুড়ির পথ, লাইলাক ঝোপের তলার মাটি কটকী রূপোর কাজের মত ঝকমক ক'রে উঠল। হাস্নু ও-হানার গন্ধে এসে মিশল সোনার-গড়া দেশী চাঁপার তুলনাহীন সুবাস। আবার দক্ষিণের ব্যাকুল বাতাস ব'য়ে গেল ঝাউগাছের জালী-কাটা পাতার গুচ্ছে দোলা দিয়ে। প্যান্সি, জিনিয়ার বেডের পাশে লম্বা সবুজ ফড়িং লাফাতে লাগল। পঞ্চকন্যা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকে একবার মনে মনে বলল, এমন কেন হয়!

ধীরে ধীরে তারা প্রত্যেকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

ধীরে ধীরে তারা নিজেদের কথা পরস্পরের কাছে মন খুলে বলতে লাগল। সেই সব কথা আমিও বলব।

রমলা বসু। এই যে চঞ্চলা লাবণ্যময়ী তরুণী, কে জানে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে এর প্রেম-জীবন শেষ হয়ে গেছে কিনা! রমলা মণীন্দ্র তালুকদারের বাগদত্তা ছিল, মণীন্দ্র গেল বিদেশে, ফিরে এল জার্মান নারী সঙ্গে করে। সেই বছরই রমলা বসু সাগর পার হ'ল শিক্ষার উদ্দেশে।

বহু পুরুষের কামনা-কুটিল বাহু রমলা বসুর ক্ষীণ কটি বেষ্টন করেছে। বহু পুরুষের রুক্ষ অধর তার নরম অধরকে লাঞ্ছনা করেছে। কিন্তু, ওই পর্যন্ত। বিবাহ রমলা করতে পারছে কই? যখন নিরালা রাত্রে নয়নে নিদ্রা আসে না, রমলা ঊর্ধ্ব নেটের মশারির কারুকার্যখচিত চালের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে ব'লে ওঠে, 'মণি, তোমাকে ভুলতে পারি না কেন' ?

অচলার ও বালাই নেই। ছেলেবেলা থেকে পরীক্ষার ফল ভাল করবার দুরূহ প্রয়াসে অন্য দিকে মাথা তার যায়নি। একেবারে অধ্যাপিকা হয়ে ব'সে অচলা বিবাহের কথা ভাববার সময় পেল। কিন্তু বাধা দেখল অনেক। সে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে রোজগার করছে, সে সব কটা পাস ক'রে কলেজে পড়ায়। সুতরাং অভিভাবকেরা তাকে তাঁদের তথাকথিত সুকুমার-মতি তরুণবয়স্ক স্নেহাস্পদ, যারা সাতঘাটের জল খেয়ে চল্লিশ বছরেও কুমার নাম ঘুচোয় নি, তাদের অনুপযুক্তা মনে করেন। অচলার প্রকৃত বয়স ছাব্বিশ শুনে স্থির করেন আসলে ছত্রিশ।

পাত্রদের মতও তাই। চশমা-চোখো টিচারনী চায় না তারা। তারা চায় অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকা। কর্মভীরু এবং সুবিধাবাদীর দল চায় অচলাকে রোজগারের যন্ত্র হিসাবে, কিন্তু অচলা চায় না তাদের। ক্ষোভের সঙ্গে একদিন অচলা বলেছিল আমি শুনেছি, "শৈলেন দেব বিয়ে করতে চায় আমাকে? শৈলেন দেব দুবারের বার বি, এ, পাস করেছে। সে বন্ধুদের ব'লে বেড়াচ্ছে, বিয়ে তো আমি ভাই অচলা মজুমদারকে বিনা কারণে করতে চাচ্ছি না, জমিদারি কিনতে চাচ্ছি।"

বকুলের অবস্থা আরও সঙ্গিন। রূপ দেখে তাকে পুরুষ লুব্ধ পতঙ্গের মত বেষ্টন ক'রে ধরে। বিয়ে খুব কম লোক করতে চায়। তার কারণ বকুল সোম নাচগান জানে না, আধুনিক শিক্ষার অভাবে পুরুষমহলে সে জড়পদার্থ ব'নে যায়। তাকে স্পর্শ করে সুখ আছে, তার সঙ্গে কথায় সুখ কই?

ক্ষণভুঞ্জন উৎসবে তার কোমল দেহ বক্ষে নিপীড়ন ক'রে ধর, তার পল্লব-মসৃণ অধরে জ্বালাময় প্রদাহ এনে দাও। কিন্তু বিবাহ? ওই লাজুক কুনো মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো? অসম্ভব।

বৃদ্ধেরা অবশ্য তরুণীভার্যারূপে বকুল সোমকে কামনা করে, কিন্তু বিদ্যুৎ-বহ্নির মত নিজের রূপকে বকুল বৃদ্ধের উপভোগ-বস্তু ক'রে দিতে চায় না। বিশেষ শ্রেণীর যুবকেরা আসে লুব্ধ হয়ে, বিবাহ-প্রস্তাবও দু-একজন করে। কিন্তু তাদের লম্পট-দৃষ্টি নাকি বকুলের দেহে উষ্ণ সলিল সিঞ্চন করে। দুঃখের জীবন বকুল সোমের।

তারপর সুলেখা। এই রহস্যময়ী ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি নিজের দোষে এবং নিজের ইচ্ছায় আজও কুমারী। দেহে তার রোগ আছে। বিদ্যা বা গুণ বাহুল্য নেই তার। দেখতে সে ভাল নয়। তবু তার যা আছে, বন্ধুদের কারও নেই তা। তার আছে ব্যক্তিত্ব।

কাউকে পছন্দ হয় না সুলেখা রায়ের। পুরুষকে সে খেলার সামগ্রী মনে করে। নেড়ে-চেড়ে দেখে খেলায় অরুচি হ'লে দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু দেউল তার খালি থাকে না, নব পূজারী আসে।

পুরুষের ক্ষৌরিত কঠিন গণ্ড তার কথার বাণে কেমন রক্তাভা ধরে, পুরুষের সবল মন তার হাসির ছোঁয়ায় কেমন ক'রে কাঁপে—সেই দেখা, সেই খেলা সুলেখার নেশা! নেশাখোর মেয়ের বিয়ে হওয়া দায়।

এদের মধ্যে মাধবী নন্দী কিছু পরিমাণে স্থৈর্য লাভ করেছে। বিয়ে তার ঠিক হয়ে আছে পাড়ারই ছেলের সঙ্গে। সে ছেলে ভাল চাকরি পেয়ে কিছু টাকা জমাতে পারলেই বিয়ে হবে। তার আগে মাধবী রাজি নয়। অভাবে বর্ধিত হয়ে মাধবীর অভাবকে বড় ভয়। মাধবীর মনের মানুষ তার দ্বারে আসে পায়ে হেঁটে নয়, মোটরে চ'ড়ে। মাধবীর প্রেমে আর মাধবীর আদর্শে মিল হয় নি। তাই দুঃখ মাধবীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। রাত্রে যখন প্রিয়-বাহু-বল্লরী তাকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে অতি কাছে টেনে নেবে, তখন মলিন শয্যা মেঝেতে বিছিয়ে সূতিকাগ্রস্তা জননীর পাশে শুতে হয়। যখন ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তাকে আকুল ক'রে তোলে, তখন চাঁদের দিকে চেয়ে গান গাওয়া বা খাতা-পেন্সিলে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা ভিন্ন মাধবীর আঠাশ বছরের জীবনে কিছুই করবার থাকে না। কবি মন মাধবীর। তার প্রয়োজন একটি প্রেমিককে, যার গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী হবে, যার রক্তধারায় সে সন্তান রচনা করবে।

সুলেখার বাগানের ঝাউগাছে একটানা সুরে পাখি গান গেয়ে উঠল। ছোট ছোট মেঘ সেই পাখির ঝাঁকের মতই আকাশ দিয়ে আনাগোনা করতে লাগল। আকাশের পাখি তারা। বাগানের পাখি তাই ডাকছে তাদের নীচে নেমে ধরিত্রীকে শ্যামল ক'রে দিতে। লিলি অব দি ভ্যালির পরাগে হলুদ-কালো প্রজাপতি এসে বসল। পণ্ডের জলে একটা নীল স্ন্যাপড্রাগন ফুল খ'সে প'ড়ে ভাসতে লাগল। চাঁদ আরও মাথার ওপরে উঠেছে।

আমার আয়া এসে জানাল, রাত্রির খাবার দেওয়া হয়েছে। আজকের মত শেষ হ'ল আমার পঞ্চকন্যার কাহিনী। উল-কাঁটা পাশের টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আমার পোর্টিকোর পল্লব-প্রাচীর পার হয়ে চাঁদের আলো এসেছে। সে আলো আমার কালো চুলে বাঁকা হয়ে পড়ল।

পঞ্চকন্যা সহসা চুপ ক'রে গেল। তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে। ভয় পেয়েছে তারা। চোখ নীচু ক'রে হীরক-শোভিত সরু আঙুল দিয়ে সুলেখা চুল ঠিক করতে লাগল। তার হাতের হীরকখণ্ডগুলো উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে জ্ব'লে উঠল, আমাকে যেন সাবধান করতে,—সাবধান! তুমি কি আমাদের কথা শুনেছ?

সুলেখার আধুনিক সত্তা জানে না বন্ধুত্ব কেবল ব্যবহারিক জগতের নৈকট্যে হয় না, বন্ধুত্ব হয় হৃদয়ে। আমি তাই তাদের বন্ধু। তাই আমার বন্ধুর মন আজ তাদের ব'লে দিতে চায়: হায় আধুনিকী! তোমরা ভুলে যাও তোমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচারশক্তি, আদর্শবাদ! তরল ভাবপ্রবণতা তোমাদের সুখী করবে, মূঢ় ভালবাসা পথ দেখাবে! নির্বিকার নারীত্বে তোমাদের মুক্তি। জনারণ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মনের মানুষকে কি চিনে বার করা যায়? মনের মানুষ চিরদিন মনেই থাকে। সমস্যা তোমাদের জটিল। বিবাহ ও প্রেম এক নয়। সেকালের মন নিয়ে হয়তো অজ্ঞান হবে, কিন্তু অসুখী তো হবে না!

আবিষ্কার

সে নিঃশব্দে শুয়ে আছে। তার নাম সুমিত্রা। তার বয়স সাতাশ। সে একটি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির ওপর দিকের অফিসর। তার বিবাহ হয় নি। সে সুন্দরী।

গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ সন্ধ্যার ছায়া এতক্ষণে কালো হয়েছে। সেই কালো আকাশ আলো করে গাছে ফুটে ওঠার মত সারি সারি তারা ফুটেছে। বাতাসে এখনও উত্তাপ। ক্লান্ত শরীরে তবু আরাম আসে।

সুমিত্রার বাড়ী তিনখানি ঘরের সমষ্টি মাত্র। পাচক, দাস-দাসী নিয়ে সুমিত্রা থাকে। এই আরাম ও বিলাসের নিবিড়তা সুমিত্রার নিজের গড়া। প্রসাধন-টেবিলের ওপর রজনীগন্ধার ঝাড়, উপহার নয়, নিজের অর্থে ক্রীত। খাটের নীচে ফার-বসান চটিজুতো; প্রসাধন টেবিলের টুলে একপ্রস্ত প্রবাল বর্ণের পা-জামা; তেপায়ার উপর এক বাক্স চকোলেট ও একগুচ্ছ সচিত্র ইংরেজী মাসিক; কোণে রেডিও ধীরে বেজে যাচ্ছে; ছোট সেক্রেটারিয়েটের ওপরে কলম-পেন্সিল সাজান, পাইলটের প্রেজেন্টেসন সেট্; মনোগ্রাম-করা কাগজ, রূপোর কাগজচাপা। এর একটিও সুন্দরীর পদপল্লবে উপহার আসে নি। সুন্দরীকেই নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে কিনে নিতে হয়েছে। সেইখানেই গৌরব সুমিত্রার।

খাটের নীল আচ্ছাদনীর ওপর এলায়িত চুল সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল সুমিত্রা—সাতটা কুড়ি। অফিসের পোষাক ছাড়বার পূর্বেই ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চেয়েছিল।

পাশের ঘরে পোষাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে সুমিত্রা রেফ্রিজেরেটর থেকে কমলার ঠাণ্ডা রস কাচের টাম্বলারে চুমুক দিতে দিতে ফিরে এল। দাসী মেমসাহেবের খাদ্যাদি ঠিকমত রেখে গেছে। তিনকুলে এক পল্লীগ্রামবাসী কাকা ভিন্ন কেউ নেই সুমিত্রার। ক্ষতি নেই, টাকা থাকলে যত্ন-আদরও কেনা যায়।

এখন কি করা যেতে পারে, সুমিত্রা ভেবে দেখল। কাল শনিবার, তা ছাড়া অফিসে কাজের কোন চাপ নেই আজ। কপি-রাইটিং যা জমেছিল, সুমিত্রা বহুদিন বাড়ীতে পর্যন্ত কাজ করে শেষ করে ফেলেছে। মেনন অ্যাণ্ড

কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের ছবি কি ভাবে আঁকতে হবে তা-ও আর্টিষ্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকালবেলা ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্টি দেবেন, কিন্তু সে ভার তাঁর সেক্রেটারী মিস্ ব্ল্যাগ্ ডেনের ওপরে। শুধু চমৎকার সাজ করে চা খেয়ে সুমিত্রা রয় নিষ্কৃতি পাবে। ভাবতে বেশ লাগে। প্রকাণ্ড অফিসে প্রকাণ্ড টেবিল, রূপোর সার্ভিস্-সেট, চমৎকার চায়না, অটুট-ইস্ত্রি পোষাক; কেতাদুরস্ত আচরণ। পাশে যিনি বসবেন তাঁর নাম সংবাদপত্র প্রায়ই অলঙ্কৃত করে। মিস্ রয়কে এটা-ওটা এগিয়ে দিতে ব্যস্ত হবেন যিনি, তাঁর মাসিক আয়ের অঙ্ক শুনলে কাকা বিহ্বল হয়ে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে বার বার ভাইঝির দিকে তাকাবেন। কিন্তু এই সব পার্টির পিছনে কি আছে? হতাশা। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি, ওপরওলার মন যোগাবার গ্লানি, ভবিষ্যতের বিফলতা। পাশের লোক চল্লিশের উর্ধ্বে, বিবাহিত, পরিবার-পরিবৃত। ব্যস্ত ভদ্রতায় যিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন, সুমিত্রার মত মেয়ে প্রত্যহ বহু সংখ্যায় দেখা তাঁর অভ্যাস আছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বুলডগ-মন মিস্ ব্ল্যাগডেনের মোহিনীমায়ার শিকলে বাঁধা। অন্য চারিটি পুরুষ অফিসরের মধ্যে দুই জনের সঙ্গে সুমিত্রার প্রচণ্ড ঝগড়া। কারণ, মেয়ে হয়েও সুমিত্রার কর্মনৈপুণ্য তাদের অপেক্ষা বেশী, পূর্বেই প্রমোশন পেয়েছে সে। তাই আধবয়সী, সংসারচাপক্লিষ্ট অফিসর দুইটির বিদ্বেষের অন্ত নেই। আর একজন অ-বাঙালী, অত্যন্ত গম্ভীর। কারুর সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলেন না। চতুর্থ ব্যক্তি সহাস্য সুপুরুষ, অবিবাহিত তরুণ। কিন্তু সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত তাঁর মন সম্পূর্ণ হরণ করেছে। শীঘ্রই নাকি বিবাহও হ'বে।

সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত এই টেবিলে নিমন্ত্রণ পায়নি, সুমিত্রা পেয়েছে। কিন্তু সুমিত্রার সযত্নে সাহেবী ভঙ্গিতে বিন্যস্ত অলকাবলী, দীর্ঘ নখর, ক্ষীণ-শুভ্র দেহবল্লরী, রঞ্জনীরক্ত ওষ্ঠাধর, আপাদমস্তক সূক্ষ্ম পালিশ কিছুই প্রদ্যোত বসুর চোখে পড়বে না, জানে সুমিত্রা। তাঁর মনে জেগে থাকবে অনুপস্থিতা মীনা দত্তের গোল মুখ, এলোমেলো চুল, ন্যাকা ন্যাকা কথা, আর কথায় কথায় হাসাকাঁদা। অদ্ভুত!

এখন কি করা যায়? কাছেই 'কিস্‌মেট' হচ্ছে। দেখা যেতে পারে। কিন্তু একা সিনেমা ভাল লাগে না। মঞ্জুকে সঙ্গে ডাকা যেতে পারে। কাকীমার ভাইঝি মঞ্জু হষ্টেলে থাকে, অনুমতি চাই তার পক্ষে। থাক্‌গে, গিয়েই কাজ নেই ছবিতে।

বরঞ্চ কিছু পড়া যাক্। বহুদিন ও বালাই নেই। কপি লিখে আর বিজ্ঞাপনের মালমশলা নেড়ে নেড়ে জ্ঞানের পথ বন্ধ করেছে সুমিত্রা। জওহরলালের 'The Discovery of India' ('দি ডিস্কভারি অব্ ইণ্ডিয়া') সামান্য একটু পড়া হয়েছে মাত্র। সেক্শনাল বুককেস্ থেকে বইটি নিয়ে খাটের পাশে আরাম-চেয়ারে বসল সুমিত্রা টেবল্ল্যাম্প জ্বালিয়ে।

বইখানা জন্মদিনে এক বন্ধুর উপহার। সেই বন্ধুই মীনা দত্তের জন্মদিনে উপহার দিয়েছে নীল ফুলতোলা ক্রেপ্ ডি-শিনের ব্লাউস্পিস্। এত পার্থক্য কেন? সত্যই কি সুমিত্রার জীবনের প্রতীক গুরুগম্ভীর 'দি ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া'; আর মীনা দত্তের প্রতীক ফুলতোলা জামা?

মীনার কথা ভেবে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। মীনা অতি সাধারণ, একশো ষাট টাকা মাত্র পায়। সুমিত্রার আদেশে মীনার জীবন-মরণ হয় কর্মক্ষেত্রে। এক ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে দরিদ্র পরিবারে নগণ্য জীবনযাত্রা মীনার। অতি ন্যাকা, সুলভ ধরনের মেয়ে। কি করে প্রদ্যোত বসুর মত ধীমান্ তাকে পছন্দ করে ফেললেন, বিশেষতঃ যখন সেখানে অফিসর সুমিত্রা রয় উপস্থিত ছিল?

তাতে ক্ষোভ নেই সুমিত্রার। নিজের উপযুক্ত পুরুষ সে পায় নি খুঁজে। নিঃসঙ্গ জীবনের গাম্ভীর্য নিয়ে সে গৌরবে সমাসীন। প্রদ্যোত বসু প্রত্যেকটি মতামতে তার শ্রদ্ধা দেখান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত স্বীকার করেন—"Miss Roy at times surpasses even herself". সে যা চেয়েছিল—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, সম্মান, সবই পেয়েছে। অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে সুমিত্রা নিজেকে আর হীন করবে না।

মনোযোগ সহকারে সুমিত্রা পড়ে যেতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই তন্ময়তা এসে গেল। একটি বিরাট মানবের বিরাট হৃদয়ের অন্বেষণ সুমিত্রার দিনযাত্রার ক্ষুদ্রতাকে কিছুক্ষণের জন্যও ভুলিয়ে দিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি গিরিগুহায়, প্রতিটি পত্রপল্লবে যে অমর জীবনস্রোত শতাব্দীর আঘাত প্রতিহত করে আজও অফুরন্ত উৎসাহে প্রবহমান, তারই আনন্দ নেহেরুর চক্ষে ভারতের অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রতীয়মান করেছে। সুমিত্রা কি এই ভারতবর্ষ চেনে না? এই ভারতের অধিকার তার জন্মগত। বেদান্ত ও উপনিষদের দেশে আজ সুমিত্রার মত মেয়ের স্থান কোথায় সে কথা 'দি ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া'র কোথায় লেখা আছে কিনা সুমিত্রা খুঁজতে লাগল। খোঁজাই বোধহয় ভারতীয় মনের বিশেষত্ব।

"The Upanishads are instinct with a spirit of enquiry, of mental adventure, of a passion for finding out truth about things. The emphasis is essentially on self-realization, on knowledge of the individual self".

সুতরাং মনের মধ্যে এই অন্বেষণের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সহসা প্রদীপের কথা মনে পড়ে গেল। সহপাঠিনী নিবেদিতার বড়ভাই সে। বহুদিনের আলাপ আজও জমে ওঠেনি। কারণ প্রদীপ কিঞ্চিৎ লজ্জাশীল; পিতার অফিসে নির্বিবাদে কাজ করে বাকী সময় ক্যামেরা নিয়ে কাটায়। সেই স্বল্প পরিচয়কে গভীরতা দিতে হ'লে উদ্যোগী হতে হ'বে সুমিত্রার নিজেকে। হাত নিস্‌পিস্ করে উঠল সুমিত্রার। লবিতে টেলিফোন। এখন প্রদীপ বাড়িতেই আছে। টেলিফোনে এই নির্জন সন্ধ্যার আলাপে নিশ্চয় অন্তরঙ্গতার সুর লাগবে। তারপর সুমিত্রা তাকে ডাকবে—'আসুন না, এখনও তো রাত হয় নি। কাছাকাছেই তো বাড়ী। আসুন না—"

তবে, নিস্পৃহ পুরুষকে যার ইচ্ছা সাধুক, সুমিত্রা সাধবে না। সাধারণ প্রদীপ। প্রদীপের চেয়ে 'ডিস্‌কভারি অব্ ইণ্ডিয়া'র আকর্ষণ বেশী।

"But that very individualism led them to attach little importance to the social aspect of man, of man's duty to society. For each person life was divided and fixed up, a bundle of duties and responsibilities within his narrow sphere. The idea is perhaps a modern development."

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। সহসা শোবার ঘরের পর্দা ঠেলে কতকগুলো প্যাকেট হাতে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল সুমিত্রার বান্ধবী সুধীরা।—"উঃ, আজ সারাদিন ঘুরছি ভাই। গাড়ীটা পেয়েছি কিনা। মনে হ'ল পথে তোর সঙ্গে দেখাটাও করে যাই। কি করছিস সুমি, একা বসে বসে? মার্কেট থেকে এই কেক-প্যাটি কিনলাম। চা আনতে বল্, ধ্বংস করা যাক।"

বই রেখে মৃদু হাস্যে সুমিত্রা চেয়ে রইল। সুধীরা তার থেকে বছর দুয়েক ছোট। তবু লেসের বাণ্ডিল আর ব্রোকেটের ফুলশোভিত এত উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরবার বয়স সুধীরারও নেই। আহ্লাদে খুকী ধরনে ঘাড় নেড়ে সুধীরা বলল—"বেশ আছিস, সুমি। অতগুলো টাকা পাচ্ছিস! স্বাধীন ভাবে রয়েছিস। নিজের কর্তা নিজে।"

চায়ের কথা ভৃত্যকে বলে এসে সুমিত্রা সুধীরার পাশে বিছানায় বসল, হাল্কা সাটীনের ঢাকনা,—"দিন দিন সৌখিন হচ্ছিস, সুমি। হবে না কেন? তোর জগৎ তো তুই নিজে।"

চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিয়ে সুমিত্রা নীরবে হাসল। ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুধীরা মন্তব্য পাস করল—"তোর সঙ্গে নিজেকে বদলাতে পারলে বেঁচে যেতাম, সুমি।"

এবারে সুমিত্রার নীরব হাস্যে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ মিলল। সত্যই বেশ আছে সে, বেশ আছে। নিজের ইচ্ছা মত নিজের আদর্শে জীবন যাপন করার ক্ষমতা সে অর্জন করেছে। এই ক্ষমতা হস্তচ্যুত করবে কেন সুমিত্রা? প্রদীপের রোজগার তার চেয়ে কম। তবে ধনী যৌথ পরিবারে স্বাচ্ছল্যের অবকাশ হ'বে। হয়তো নিবেদিতার ঘটকালি এবং সুমিত্রার নিজের উদ্যমে লজ্জাশীল প্রদীপ লজ্জা ত্যাগ করে বিবাহ-প্রস্তাব করতে পারে। নিবেদিতা বিবাহিতা। তবু অনেক ননদ, অনেক জা নিয়ে ঘর করতে হ'বে সুমিত্রার। আঙ্গুলের কিউটেক্স-রং পান সাজার চুন-খয়ের ম্লান হয়ে যাবে। কেতা-করা চুল রাখা চলবে না। প্রত্যহ শাশুড়ী শিশিভরা মাথাঘষা-মশলা দেওয়া লাল গন্ধতেল এবং ফিতে কাঁটা হাতে ডাকবেন—"ও ছোটবৌমা, চুল বাঁধতে এস।" প্রাত্যহিক বরাদ্দের নাপতিনী এসে দেড় ইঞ্চি লম্বা সযত্ন বর্ধিত পায়ের নখ কচকচ করে কেটে ফেলে ঘষঘষ করে টকটকে আলতা পায়ে চওড়া করে লেপে দিয়ে যাবে। ছোটবউ সে হ'বে, সুতরাং মাথা থেকে ডুরে শাড়ীর আঁচল নামানো চলবে না। সারা দ্বিপ্রহর শীতল পাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর নভেল পড়ে চমৎকার সাফল্যমণ্ডিত কর্মজীবনের সমাধি হ'বে সুমিত্রার।

কিন্তু মনের মত বিবাহিত জীবন হতে পারত সুমিত্রার; প্রেমের সঙ্গে কর্মজীবনকেও মেলান চলত, যদি প্রদ্যোত বসুর মত কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সম্ভবপর হ'ত। যে জীবনে সে অভ্যস্ত, সেই জীবন যাপন করা যেত। সুমিত্রা ও প্রদ্যোত বসু এক পর্যায়ের। সুমিত্রা নিজের পর্যায়ে থাকতে চায়, কিন্তু ভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিকে কেন প্রদ্যোত বসু মনোনয়ন করলেন, যখন সহধর্মী সুমিত্রা সম্মুখে উপস্থিত ছিল? এই বিস্ময়কর প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পায়নি সুমিত্রা।

যাক্, আমার জীবনই ভাল। ফার-বসান চটির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা সুখের নিঃশ্বাস ফেলে এতক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। সুধীরা এসে তাকে রক্ষা

করেছে। এখনই সে প্রদীপকে টেলিফোন করেছিল আর কি! হয়তো, কে জানে এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতেই তার জীবনে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলবন্ধনে পড়ে যেত। সুধীরা ঠিক সময়ে এসেছে।

আনন্দিত মনে সুমিত্রা প্রশ্ন করল—"কি সুধীরা, লাল চিঠি আসছে কবে?"

হাত মুখ ঘুরিয়ে কেকে কামড় দিয়ে সুধীরা ভরা গলায় উত্তর দিল—"আর ভাই, ভাল লাগে না। এবারের সম্বন্ধ হচ্ছে জমিদার তনয়ের সঙ্গে। খুব বনেদী সেকেলে বাড়ী। শ্রীমানের বয়স সাতাশ। ভেবে দেখ সুমি, প্রায় তোর বয়সী। তোর বয়সী লোক আমার স্বামী হ'বে, কি ভীষণ মজার কথা!"

সুমিত্রার মনের প্রান্ত চমকে উঠে সংযত হয়ে গেল আবার। তার বয়সী ব্যক্তি তারি বান্ধবীর স্বামী হবার যোগ্যতা রাখে! তা হলে সুমিত্রার বয়স এতই বেশী হয়েছে?

কেকের গুঁড়ো কাপড় থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে সুধীরা আধ-আধ খুকীর স্বরে বলল—"এখানে বিয়ে হলে ভাই, স্বাধীনতাটি যা সামান্যও নেই নেই করে আছে, তা-ও যাবে। অতি গোঁড়া পরিবার। ছাব্বিশ বয়েসই হোক, আর বি-এ পাশই করি চলতে হবে ছাব্বিশ বছর আগের কনে' বউয়ের চালে। বাবা ওদের এত টাকা দেখে সব ভুলে গেছেন।"

সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল—"লেখাপড়াজানা বয়স্থা মেয়ে ঘরে নিয়েও কি তাঁরা তার কাছে পর্দা আশা করবেন?"

"ওই তো মজা, সুমি। পুত্র চায় শিক্ষিত। তাই বি-এ পাস এম-এ পাসের খোঁজ পড়ে আজকাল। কিন্তু অন্দর তার অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। সুতরাং আলোকপ্রাপ্তা বধূকে ঘরে এনে আবার তাকে অন্ধকারে পোরবার চেষ্টা করা হয়। এই তো মজা সুমি।"

এই ট্রাজেডিতে মজার কি উপাদান থাকতে পারে সুমিত্রা খুঁজে পেল না। তবে সুধীরার কথাটার সত্য উপলব্ধি করল সে। প্রদীপকে বিবাহ করলে সুমিত্রার ভাগ্যেও এই হ'বে। ভালই হয়েছে, টেলিফোন করা হয়নি। সুধীরাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ভৃত্য চায়ের ট্রে অপসারিত করলে সুমিত্রা বলল—"তা হ'লে এই বিয়েতে তুমি অমত জানাও না কেন?"

হাত-ব্যাগ খুলে সিল্কের রুমালে মুখ মুছে সুধীরা উত্তর দিল, "মত অমতের কি-ই বা আছে? বিয়ে যখন করতেই হবে, এক ভাবে হলেই হ'ল। বাবা-মায়ের জন্যে সব কিছু সহ্য করতেই হবে।"

কিন্তু উপরোধে ঢেঁকি গেলবার মত মুখভার নয় সুধীরার। কথার সুরে কিছু নির্লিপ্ত আত্মসমর্পণ বেজে উঠলেও তার বাহ্য আকৃতি অন্য কথা বলে। পুলক-প্রবাহ সুধীরার দেহের প্রতিটি রেখায়।

তবে? যদি সুধীরা যেন তেন প্রকারেণ বিবাহে সুখী হ'তে পারে, সুমিত্রাই বা পারবে না কেন? পর মুহূর্তেই মনকে শাসন করল সুমিত্রা। অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করবার দীনতা আজ তার ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে। মীনা দত্ত, সুধীরা, এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। গড্ডালিকা প্রবাহের অন্তর্গত এরা। সুমিত্রার স্বাতন্ত্র্য আছে।

মন শক্ত করে সুমিত্রা সুধীরাকে একটি নাতি-দীর্ঘ উপদেশাত্মক বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হ'ল। কথা আরম্ভ করবার পূর্বেই টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্ করে।

"হ্যালো!" গলার স্বর সুমিত্রার আগ্রহে ঈষৎ কম্পিত, "হ্যালো, কে?" 'Hoping against hope' বলে একটি কথা ছিল শোনা, আজ অন্তর দিয়ে তার মানে বুঝল সুমিত্রা। হয়তো লজ্জার বাঁধ ভেঙেছে। প্রদীপ কি?

পুরুষালী গম্ভীর গলার পরিবর্তে মিহি ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, "আমি মাসীমা। সুমি, ধীরা কি ওখানে আছে?"

"ডেকে দিচ্ছি,"—সুমিত্রা ঘরে এসে জানাল, "সুধীরা, তোমাকে তোমার মা খুঁজছেন।"

"কি মুস্কিল, এক মিনিট শান্তিতে থাকবার উপায় নেই"—গজগজ করতে করতে সুধীরা লবিতে বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। ছি, ছি, এত অধঃপতন হয়েছে তার? প্রদীপের টেলিফোন দিয়ে তার কি প্রয়োজন? একটা মেয়ের থেকে কম আয় যার, তাকে সুমিত্রা বর চায় না।

দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে এলায়িত অঞ্চল সামলে সুধীরা ফিরে এল, "চললাম ভাই। বাড়ীর লোকেরা নাকি আধঘণ্টা ধরে আমাকে খোঁজবার জন্যে সমস্ত বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী টেলিফোন করছে। রাত হয়েছে কি না একটু। অমনি ওঁদের ভয় হয়েছে আমি বোধহয় পথেই নিকেশ হয়ে গেছি।

আর বলিস না সুমি, তুই আমার অবস্থা বুঝবি নে। সুখের জীবন তোর। যা খুশী তাই করতে পারিস, বাধা দেবার কেউ নেই।" জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সুধীরা চলে গেল।

এখন সুমিত্রা একা সম্পূর্ণ হৃদয়, বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে একা। বাধা দেবার কেউ নেই, আবার ব্যাকুল হবারও কেউ নেই। সারারাত্রি যদি বাড়ী না ফেরে সে, কোন স্নেহান্ধ হৃদয় চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াবে না। দাসত্ব করছে সুধীরা, সে দাসত্ব ভালবাসার কাছে। হায়, সুধীরা তার সঙ্গে নিজেকে বদলাতে চায়!

আরাম-চেয়ারে বসে পড়ল সুমিত্রা, পায়ের কাছে খসে ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে অনাদৃত 'ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া', পাতা উল্টে যাচ্ছে পাখার বাতাসে—"a passion for finding out the truth, ...", ... "a bundle of duties within his narrow sphere..."

বইয়ের দিকে মন নেই সুমিত্রার। চারিপাশে তার রচিত হয়েছে একটি নিঃসঙ্গতার দুর্গ, খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জগতের সমস্ত নিঃসঙ্গ নারীহৃদয়ের বিলাপ। সুমিত্রার উদ্‌ভ্রান্ত আহ্বান ছাদ ভেদ করে উঠছে না, ডাকতে পারছে না অন্য কোন হৃদয়কে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সুমিত্রা। ঠিক এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্য নারী স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়। তার সমস্ত বন্ধুরা তাই বিবাহ করছে, তাই সুধীরা বিবাহে উৎসুক। সুমিত্রা কেবল নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নিতে যাচ্ছে। সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতা ভীতিজনক। ঠিক! তাই তো নিঃসঙ্গ প্রদ্যোত বসু সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্তের কাছে আশ্রয় খুঁজেছে। মীনা দত্ত সুমিত্রার মত নিঃসঙ্গ নয়, তার গৃহ পরিজনপরিপূর্ণ, শিশু-কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে মুখর। মীনা দত্ত গৃহ রচনা করতে জানে।

আর সুমিত্রা? কাকা-কাকীর ইচ্ছা ছিল সুমিত্রার কাছে থাকেন: তা হ'লে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম হবে, ভাইঝিরও রক্ষণাবেক্ষণ চলবে। কিন্তু সুমিত্রার বাইরের নিঃসঙ্গতা যে তার অন্তরের প্রতিফলন। সে রাজী হয় নি।

হ'লে হয়তো ভাল হ'ত। নারীর চরম একাকিত্ব পুরুষকে দূরে সরিয়ে দেয়, পুরুষ চায় নীড়। আজ সুমিত্রার জীবনের ছাঁচ পৃথক হয়ে গেছে, নীড়

বাঁধবার কৌশল অফিসর সুমিত্রা রয় জানে না। তাই প্রদ্যোত বসু সুমিত্রার জন্য নয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ভাবতে লাগল সুমিত্রা। আত্মজিজ্ঞাসা বেদান্ত ও উপনিষদের দেশের জন্মগত অধিকার। 'আত্মানং বিদ্ধি'। সুমিত্রার মত আধুনিকারও নিজেকে জানা প্রয়োজন। সুমিত্রা, তুমি কি চাও?

চাই পরম নিঃসঙ্গতাকে এড়িয়ে যেতে। আমার গৃহ রচিত হয়েছে আমার নিজেকে কেন্দ্র করে, আমার প্রাত্যহিক সুখের উপকরণ সযত্নে আহৃত করে। অন্য কোন ব্যক্তির জন্য চিন্তা-দুশ্চিন্তার মাধুর্যপূর্ণ ব্যাকুলতার স্বাদ আমার জগৎ জানে না। চাই এই আত্মঘাতী আত্মকেন্দ্রিকতাকে এড়িয়ে যেতে। নিজের তুচ্ছ কর্মপদ্ধতি দিয়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাই না।

প্রদ্যোত বসুকে আমার প্রয়োজন নেই। আমার অবচেতন মন চায় প্রদীপকে, তার সুখপূর্ণ গৃহের বেষ্টনীতে। আমি গৃহ বাঁধতে পারি নি, যে পেরেছে, তারি গৃহে আমি আশ্রয় চাই।

প্রদ্যোত বসু আমার স্বপ্ন নয়। দশটায় যে যার কর্মস্থলে চলে যাব, ছয়টায় কর্মক্লান্ত দেহে ফিরে এসে দেখব অপরজন অনুপস্থিত। অথবা, সাজান ফ্ল্যাটের সাহেবী আবহাওয়ায় আবার একাকিত্ব অনুভব করব বাড়ীতে বসে বসে স্বামীর বহির্গমনে। আমি চাই অসংখ্য পরিজনকে অসংখ্য স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে; তাদের জন্য প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার ও অসুবিধা-অনটনের মধ্যে আমার অতৃপ্ত অন্তরের অপরিসীম ভালবাসার প্রবৃত্তিকে ধন্য করতে। নিজেকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমার পূর্বে সহস্র নারী যা করেছে, আমার পরে সহস্র নারী যা করবে, আমিও তাই করতে চাই। একটি সাধারণ ছকের অঙ্গীভূত হয়ে জীবনের জটিলতাকে অতিক্রম করতে চাই।

লবিতে চলে এল সুমিত্রা। টেলিফোনে আর সুমিত্রার কণ্ঠ কম্পিত নয়—"হ্যালো, কে?...প্রদীপ বাবু বাড়ী আছেন? ...একটু ওঁকে ডেকে দিন না...

ভ্যামপায়ার

অমিতা, আজও তোমার মুখেচোখে সহস্রবন্দিতার মদির লাবণ্যের আলোছায়া-লীলা দেখি! আকর্ণ হরিণ-নয়নে, এখনও অমিতা, আধজাগা স্বপ্নের মাধুর্য? তোমার শত-উপভুক্ত রক্তিম অধর অসহায় শিশুর অভিমানে এখনও স্ফুরিত হয়? যে-মনের ছায়া আজ ত্রিংশোত্তীর্ণা তোমার মুখে দেখা দিতেছে, সে-মন অত মধুর নয়। এ কথা আমি জানি।

মারি ষ্টোপসের পিতা বলিয়াছিলেন, "ষোল বছরে কেহ তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিলে গর্ববোধ করিও না। ষাট বছরে যদি সুন্দর থাক, তবে তুমি সুন্দরী। বেশী বয়সে যদি তোমার সৌন্দর্য থাকে, তবে তাহা আত্মার সৌন্দর্য।"

তোমার আত্মা? হায় অমিতা, এখনও কি তোমার আত্মা আছে? তোমার নিজের লেখা কবিতা আজ তোমাকে শুনাইতেছি—

চলো যাই তৃণক্ষেত্রে সমাধির 'পরে,
কিনে নাও দু'আনার মৌসুমীফুল,
বিছায়ে প্রণাম কর উদ্দেশে আত্মার,
আমারি নিহত আত্মা—আমি হত্যাকারী।
শাস্তি দাও, হে দেবতা, দণ্ড দাও আজি,
থেকো না নির্বাক হয়ে হে জড় পুত্তলী,
বিশ্বের সভার মাঝে দেখাও আমারে,
আমি-ই করেছি হত্যা—আমি হত্যাকারী।

জমিদার রমাপ্রসন্ন রায়ের একমাত্র গর্বিতা কন্যা তুমি। তোমার বড় ভাই সাগরপারের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া ব্যস্ত। তোমার দ্বিতীয় ভ্রাতা পাটনা আদালতের ব্যারিষ্টার। তিনি তো কলিকাতাতেই আইন-জীবিকার অনুসরণ করিতে পারিতেন? কিন্তু পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে তিনি স্বেচ্ছায় প্রবাসী। তোমার আচার-পরায়ণা মাতা তাঁহারি নিকটে বাস করেন। কেন অমিতা?

তোমার পিতা সন্ধ্যার পর নিশাচর আখ্যা লাভ করেন সুতরাং তোমাদের

বালিগঞ্জের রম্য প্রাসাদে সান্ধ্য সমাজের একমাত্র কেন্দ্রস্থল—তুমি। তোমাকে বেষ্টন করিয়া বহু মধুপের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়; বহু মধুকর তোমার শিখায় জীবনদান্ করে; বহুর পক্ষচ্ছেদ হয়। তাহারা তোমার পাদপীঠতলে কেবল জনতার সংখ্যা বাড়াইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে আমি একজন।

তোমার কি আছে? তুমি চলনসই গান গাহিতে পার, তুমি উৎকৃষ্ট কবিতা লেখ কখনও কখনও, এইমাত্র। তুমি কি রূপসী? না, না অমিতা, আমার মত মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিও তোমাকে সুন্দরী বলিবে না। তবে? একদিনের সান্ধ্য আসরে তোমার প্রবেশ বর্ণনা করি:—

আমরা ভৃত্যবাহিত চা-পাত্র হস্তে অধীর প্রতীক্ষা করিতেছি। সম্মুখের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে তুমি। দরজার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা বলিতে লাগিলে। সেই অবকাশে তোমার দিকে নির্নিমেষে আমরা চাহিয়া দেখিলাম। নীলশাড়ী জড়ানো মূর্তি তোমার। তন্বী সাজিবার দুরূহ প্রয়াসকে তুমি স্বীকার কর নাই। সুতরাং মধ্যবয়স্কা সুলভ ঈষৎ স্থূল দেহ তোমার, পরিচ্ছদ এলোমেলো। দীর্ঘাঙ্গী নও তুমি, গাত্রবর্ণ শ্যাম। অতি সাধারণ! আমাদের মন নৈরাশ্যমিশ্রিত ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "অতি সাধারণ!" আমাদের উন্মাদনার কি এই উপযুক্ত আধার? অবশেষে টাইটানিয়ার প্রমাদ কি আমাদেরও বিভ্রান্ত করিল?

তুমি কথা শেষ করিয়া আমাদের দিকে এতক্ষণে ফিরিলে। বিজলীর আলোক নিমেষে তোমার সকল মুখকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তুমি আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিলে—"ভাল আছেন সব?" আমরা নিস্তব্ধ হইয়া গেলাম। আমাদের নৈরাশ্য নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কোনও নারীর মুখে এত পবিত্রতা, এত সরসতা, এত মাধুর্য আমরা দেখি নাই। তুমি রূপসী কি রূপহীনা তাহা ভাবিবার প্রয়োজন হইল না। অমিতা, তুমি অপরূপ।

কিন্তু, এই পবিত্রতা তোমার মুখের উপর কোথা হইতে আসিল বল? আবার তোমার কবিতা শুনাই—

> —তিলে তিলে হত্যা করি আপনার অশান্ত আত্মায়
> কর্দমকূপের মাঝে মৃতদেহ করেছি নিক্ষেপ।
> আলোক সে চেয়েছিল, দিয়াছি তমিস্রা উপহার,
> ভালবাসা চেয়েছিল, লালসা তাহারে মম দান।

এই কবিতা পাঠ করিয়া শুধু একটি কথাই বলিতে পারি, তুমি অত্যুক্তি কর নাই।

তোমার বিবাহ হয় নাই বলিলে লোকে মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবে, তাহারা বলিবে তুমি বিবাহ কর নাই। হিন্দু কুমারীর পক্ষে তোমার বয়স কুলীনকুমারীর বয়সকেও লজ্জা দেয়। অর্থের অভাব নাই। স্তাবক প্রচুর। কিন্তু তুমি বিবাহ কর নাই। তাই বোধহয় তোমার আচারপরায়ণা মাতা পুত্রের সহিত দেশান্তরী হইয়াছেন। তোমার আচার তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই হয়তো। কিংবা, অন্য কোনও রহস্য আছে?

অমিতা, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহি নাই। সহস্র জীবিত প্রেমিক তোমার—তোমাকে লাভ করিয়া অহরহ তাহাদের সহিত সংগ্রাম আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি গীতি-কবিতার অধ্যাপক, আমার প্রেম ক্লাসিক নহে। আমি শান্তি ভালবাসি, আমার প্রেম ভীরু সাধারণ কিশোরীর রূপ ধরিয়া আসে, সহস্র-বন্দিতা, তোমার রূপে নহে। তাহাকে আমি তিরস্কার করি। তাহার সহিত আমার ঘরোয়া আলোচনা চলে। আমার বাহু-বন্ধনে সে স্বর্গ খুঁজিয়া পায়। আমি চাই অতি সাধারণ একটি সহজ বাঙালীর মেয়ে, যাহাকে অতি সাধারণ আবেষ্টনীতে সহজ ভাবে গ্রহণ করিব। তবু দীপশিখা, আমিও তোমার একজন দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ। অমিতা, আমার বুদ্ধি তোমার নিকট হইতে আমাকে দূরে রাখিলেও আমার মন একান্ত ভাবে তোমারি অধীন। তাহার সে অধীনতা দূর করিবার মন্ত্র আমি জানি না। জীবিতদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের আশাও আমার নাই।

বারীন্দ্র সংগ্রাম ভালবাসিত। সৈন্যদলে বড় অফিসার সে। যুদ্ধ তাহার ব্যবসায় মাত্র নহে, ব্যসন! সুদীর্ঘ ছয়ফুট দেহ, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বক্ষ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্থানচ্যুত করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। বাধা তাহাকে উত্তেজিত করিত, প্রতিযোগিতা তাহাকে উন্মাদনা দিত। এই দুইটি বস্তুই তোমার নিকটে আসিলে সে পাইত। ধনীর বেপরোয়া পুত্র সে—সভয়ে তাহার ক্যাডিলাক গাড়ীর পথ আমরা ছাড়িয়া দিলাম।

তুমি অর্ধেক ধরা দিয়াছিলে, অথবা ধরা দিবার ভাণ করিতে। বারীন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তোমাকে যেন সবলে নিজের কক্ষের মধ্যে টানিয়া লইতে চাহিত। তবু কেন সবলে প্রাণপণ প্রতিরোধ করিতে? তোমার মধ্যে এই অলঙ্ঘ্য বাধার অর্থ কি? যেন তোমার গজদন্তের দুর্গ হইতে কিছুটা বিচ্যুতা

হইতে, ক্ষণিকের জন্য ওই প্রদীপ্ত দৃষ্টি কোমল হইয়া যাইত। আবার চেতনা লাভ করিতে, আবার নির্মমগতিতে প্রেমের পথ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া আনিতে। তোমার মধ্যে এ কি বাধা! তোমার স্তাবকদের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া বারীন্দ্র তোমাকেও জয় করিল। কিন্তু, অবশেষে তোমার মধ্যে সেই একটা কি যেন আছে, তাহার নিকটে বারীন্দ্র পরাজিত হইল। তাহাকে অন্যান্য বহুজনের মত বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলাম।

কর্মশৈথিল্যের জন্য সমরবিভাগ হইতে বারীন্দ্র বরখাস্ত হইল। ভগ্ন দেউলের দেবহীন নিরানন্দ ছায়ার অভিব্যক্তি দেখিলাম তাহার চোখেমুখে। তোমার অনুরাগের চিহ্ন যে অধরকে আরক্ত রাখিয়াছিল, সে অধর কালিমাময় হইল নৈরাশ্য-গ্লানিতে। কেমন একটা পরাস্ত কাপুরুষ ভাব তাহার গতি-ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল! সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইলাম তাহার চক্ষে নিবিড় আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া।

আরও একটি প্রাণীর রক্তে তোমার 'ভ্যামপায়ার' আত্মা সিক্ত হইয়া গেল, কিন্তু ওই আশ্চর্য-মুখের একটি রেখাও কঠিন হইল না! লঘুচিত্ত বিলাসিনী যদি তুমি হইতে, আমরা বাঁচিয়া যাইতাম। তোমাকে ধরিয়া ছুঁইয়া, কাচের বাসনের মত চূর্ণ চূর্ণ করিয়া আমরা স্বস্তিলাভ করিতাম। কিন্তু, তুমি যে ভীতিজনক, নিজের আত্মাকে শুধু হত্যা করিতেছ না, বহুকে হত্যা করিয়া রক্তশোষণ করিতেছ তুমি। অন্যকে হত্যা করিবার পাপ আত্মহত্যারূপে নিজের উপর আরোপ করিয়া কবিতা লিখিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিলাস—মন্দ উপায় নহে। মার্টার সাজিয়া নারীর চিরাচরিত মানোকিষ্ট-বৃত্তি তৃপ্ত করিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিজের নিকট মহৎ প্রতিপন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত আছ। তবু তোমাকেই আমরা ভালবাসিয়াছি।

বারীন্দ্রের চোখে আতঙ্ক কেন? সে আতঙ্ক ভাষাহীন হইলেও তীব্র, কৌতূহল উদ্রেক করে, অথচ অস্বস্তি জানায়। সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার তো তাহার স্বভাবে ছিল না।

পার্থসারথী আমার বন্ধু। অনন্যসাধারণ মেধা তাহার। ডক্টরেটের থিসিস্ লিখিবার সময়ে সহসা তোমার সহিত আলাপ হইয়া গেল। আমার আবাল্যবন্ধু সে হইলেও তোমার সহিত আমি পার্থের আলাপ করাইয়া দেই নাই। কারণ, আমার ভগিনী বিনতা পার্থকে হৃদয় দান করিয়াছে বলিয়া জানিতাম।

সেই দড়ি-টানাটানির খেলা আবার দেখিলাম। পার্থের প্রদীপ্ত নয়নে রাত্রির তমিস্রা নামিয়া আসিতেছে দেখিলাম। বিনতার দেহ বিশীর্ণ হইতেছে দেখিলাম। যে ধ্বংসদেবতা এক হস্তে তাহাদের উভয়ের ধ্বংস আনিতেছেন সেই দেবতা আবার অন্য হস্তে তোমার সর্বাঙ্গে লাবণ্য বর্ষণ করিতেছেন তাহাও দেখিলাম।

বাধ্য হইয়া তোমার নিকটে গেলাম,—"অমিতা, তুমি পার্থকে ভালবাস?"

একটা নীচু কাউচে বসিয়া গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিতেছিলে, চকিতে মুখ ফিরাইলে,—"ভালবাসি? না।"

যেন ভালবাসা তোমার পক্ষে একটি মহা অপরাধ।

"তাহলে ওকে মুক্তি দাও না।"

তুমি উঠিয়া দাঁড়াইলে, অশান্ত গতিতে সারা ঘর দুই একবার ভ্রমণ করিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলে— "আমাকে ও মুক্তি দিক।"

"অমিতা, তুমি চিরদিনই মুক্ত। তুমি তা জান।"

"তোমাকে বিশেষ বন্ধুর মত দেখি তাই বলছি, আমি মুক্ত নই। কোন-খানে বেশী বাঁধা বলে অন্যত্র বন্ধন চাই না।"

"তবে পার্থ কি করবে, অমিতা?"

"জানি না, আমাকে বিরক্ত না করলেই হল। এদের এই আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে আমার কি কষ্ট হয় না?"

"প্রতিরোধের দরকার কি, অমিতা?

আমার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তিক্ত হাসির সহিত উত্তর দিলে, "তুমি বুঝবে না।"

নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম। বিনতার ম্লান মূর্তি অহরহ মনে জাগরূক থাকিলেও বেশী বুঝিবার প্রচেষ্টায় দাবী আমার নাই। কিন্তু মনে হইতে লাগিল ওই অসামান্য মনও কোথায় বাঁধা আছে! সে কোন অসামান্য বস্তু?

কিন্তু বেশী বুঝিবার প্রচেষ্টাই অবশেষে আমারও ধ্বংস আনিল। তোমার রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হইল। নিজের বুদ্ধির প্রাবল্যে তোমার ভীষণতা অনুভব করিয়া আমিও পালাইয়া আসিলাম। সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমার চক্ষেও আতঙ্কের ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

পার্থ এখন ধর্মজীবন গ্রহণ করিয়া আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে রুক্ষণে তোমার নিকটে অনুরোধ লইয়া

গিয়াছিলাম। কুণ্ঠিত-দীন কণ্ঠে বিনতা বলিয়াছিল, "দাদা, তোমার বন্ধু অমিতাদি তাঁকে একবার ডাকলেই তিনি ফিরে আসবেন।"

আমার অনুরোধ শুনিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়াছিলে আজ স্পষ্ট মনে আছে, "পার্থকে ডাকা সম্ভব নয়। তাকে বিয়ে করতে পারব না তো।"

"বিয়ে তো একদিন কাউকে করতেই হবে, অমিতা।"

তুমি তোমার একাদশতম চায়ের পাত্র মুখে ধরিয়াছিলে—গভীর অর্থপূর্ণ আশ্চর্য তোমার চক্ষু দুইটি, রহস্যের সহিত ব্যঙ্গের দুর্লভ সমাবেশ। একখানি ক্রীম-ক্র্যাকার আমার দিকে অগ্রসর করিয়া টি-পট হইতে আর এক পাত্র চা আমার জন্য ঢালিতে ঢালিতে অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলে, "বিয়ে আমার পক্ষে অসম্ভব।"

জীবনে প্রথম তোমার উপর আমার তীব্র ক্রোধ এবং ঘৃণার উদ্রেক হইল—"অসম্ভব! কেন অসম্ভব? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।"

বিদ্যুৎচমকের উজ্জ্বল তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলে, "সাবধান! তোমার বুদ্ধি বেশী বলেই জানি। কিন্তু বুদ্ধির বাইরেও একটা জগৎ আছে।—"There are some more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"—

"অমিতা, তুমি কি জান না তোমার চেয়ে দশবছরের ছোট আমার বোন বিনতা এই পার্থকে ভালবাসে। তারই অনুরোধ তুমি পার্থকে একবার ডাক।"

অন্যমনস্ক ভাবে বলিলে, "বিনতা পার্থকে ভালবাসে! জানতাম না। বিনতাকে বলে দিও পার্থকে এমন কথা জানিয়েছি যার পরে সে আমার আশা রাখতে পারে না।"

"কিন্তু অমিতা, যতদিন তুমি অন্য কাউকে বিয়ে না করছ ততদিন তোমার অনুরক্তেরা অন্য কারো দিকে ফিরে চাইতেও পারবে না, তা সে অন্য কেউ তাদের জন্য প্রাণই দিক না কেন।"—আমার গলা ধরিয়া আসিল।

"তুমি জানোনা, আমি বিয়ে করতে পারি না।"—নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় আর এক পাত্র চা ঢালিয়া মুখে ধরিলে।

অসহ্য! অমিতা, আমার নিকটেও তুমি সেদিন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিলে, "বিয়ে আমরা সকলে তোমাকে জোর করে করতে বাধ্য করাব। সমাজের মঙ্গলের জন্য তোমার বিয়ে করতে হবে। তোমার কৌমার্য-বিলাস সাধারণের

কাছে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে! স্বপ্ন নিয়ে ভুলে থাকবার বয়স তোমার নেই, দায়িত্ব এড়িয়ে কতদিন চলবে, বল? নিজের প্রকৃত রূপ তুমি দেখতে পাও না। আমরা দেখি। তোমার কবিতা পড়ে বিনতা তোমার অন্ধ ভক্ত ছিল, সে আজ তোমাকে ঘৃণা করে। ডগ্ ইন্ ম্যান্জার! তোমার আটালাণ্টার রেস আজও শেষ হ'ল না? পার্থ কি করে তোমার আশা ছাড়তে পারে?"

সহসা আমার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলে—"কি করে ছাড়তে পারে এস দেখাচ্ছি। মূর্খ তুমি, না জেনে আমার বিচার করতে যেও না।"

তোমার দৃঢ় আকর্ষণে অনাত্মীয় পুরুষ আমি বসিবার ঘর হইতে দ্বিতলে তোমার শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম। জনশূন্য বাড়ীতে নির্জন সন্ধ্যা, দর্শক কেহ ছিল না।

"দেখ, দেখ, কেন আমি বিয়ে করতে পারি না। যারা আমার প্রার্থী কেবল তাদেরি এ কথা বলেছি! কিন্তু, তোমার নিষ্ঠুর সমালোচনা আমার অসহ্য।"—সবলে শয়নকক্ষের ভিতরের ঘরটির রুদ্ধ তালাবদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিলে। বৈদ্যুতিক আলোর উজ্জ্বলতায় গৃহটির অন্ধকার মুহূর্তের মধ্যে বিদূরিত হইল।

প্রাচীর গাত্রের কয়েকখানি চিত্রের দিকে চাহিয়া তোমার রহস্যের যবনিকা আমার নিকটে চিরদিনের মত উন্মোচিত হইয়া গেল। তোমার মুখে বিজয় হাস্য, তোমার বিদেহী প্রণয়ীর নিকটে আমারও চরম পরাজয় দেখিবার আশায় তোমার চক্ষে আত্মপ্রসন্ন অপূর্ব দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। জীবিতদের সহিত সংগ্রাম চলে, মৃতের নিকটে শূরশ্রেষ্ঠও নিরস্ত।

মধ্যপ্রাচীরে সুদর্শন তরুণ যুবকের বিরাট তৈলচিত্র লম্বিত। সহসা মনে হয় রক্ত-মাংসের মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, মনে ভীতিবিস্ময়ের উদ্রেক হয়। দুইপার্শ্বে নববিবাহিত দম্পতীর রঞ্জিত বৃহৎ দুইখানি চিত্র। ওই যুবকের পার্শ্বে বসিয়া আছ কিশোরী তুমি, নিম্নে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের তারিখ। দ্বিতীয় প্রাচীরে সেই করুণের শ্মশানযাত্রায় শবদেহের চিত্র। নিম্নের তারিখ সপ্তদশ বৎসর পূর্বের। তৃতীয় প্রাচীরে তোমার মৃত পতির অসংখ্য চিত্র, নানা বয়সের, নানা দেশের। সারা গৃহে পুরুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সজ্জিত। মিশরের পিরামিড!

দেখিলাম একদৃষ্টে তুমি তোমার অশরীরী প্রণয়ীর প্রতি চাহিয়া আছ—যেন কোনও গোপন উৎস হইতে কাহারও প্রেমের সঞ্চিত ধারা তোমার

মুখে অপরূপ সরসতা জোগাইতেছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া পলাইয়া আসিলাম।

জীর্ণ সমাজের শেষ প্রতীক তুমি। বিদ্রোহ মনে স্পর্শ করিয়াছে। তবু অভিজাতবংশের শীলতা প্রহরীর মত তোমাকে ঘেরিয়া আছে। হয়তো অকালবৈধব্যে মর্মাহত মাতা-পিতা বড় সাধ করিয়া তোমাকে কুমারীর বেশে সাজাইয়া মনের অনুশোচনা মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। নবপরিচিতদের নিকট হইতে তোমার বিগত জীবন গোপন করিয়া তাঁহারা তোমাকে হিন্দু বিধবার অবশ্য পালনীয় কঠোরতা অবলম্বন করিতে দেন নাই। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিদ্রোহ—ওইটুকু মাত্র।

তোমার বিদ্রোহ আরও বেশী। তোমার বিদ্রোহের মাত্রা সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার মাতা এবং ভ্রাতা পলাতক। কিন্তু হায় অমিতা, তোমার বিবাহ যে আপোষ নিষ্পত্তির নামান্তর মাত্র।

অজ্ঞান বালিকাবয়সে জমিদারদুহিতার মর্যাদানুযায়ী বাল্যবিবাহ তোমার অমতে সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের সহিত হইয়াছিল। নারীত্ব বিকশিত হইবার পূর্বেই সীমন্ত আকস্মিকভাবে সিন্দুরশূন্য হইল। তোমার প্রেম যখন জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার ভার কে বহিবে? তোমার আশ্চর্য ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মন বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চাহিল সমাজের অর্থহীন অনুশাসনের বিরুদ্ধে। নারীর চিরাচরিত সংস্কার তখনি তর্জনী উদ্যত করিল। সুতরাং তুমি সত্যই অদ্ভুত হইলে—তুমি প্রেম করিলে বিবাহ বাদ দিয়া।

অমিতা, মনে ভাবিতেছ ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছ, সংগ্রাম করিতেছ লালসার বিরুদ্ধে? তোমার সাহস নাই, অথচ ভণ্ডামি আছে। নিজের আত্মসংযমে নিজের উপর শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, নিজেকে মহৎ কল্পনা করিয়া বাঁচিয়া আছ তুমি। পরলোকগত, বহুদিন-বিস্মৃত স্বামীর বাষ্পের ন্যায় আকারহীন স্মৃতি তোমার জীবনে ধর্মোন্মাদ আনিয়াছে। পুতুলপূজা তুমি কর না, তুমি আধুনিকী। অথচ এই তপশ্চর্যার পৌত্তলিকতা জগতের বাহিরে তোমাকে লইয়া গিয়াছে। তুমি স্বতন্ত্রতায় অনন্যসাধারণ হইয়াছ। পবিত্রতা তোমার মুখে বাসা বাঁধিয়াছে, প্রেমিকজনের রক্তশোধনকারী আত্মার আত্মজিজ্ঞাসা নীরব করিয়াছ অদ্ভুত উপায়ে। শত প্রেমিকের হত্যার রক্তে অপরূপ দ্যুতি লাভ করিয়াছে তোমার ওই মুখখানি।

চরম বিদ্রোহের সাহস তোমার নাই, কাপুরুষমনা। ভাল করিয়া পরিচয়ের পূর্বে যে প্রেমিক তোমাকে নিষ্ফলা মরুভূমির বন্ধ্যাত্বে বিসর্জন দিয়া চলিয়া গেল, তাহারি উদ্দেশ্যে তাহার ক্ষীয়মান সামান্য একটু স্মৃতিরেখাকে ধরিয়া জীবনের দিক হইতে যে সমাজ তোমাকে মুখ ফিরাইয়া কর্কশ শুষ্ক জীবন-যাপন করিতে আদেশ দেয়, তাহাকে তোমার বুদ্ধিপ্রখর কবিচিত্ত মানিতে চাহে না। তোমার সতেজ, আধুনিক মন প্রাচীন-গলিত সমাজের এই নির্বোধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু, দীর্ঘ দিনের বন্ধনে অভ্যস্ত অভিজাত-রক্তধারায় সম্পূর্ণ বিদ্রোহের সাহস নাই। তাই এই বীভৎস রূপ তুমি ধরিয়াছ, অমিতা। প্রেমকে নামমাত্র মূল্যে গ্রহণ করিয়া অবহেলায় পথের পার্শ্বে ফেলিয়া গিয়াছ, প্রেমের নিকটে ধরা দাও নাই। নিজের সংস্কার বজায় রাখিতে গিয়া তারুণ্যের আত্মদানে তুমি প্রশ্রয় দিয়াছ। শত সহস্র জীবন দিয়া গ্রথিত তৈমুরের বিজয়স্তম্ভের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া মৃতের উপাসনায় নিজের আত্মরতির উপাসনা করিয়া তুমি ভাবিতেছ—তুমি সাধারণের বহু উর্ধ্বে। অমিতা, সত্যই তুমি অপরূপ!

অনার্য প্রেমিক

বৃক্ষ···শাল, আম, দেবদারু।

পুষ্প···গুলঞ্চ, কুর্চি।

দৃশ্য···পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত সাঁওতাল প্রদেশ।

এই পটভূমিকায় এক দ্বিতলবাটীর সম্মুখে রেণু বিচরণ করিতেছে। ক্ষীণাঙ্গী, অনুজ্জ্বল-গৌর তাহার গাত্রবর্ণ। বামহস্তে কাব্যপুস্তক কালোচুলে ঈষৎ অযত্নে ও অনেকখানি যত্নে স্থাপিত পুষ্পগুচ্ছ। কৈশোর বহুদিন গত হইয়াছে। আজ তাহার যৌবনের অবসান, নিঃসঙ্গ—একক।

* * * *

রেণুকা দেবী পদযুগল শালে আবৃত করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, পার্শ্বস্থ ত্রিপদীতে 'টেবেল ল্যাম্প' জ্বলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট, ম্লান আলোকে গৃহখানি স্বপ্নতন্দ্রাজড়িত রহস্যাগারের রূপ ধারণ করিয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দক্ষিণাবাতাসে উগ্র চম্পকসুবাস ভাসিয়া আসিতেছে।

বহুদিন, বহুদিন এ কাহিনী শুনিতেছি; জানি আরও আমাকে শুনিতে হইবে, যতদিন রেণুকা দেবী জীবিত থাকেন। এইরূপ কত আমার কর্মক্লান্ত অবসর-সন্ধ্যা রেণুকা দেবীর রৌপ্যখচিত অলকে বিজলি বাতির মুমূর্ষু-দীপ্তি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গিয়াছে। দূর উদ্যানের সৌরভ ভাসিয়া আসিয়াছে বৃথা। বৃথা আমার প্রিয়া প্রদীপ্ত আঁখির নীরব ইঙ্গিত পাঠাইয়াছে। রেণুকা দেবীর সহস্রখ্যাত উপাখ্যান আমার বহুবার শুনিতে হইয়াছে। উপায়ান্তর নাই। রেণুকা দেবী আমার প্রিয়ার অভিভাবিকা। আমি তাঁহাকে সারাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছি নিজের চিকিৎসায়।

তাঁহার দৃশ্যতঃ ব্যাধি বাত। অন্তরাল ব্যাধি অত্যধিক কাব্যচর্চা এবং তাহার সহিত সেই অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিরকৌমার্য।

"বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, ইন্দ্র, আর সহ্য হয়না!" রেণুকা দেবী দক্ষিণপদ আকুঞ্চিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যবয়স্কসুলভ মলিন মুখমণ্ডল মলিনতর

হইল,—"মনে হয় কে যেন চিবিয়ে খাচ্ছে! কেন সারছে না ইন্দ্র? একটা অন্যায় করেছিলাম জীবনে, এ তার-ই শাস্তি।"

ঔষধের ব্যবস্থা আমার করিতে হইল না, রেণুকা দেবী নিজেই নির্দেশ দিয়াছেন। আবার সু-অভিনীত আগ্রহে চেয়ারখানি সরাইয়া আনিলাম; বলিলাম, "না না, অন্যায় করেননি আপনি, ভুল করেছিলেন মাত্র। ভুলের অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে।"

"ভুল করবার বয়স আমার তখন ছিল না। আমি তখন বত্রিশ।"

* * * *

সাঁওতালী প্রদেশের হাটের দিন। কতলোক রেণুদের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল ক্রীত দ্রব্যের বোঝা লইয়া। দূর পাহাড়ের উপর তাহাদের গ্রাম। সূর্য অস্ত যাইতেছে, আকাশের অন্যপার্শ্বে সহসাগত চন্দ্র। সূর্যের খরপ্রভায় সে চন্দ্র নিষ্প্রভ হইলেও স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। কি আশ্চর্য, একই আকাশে সূর্য ও চন্দ্র!

সাঁওতালী দাসী সুকী চায়ের পাত্র হাতে রেণুকে দিতে আসিল। একদল সাঁওতালী মেয়ে একঘেয়ে সুরে কি একটা দুর্বোধ্য গান করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রেণু সুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওইরকম গান তুমি করতে পারো? কি বলছে ওরা?"

'বোনদিদি' রেণুর হাতে চায়ের পাত্র দিয়া সুকী একটু কৃতিত্বের হাসি হাসিয়া জানাইল, সে সমস্ত গীতই জানে, প্রয়োজন হইলে এখনই গাহিতে পারে।

প্রয়োজন হইল। বারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া সুকী ভাঙা-ভাঙা গলায় একটানা সুরে গান ধরিয়া ফেলিল—

"শালবন রাজদ বাহা বাগাওয়ান,
বারটি পাঁচিলী বাহা বাগাওয়ান,
দারে মা লিক্ লিক্
বাহা মা লাক্ লাক্
চেকা তিন তিউগা হেকা কারাম ডোর।"

রেণু হাসিয়া উঠিল,—"এ আবার কি রকম কথা?" এর মানে কি?

বাঙালীবাবুদের বাড়ী কাজ করিয়া সুকী নানা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং রৌপ্যবলয় আন্দোলিত করিয়া সে রেণুকাকে বুঝাইতে

প্রবৃত্ত হইল,—"শালবনে রাজাদের ফুলের বাগান আছে। বারটি পাঁচিল দিয়ে বাগান ঘেরা। একজন মেয়েমানুষ সেই ফুল নিতে চাইলো। মরদমানুষ বল্লো নিওনা, নিওনা। কিন্তু ফুল দেখলেই নিতে সাধ হয় কি না, তাই মেয়েমানুষ ফুল তুলে নিল।" বক্তব্য শেষ করিয়া সুকী তুলনামূলক সমালোচনা করিল বেপরোয়া ভাবে—"আমরা মেয়েমানুষ হচ্ছি মরদমানুষের কাছে ফুলের সমান।"

কিন্তু প্রাচীর তোমাদের নাই। সাঁওতালী-প্রেমে শ্রীক্ষেত্র নিত্য বিরাজমান। বাছবিচার নাই, বন্ধনের অবকাশ নাই। সমস্ত দিন কাজ, সন্ধ্যার পর হাঁড়িয়া, মাদল আর প্রেম। জীবনের পরম সত্য তোমরা জানিয়াছ—রেণু মনে মনে বলিল। যাহা হাতে পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করো—

"Strech forth your open hands and while ye live
Take away all the gifts that death and life may give."

মরিসের কবিতার দুইটি পংক্তি অজানিতে কে যেন রেণুর কানে কানে তুলিয়া দিল।

"বোনদিদি, বাংলা গীত শুনবে? উ আমি জানি।

আসবে বলে দূত পাঠালে
শুধু শুধু রাত জাগালে,
এবার বঁধু ঠিক সময়ে আস্‌বে তুমি, ফুলকুমারী।"

"এ গান কোথা থেকে শিখলে সুকী?"

সুকী সগর্বে উত্তর দিল পাহাড়ের উপর তাহাদের গ্রামের 'মাস্টার' এই গীত বাঁধিয়াছে। সে 'মেট্রিক' পাশ এবং বড় কবি।

সাঁওতাল বাংলা গান লেখে এবং মেট্রিক পাশ স্কুলমাস্টার শুনিয়া রেণু কৌতূহলী-চিত্তে সুকীকে সাগ্রহ প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল যে মাস্টার জাতিতে সাঁওতাল হইলেও শৈশবে ক্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। মিশনারী ইস্কুলে সে শিক্ষকতা করে এবং গান বাঁধে। এই পথ দিয়া সে প্রতি হাটবারে হাটে যায়। আজও যখন বোনদিদি এখানে বেড়াইতেছিল সে গিয়াছে।

"আরও একটি গীত শুনবে, বোনদিদি? মাস্টার বেঁধেছে? উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সুকী উচ্চকণ্ঠে গাহিল—

"শালের বনে হাওয়া লাগে"—

দ্বিতল হইতে রুক্ষ, ভারী গলায় আদেশের ভাবে আহ্বান আসিল

"রেণু!" রেণুর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরিয়া জবরদস্ত রায়সাহেব পিতার কণ্ঠস্বর। সারাজীবন তিনি রেণুকে শাসন করিয়া আসিতেছেন। ভদ্রবাটীর মান সম্ভ্রম ও কুমারী কন্যার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আশ্চর্যভাবে সীমানিবদ্ধ।

সুধী জিভ কাটিয়া বিরত হইল। রেণু বিষণ্ণ সঙ্কুচিতচিত্তে উপরে উঠিয়া গেল।

"ঝি-চাকরের সঙ্গে সখীত্ব না করলে কি তোমাদের চলে না? ভদ্রঘরের মেয়েরা কেউ করে নাকি?" বাতদুষ্ট পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে রায়সাহেব কন্যাকে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিলেন,—"যাও, গরমজলের বোতলটা নিয়ে এসো।"

বাতব্যাধি রেণুদের বংশগত রোগ।

* * * *

"ইন্দ্র, এই অসুখটা যে এত কষ্ট দেয় কে জানতো আগে? বংশের ভাল কিছু পেলাম না, মন্দটাই পাচ্ছি। রেখা গেল কোথায়? ফ্ল্যানেল্‌টা দিয়ে যাক্।" রেণুকা দেবী বিরক্তি-জড়িতকণ্ঠে বলিলেন।

ফ্ল্যানেল-খণ্ড আমি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু রেখাকে একবার দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

সে আসিল, যেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার অন্তরের অন্তস্থলে সে প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি করিয়া আসিল।

"দিদি, ডাকছো?"

"রেখা, ফ্ল্যানেলটা—" ফ্ল্যানেল পাওয়া গেল। রেণুকা দেবী বলিলেন, "চা-টা এনে ইন্দ্রকে দাও রেখা। ডাক্তার মানুষ, সারাদিন পরিশ্রম করে।"

রেখা চলিয়া গেলে আমার দিকে চিন্তিত দৃষ্টি হানিয়া রেণুকা দেবী বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছ বুঝেছি। রেখারো বয়স হয়েছে। কিন্তু, আমার অসুখ একটু ভাল না হলে তোমাদের কি করে বিয়ে দেব, বলো? মা তো ওর জন্মের সঙ্গে মারা যান, আমিই ওকে মানুষ করি। অবশ্য বিধবা হবার পর থেকে পিসীমাও আমাদের বাড়ী আছেন। বাবা মরবার সময়ে আমারি হাতে তুলে দিয়েছেন ওকে। আরতো আমাদের ভাই বোন নেই, সর্বদা একসঙ্গে থেকে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ও চলে

গেলে আমার মুখে জল দেবার লোক থাকবে না। টাকায় কি সেবাযত্ন মেলে? আমার অসুখ ভাল না হ'লে রেখাও বিয়ে করতে চাচ্ছে না।"

চমৎকার! যেমন তুমি, রেণুকা দেবী, তোমার পিতার সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলে, তেমনি আজ রেখাও আত্মত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু এ-আত্মত্যাগ স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়া—উভয় ক্ষেত্রেই।

রেণুকা দেবী, আজো দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, আজো চন্দ্রের প্রভা তোমার অলক স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু, আজ তোমার দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র-আবরণ, তোমার কেশে রৌপ্যঝলক। সময়কে বহিয়া যাইতে দিতে নাই। নিজে যাহা উপভোগ করিতে পারিতেছ না, কেন রেখাকে তাহা করিতে দিতেছ না? প্রেতের আবির্ভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছি। মৃত রায়সাহেবের আত্মা তোমার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

রেখা তোমার ভগিনী। সকলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা তুমি ও তোমার পিতা তাহাকে দাও নাই। তাহাকে তোমার পিতা উপদেশ ও তুমি উদাহরণ দিয়া শিখাইয়াছ লতার মত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পদদলিত হইয়া থাকা। শিক্ষা দিয়াছ কন্যার কর্তব্য নিজের সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়া অন্যায় দাবী মিটাইয়া যাওয়া। সেই কর্তব্য করিতে গিয়াছিলে কাব্যপিপাসু, কোমল নারীর মন লইয়া, যে মনের বিশেষত্ব প্রেমপাত্রের অনন্যচিত্ত অন্বেষণ। তাই অবশেষে যাহা তুমি করিয়াছিলে, রেণুকা দেবী, তাহা সবিশেষ জানিলে সমস্ত শিক্ষিত সমাজ শিহরিয়া উঠিবে। তোমার চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ আত্মীয়রূপে একমাত্র আমি তাহা জানিয়াছি। তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি তোমার সর্বপ্রকার আধিঃ ও ব্যাধি নির্মূল করিতে পারিব।

* * * *

অদ্য পূর্ণিমা। পাহাড়ী প্রদেশের জ্যোৎস্না যেন মনে অহেতুক বন্যতা আনিয়া দেয়। যে-কথা, যে-চিন্তা অন্তরের কোণে অগোচরে থাকে তাহাকে টানিয়া বাহির করে।

আজ রেণুকার পিসীমার সহিত রায়সাহেবের বচসা হইয়া গিয়াছে একপালা। বিতর্ক রেণুর বিবাহ সম্পর্কীয়। রায়সাহেব ভগ্নির অনুযোগে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়াছিলেন,—"আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না?

মেয়ের কপালে জুটলো না? টাকাকড়ি তো সবি ওর নামে আলাদা করে রেখেছি, বিয়ে না হলেও ভবিষ্যতে ওকে কখনই কষ্ট পেতে হবে না।"

সন্তানহীনা বিধবা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'টাকা নিয়ে মেয়েরা কখনো সুখে থাকে না। একটু চেষ্টা না করলে হিন্দুঘরের মেয়ের কি আপনা থেকে বিয়ে হয়?"

"না হোক, আমি লোকের বাড়ী 'দয়া করো, দয়া করো' বলে সেধে পাত্র খুঁজতে যেতে পারবো না এ বয়সে। একি তোমাদের যুগের গৌরী-দান যে খুঁজে ধরে আনতে হবে? হবার হলে পাত্র আপনি আস্‌তো। ও না হয় বিয়ে না-ই করে থাকবে, ক্ষতি কি?"

"কারুর সঙ্গে কি তুমি ওকে মিশতে দাও দাদা, যে পাত্র আপনি আস্‌বে? এসেও ছিল তো একবার।"

রায়সাহেব প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া ধমক দিলেন,—"ও:, সেতো একটা লোফার। ওর হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে মেয়েকে গলায় দড়ি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল। এদিকে আমার এই অবস্থা, এখন তোমাদের হয়েছে বিয়ের সখ! দুদিন সবুর করো মরবার বেশী দেরী নেই আর।"

সুতরাং আর আলোচনা হয় নাই।

আসিয়াছিল। তাহারো বত্রিশ বৎসরের জীবনে প্রেম না আসিলেও প্রার্থী একজন আসিয়াছিল। কিন্তু প্রবল পিতৃশাসনের ভয়ে রেণু তাহার প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। পিসীমার দূর সম্পর্কে শশুরালয়ের আত্মীয়। দুই চারিবার অন্দরে যাতায়াত করিবার ফলে রেণুর বিশীর্ণ পুষ্পের মত ক্লান্ত মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সওদাগরী অফিসের কেরাণী সে, রায়সাহেব গ্র্যাজুয়েট কন্যার উপযুক্ত তাহাকে বিবেচনা করেন নাই। সেই শেষ।

কেন অহেতুক বন্যতা? কেন দেহ ব্যাকুল? রেণু তো অসুস্থ পিতার সেবা ও সর্বতোভাবে আজ্ঞাপালন একমাত্র কর্তব্য বলিয়া জানিয়াছে। মাতৃহীন রেখার ভারও তাহারি উপরে। বর্ণবিহীন জীবন তাহার, নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রা। তবু, আজ নিরালা রাত্রে, দক্ষিণা বাতাসে, মত্ত শাল-পুষ্প-সৌরভে মনে হয় পুরুষের চুম্বন কেমন!

সুফী আজ গান গাহিয়াছিল—"বাহা মা লাক্ লাক্।" ফুল তো লোকে লইতেই চাহিবে।

"Take away all the gifts that Death and Life may give"
কিন্তু, বিশ্বব্যাপী পুষ্পচয়ন উৎসবে সে-ই বা কেন বাদ যাইবে ?

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে একটি পুরুষমূর্তি দেখা গেল বৈদেশিক-বেশে, ট্রাউজার ও অর্ধমলিন হাফশার্টে। রেণুদের গৃহসন্নিকটস্থ আমগাছের নীচে দাঁড়াইয়া সেই মূর্তি অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরেই সুকী বাহির হইয়া আসিল এবং উভয়ের সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে রেণুর সম্মুখ দিয়া সেই অচেনা পুরুষটি চলিয়া গেল। বিহ্বল চন্দ্রালোকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত একবার মাত্র রেণুর ভীরু কটাক্ষ মিলিত হইল।

শক্তি যদি পৌরুষের পরিচয় হয়, অপরিমিত স্বাস্থ্যসম্ভার যদি সৌন্দর্যের মাপকাঠি বলা যাইতে পারে যৌবনের, পুরুষত্বের, রূপের প্রকৃষ্ট বিকাশ সেইদিন বন্য পার্বত্যদেশে রেণু দেখিয়াছিল। প্রস্তর-মূর্তির নিখুঁত ভাস্কর্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার গঠিত, সবল প্রতি পদক্ষেপে জীবনের অদম্য প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে। ক্ষীণ কটির ঊর্ধ্বে প্রশস্তবক্ষ সহস্রনারীর চরম আশ্রয়স্থল। বঙ্কিম অধরে বাসনার নিষ্ঠুর মাদকতা। কিন্তু, গাত্রবর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

সুকী রেণুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রবেশী যুবককে অশিক্ষিতা সাঁওতাল দাসীর সহিত কথা বলিতে দেখিয়া রেণু বিস্মিত হইয়াছিল। সুকীকে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোকটি কে সুকী ?"

"ওইতো মাস্টার।"

সাঁওতাল! অনার্য ! কিন্তু—কী রূপবান!

আবার সহসা যেন কানের কাছে বাজিয়া উঠিল :—

> "—While ye live
> Take away all the gift...
> Take away all the...
> Take away..."

* * * *

"ওই রূপ দেখে ভুলেছিলাম ইন্দ্র"—ক্লিষ্টস্বরে ক্ষীণালোকিত গৃহে রেণুকা দেবী বলিয়া চলিলেন—"নিজের মুখে নিজের লজ্জার কথা বলি তোমাকে। তুমি ভুল বুঝো না। এসব কথা আমার মনে বোঝার মত জমে আছে।"

জানি রেণুকা দেবী, বোঝা কোন না কোন স্থানে অপসারিত না করিলে চলার গতি ব্যাহত হয়। কিন্তু, যখন বোঝা বহুবার নামানো হইয়া গিয়াছে

তখন বারে বারে এ প্রয়াস কেন? পুনরাবৃত্তি শুধু অপরাধ স্খালনের জন্য নহে। বঞ্চিত চিত্তের প্রবৃত্তি নিবারণের এ উপায় তুমি বাহির করিয়াছ। তোমার যৌবন-অপরাধের আলোচনায় তোমার পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবন প্রেমের ও কামনার ক্ষীণ আভাস খুঁজিয়া পায়। তাই রেণুকা দেবী, তোমার বয়োকনিষ্ঠ স্নেহপাত্র হইয়াও আমি তোমার এ মানস-বিলাসে প্রশ্রয় দেই। কারণ, আমি যে তোমার চিকিৎসক।

রেখার সযত্ননির্মিত চায়ের পাত্র মুখে ধরিয়া ছায়াসঙ্কুল অর্ধ-আলোকিত রোগগৃহে বসিয়া চিরকুমারীর বিকৃত প্রলাপ আমায় শুনিয়া যাইতে হইতেছে—যখন বাহিরে পৃথিবী অপরূপ শোভা ধরিয়া পথ চাহিয়া আছে, আর তাহারই সহিত পথ চাহিয়া আছে রেখা। কিন্তু শুনিয়াছি প্রেমের জন্য ইহা অপেক্ষাও অনেক কঠিন ত্যাগ অনেক পুরুষ করিয়াছে। সুতরাং তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনি। তুমি বলিয়া যাও অখ্যাত প্রদেশের এক অনার্যের হতাশ প্রেমকাহিনী, মানসিক বিতৃষ্ণার নিকট দৈহিক আকর্ষণের চরম পরাজয়। তুমি বলিয়া যাও সেই অনার্যের দেহসৌষ্ঠব, তাহার আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ—শিক্ষা ও সংস্কারের কঠিন পরিমণ্ডলকে যাহা মোমের মত দ্রবতায় গলিত করিয়াছিল।

*　　*　　*　　*

রেণুর হাতে সুকী একখানা খামে মোড়া চিঠি আনিয়া দিয়া হাসিয়া পলায়ন করিল। বসিবার ঘরে বেতের চেয়ারে হাতের বোনাটা রাখিয়া রেণুকা পত্রখানি খুলিয়া প্রেরকের নাম দেখিতে গেল। তাহাকে পত্র লিখিবার কেহ এখানে নাই।

অভাবনীয় পত্র পাঠ করিয়া রেণু কম্পিতহস্তে সীবনকার্যের বেতের বাক্সটির মধ্যে চিঠিখানা লুকাইয়া রাখিয়া অত্যন্ত মনোযোগের ভানে বোনাটা আবার তুলিয়া লইল। বাহিরে কাহার যেন পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল। যদি তাহার পিতা কোনক্রমে এ পত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারেন তাহা হইলে চিরদিনের মত তিনি রেণুরই উপরে দোষারোপ করিবেন নিঃসন্দেহে। অর্ধশিক্ষিত সাঁওতাল যুবক ভদ্রঘরের শিক্ষিতা, বয়স্থা কুমারীর নিকটে বিনা প্রশ্রয়ে প্রেমপত্র পাঠাইবার সাহস পায় কোথা হইতে?

নিদারুণ লজ্জায় রেণুর কুঞ্চিত অলকাবৃত বিবর্ণ ললাট অণুরঞ্জিত হইল। এই তাহার জীবনে প্রথম প্রেমপত্র! কিন্তু পাত্র অশিক্ষিত, হীন সাঁওতাল।

বিতৃষ্ণায় রেণুর অন্তর আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। কি স্পর্ধা তাহার? রেণুকে সে দূর হইতে দেখিয়া ভালবাসিয়াছে। তাহার রচিত গান রেণু শুনিয়াছে তাহাতে সে ধন্য। তাহার আরো গান আছে। রেণু যদি তাহাকে অনুমতি দেয় তাহা হইলে সে রেণুর সহিত দেখা করিয়া তাহাকে গান শুনাইতে চায়।

পরিষ্কার হস্তাক্ষর, বর্ণাশুদ্ধি নাই। সাঁওতাল এত ভাল বাংলা জানিল কোথা হইতে? মনে পড়িয়া গেল সুকী যে পরিচয় দিয়াছিল…মিশন স্কুলের শিক্ষক—প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ…ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী কবি।

রেণুকে সে ভালবাসিয়াছে। এই রক্তধূলি-মণ্ডিত শালাকীর্ণ বন্য প্রদেশে, গুলঞ্চ বৃক্ষের ছায়ায়, পাহাড়ী ঝর্ণার পার্শ্বে শুষ্ক বিগত-যৌবনা চিরকুমারীর জন্য এই প্রেম সঞ্চিত ছিল! অলক্ষিতে মধু সংগ্রহ হইয়াছে—ভ্রমরা, তুমি এসো!

ভ্রমরা, তুমি এসো। জীবন অপেক্ষাও চঞ্চল যৌবন। শেষ হইয়াছে, কিন্তু এখনো ক্ষীণ রেশ তাহার তোমাকে বসন্ত রজনীতে, বর্ষাদিনে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এখনো সামান্য সময় আছে, তাহার পর আর থাকিবে না।

"We have short time to stay,—
We have as short a spring"—

কানের কাছে বিদেশী কবির করুণ বিলাপ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে সাঁওতাল, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার বর্ণ নিকষকৃষ্ণ, তোমার মলিনগৌর, তাহাতে প্রভেদ হয় না। যৌবন যৌবনকে ডাকিলে আর্য-রক্তও অনার্য আহ্বানে সমান উদ্বেল হইয়া উঠে। যদি দেহের বন্দনা করিতে চাও—চশমালাঞ্ছিত নয়ন ও সূক্ষ্ম বসনাবৃত ক্ষীণদেহ অপেক্ষা অশিক্ষিত হীনজাতির সবল দেহগরিমা কি অধিক ঈপ্সিত নহে?

* * * *

"ইন্দ্র, ভাল করে ব্যাপারটা ভেবে দেখ। আমার তখন যথেষ্ট বেশী বয়েস হয়ে গেছে! সম্মুখেও অন্ধকার ভবিষ্যৎ। একটা মরিয়াভাব এসে গেল। অত সুন্দর ছিল সে দেখতে! বাবাকে তো ভয়েই কিছু বলতে পারলাম না। বাবা তখন একটু সুস্থ ছিলেন। ওখানে সাহিত্যসভার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, প্রায় বাড়ী থাকতেন না! ঝরণার ধারে আমি বিকেলবেলা বেড়াতে যেতাম। ওইখানেই দেখা হোত"।—

—"ইন্দ্র, তুমি বোধহয় আমাকে ঘৃণা করছো। গোড়ায় আমি গিয়েছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে। সাঁওতাল সে আমাকে চিঠি পাঠাতে সাহস করেছিল, তাই মনে কৌতুহল হোল। ভাবলাম একবার চোখে দেখে নিষেধ করে আসবো। কিন্তু হাতে করে অনেক কবিতা এনেছিল, পড়ে শোনাতে চাইল। না বলতে পারলাম না। জানতো আমি কি রকম কবিতা ভালবাসি।" জানি। জানি তুমি কবিতা ভালবাস, সেই কবিতা ছন্দে-সুরে গাঁথিয়া তোমার অনার্য প্রেমিক তোমাকে শুনাইত। অন্যের উদ্দেশে রচিত তৃতীয় ব্যক্তির যে-সব কাব্য-সংগ্রহ পাঠ করিয়া তুমি মুগ্ধ হইতে, সেইরূপ কাব্য তোমাকে উদ্দেশ করিয়া সে রচনা করিয়াছিল। কবিতার মধ্য দিয়া প্রেম-নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পার নাই। হীনবর্ণ পুরুষের প্রেমপ্রকাশে তোমার শিক্ষাসংস্কারযুক্ত যে চিত্তের একপার্শ্ব বিতৃষ্ণায় বিমুখী হইয়া উঠিত, সেই চিত্তেরি অন্যপার্শ্ব সুরের আহ্বানে অহরহ স্পন্দিত হইত। অসভ্যজাতির সহিত সভ্যজাতির যোগসূত্র আদিম যুগ হইতে আজিও এক।

"ইন্দ্র, নিজের অজ্ঞাতে বহুদূর এগিয়ে গেলাম। কলকাতায় স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি ওখানে তাই হোল। এখনও ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে কি করে অত নীচে আমি নামতে পেরেছিলাম! কী শাসনের মধ্যে অতি ভদ্রভাবে বাবা আমাকে মানুষ করেছিলেন। তা তো বলেছি।"

রেণুকা দেবী, অতি-ভদ্রতা ও অতি-শাসনে তোমার সকল সত্তা শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রেমবিহীন যৌবনের প্রান্তে উপনীত হইলে যে হতাশা, যে বন্ধনহীন দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় তাহাই তোমাকে সমাজ-সংস্কারের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া অনার্যের বাহুপাশে আনিয়াছিল। অতি-মুক্ত লতার মত কোমল ছিল তোমার আশ্রয়প্রার্থী নারীচরিত্র। প্রতিরোধের ক্ষমতা তুমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলে।

"ইন্দ্র, তুমি তো সমস্ত বোঝো। কী রকম যেন হয়ে গেলাম। ধরা পড়বার ভয়, ঘৃণা এ সমস্ত যেন আমাকে আরো ওইদিকে ঠেলে দিত। ব্যবহার, কথাবার্তা কিছুই তার সাঁওতালের মত নয়। আর দেখতে বড় সুন্দর ছিল। যতক্ষণ সামনে থাকতো ততক্ষণ কোন দ্বিধাই আসতো না। পরে মনে ভেবে দেখলে একটা বিতৃষ্ণা হোত, কিন্তু আবার কাছে আসলেই সেটা মিলিয়ে যেত। ইন্দ্র, কি বলবো? তুমি বুঝে নিও।"

আমি বুঝিয়াছি। আরো বুঝিয়াছি আজ এ লজ্জার মধ্যে তোমার

কতখানি গৌরব আছে। একদিন যৌবনের আহ্বানে, প্রেমের আহ্বানে তুমি অসংকোচে দ্বিধা-ভীরুতা পদদলিত করিয়া সাড়া দিয়াছিলে। তোমার এই বাতব্যাধিপীড়িত, গলিত, শিথিল দেহের প্রতিটি অংশ একদিন একজন ভালবাসিয়াছিল। হে আজন্মকুমারী প্রৌঢ়া, আজ সে-স্মরণ তোমাকে পুলক দিতেছে। রেণুকা দেবী, তোমার কলঙ্ক সেদিন ছিল না, তোমার কলঙ্ক আজ এইখানে।

* * *

দুইদিন হইল রায়সাহেব অসুস্থ হইয়া বিরক্তচিত্তে দিবা অতিবাহন করিতেছেন। সাহিত্য-সভার উদ্যোগপর্বে তাঁহার সর্দারী ক্ষান্ত পড়ার ক্রোধ তিনি অনেকটা কন্যার উপর দিয়া ছাড়িতেছেন।

দুইদিন রেণু ঝরণার ধারে যায় নাই। অবশ্য ইচ্ছাও তাহার ছিল না, পিতার অসুস্থতা একটি অজুহাত মাত্র। কিছুদিন পূর্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছে, তাহার ক্রিয়ায় রেণু অবসন্ন। আজ মুক্তি তাহার একমাত্র কাম্য। মোহের শেষ পর্যায় পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, অজানার ইঙ্গিত আর কিছু নাই!

প্রতিটি দিন তোমাকে যে লক্ষ্যে অগ্রসর করাইতেছিল, যে লক্ষ্যে উপনীত হইবার অন্ধ বাসনা তোমাকে অহরহ শান্তিহীন করিয়া তুলিল সেই লক্ষ্যস্থলে আসিয়া আজ তোমার সমস্ত বাসনা ও প্রেমের মৃত্যু হইল! প্রেমে যে চরমতার প্রত্যাশা নিজের অজ্ঞাতসারেও শৈশব হইতে করিয়া আসিতেছিলে তাহার প্রাপ্তিতে এত বিতৃষ্ণা কেন? নারী, তুমি আজো জান না তুমি কি চাও।

আজ যাইতে হইবে। সে হয়তো অসহিষ্ণু হইয়া একটা অসঙ্গত কিছু করিতে পারে। তাহাকে অসহিষ্ণু হইতে দিবার সাহস রেণুর আজ নাই। রেণুর মানসম্ভ্রম সমস্ত তাহার প্রণয়ীর নীরবতার উপর নির্ভর করিতেছে।

"আসতে পারোনি, তাতে কি হয়েছে? বাবার অসুখ, আমি না হয় দেখতে যাব।" মুখের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া সাঁওতাল যুবক রেণুর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিল। তাহার সমস্ত মুখে দ্বিধাহীন সারল্য, যাহা একমাত্র অনার্য জাতিতেই সম্ভব। স্বপ্নময় চক্ষু দুইটিতে তাহার একান্ত নির্ভরশীল প্রেম।

স্পর্শের সহিত রেণুর দেহ বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে

অনিচ্ছার ভার দমন করিয়া রেণু সবেগে প্রতিবাদ করিল, "সর্বনাশ! বাবার সঙ্গে দেখা করতে কখনো যেও না"

সে হাসিল, অতি সুগঠিত শুভ্রদন্ত অস্তসূর্যের আলোতে হীরক দীপ্তিতে ঝলকিয়া গেল,—"রাগ করবেন তো? তাতে কি হয়েছে? একদিন তো বলতেই হবে।"

রেণু নীরব হইয়া রহিল। সে আশা করিয়াছে রেণু তাহাকে বিবাহ করিবে। যাহাকে অকাতরে নিজের দেহ ও প্রেম দান করা চলে, তাহাকেই যে পাণিদান করা যায় না, অসভ্য যুবক তাহা জানে না। ড্রইংরুম-বিলাসী যে কোন সভ্য পুরুষকে যে কথা রেণু অসঙ্কোচে বলিতে পারিত, আজ সেই কথা কবিতার-ভাষায় তাহার মনে আসিলেও মুখে আসিল না—

"Thou lovest ; but ne'er knew love's sad satiety."

আবার পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের আরাম-কেদারায় রায়সাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহার পায়ের কাছে রেণু পদসেবা করিতেছে। রেখা ও পিসীমাও উপস্থিত। আর কয়েক দিন পরেই তাঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া যাইবেন। সাহিত্য-সভা শেষ হইয়াছে, রায়সাহেবের প্রবাস-যাপনের উৎসাহও শেষ হইয়াছে।

যত ব্যস্ততা প্রয়োজনতাহার দ্বিগুণ ব্যস্ততায় এই বিগত সপ্তাহ ধরিয়া রেণু সংসার গুটাইয়া বাঁধিয়াছে। এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিলে সে মুক্তি পায়। অশুচি স্পর্শের ন্যায় অবাঞ্ছিত স্মৃতি তাহাকে চিরদিন গ্লানি দিবে সত্য; কিন্তু তাহা স্মৃতি মাত্র হইয়া থাকিবে ভীতিপ্রদ বাস্তবের রূপ ধরিয়া অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষায় তাহার বিমুখী দেহ-মনের নিকটে করপ্রসারণ করিবে না। রেণু অবশ্য এ কয়েকদিন ঝর্ণার ধারে যাইবার অবকাশ পায় নাই। কল্য দেখা যাইবে।

কিন্তু, আজো উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে পুরুষমূর্তি দেখা গেল, দূর হইতে আসিয়া রেণুদের বাড়ীর হাতায় সে প্রবেশ করিল। আজো পূর্ণ চন্দ্রালোকে গ্রীক-ভাস্কর্যের আদর্শ দেহ, তীক্ষ্ণ নয়ন, কোমল অধরোষ্ঠ পৌরুষ সৌন্দর্যে প্রতীয়মান হইল। যৌবনের ডাক, প্রেমের ডাক পূর্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অনার্য-প্রেমিকের অশান্ত রক্তধারাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া গৃহছাড়া করিয়াছে। এক সপ্তাহের অদর্শনে সে ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রিয়ার কাছে আসিয়াছে, সরল বিশ্বাসে তাহাকে দাবী করিতে।

রায়সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোষনেত্রে চাহিলেন। অনাত্মীয় যুবক অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার পারিবারিক সম্মেলনে যেন যোগদান করিতে আসিতেছে।
—"কে ? কাকে চাও তুমি ?"

সে হাসিল...সেই মনোহর আশ্চর্য হাসি, যাহা রেণুকে উন্মাদ করিয়া তাহার অত নিকটে টানিয়া লইয়াছিল। তাহার সাদর অভ্যর্থনায় যেন কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না এমনিভাবে সে বলিল, "আমি রেণুর কাছে এসেছি।"

"কী ?"—তীরবেগে বাতব্যাধি ভুলিয়া রায়সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"রেণু !"

রেণুর ভীতিস্তম্ভিত, ব্যাকুল দৃষ্টি একবার তাহার দিকে মিনতির আবেদনে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্তে পিতার উগ্র মূর্তির দিকে চাহিয়া রেণু স্পষ্ট উত্তর দিল, "ওকে আমি চিনি না।"

* * *

"তারপর ?"—রেণুকা দেবীর আরো একটু নিকটে সরিয়া আসিলাম। না চাহিয়াও বুঝিলাম নয়নপল্লবে তাঁহার অশ্রুর আবির্ভাব।

"তারপর, আর বোলোনা ইন্দ্র। দু'একবার সে বলতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে। কিন্তু বাবা তখন ক্ষেপে গেছেন। আমাদের দারোয়ান আর দুজন চাকর তাকে বাবার হুকুমে ধরে বেঁধে ফেল্লো। তারপর আমাদের সরিয়ে দিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা হোল। সুকী ব্যাপার দেখেই পালিয়ে গিয়েছিল। অত মার দেবার পরেও বাবা তৃপ্ত হলেন না। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর বাবার বন্ধু, তাঁকে চিঠি লিখে ট্রেস্‌পাসের অজুহাতে থানায় চালান দিলেন। ছ'মাসের জেল হোলো।'

একবার শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিছু বল্লেন না ?" মৃত পিতাকে স্মরণ করিয়া আজিও রেণুকা দেবী শিহরিয়া উঠিলেন,—"সর্বনাশ! বাবা তাহ'লে আমাকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ও-ও কিন্তু আর কিছু বল্লোনা। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করলো।"

চিন্তা করিয়া বলিলাম, "বোঝা যাচ্ছে সাঁওতাল হলেও সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে ওর সহজ-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। যেখানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বরঞ্চ লোকসান, সেখানে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের রীতি।"

রেণুকা দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শায়িত হইলেন,—"আমার মনে হয় নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে ঘৃণায় সে চুপ করে ছিল। ইন্দ্র, মহাপাপ করেছি। এর প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হবে?"

প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। যুগ যুগ ধরিয়া এমনি ঘটিতেছে। পবিত্র আর্যশোণিতের জয়যাত্রায় বহু অনার্য রক্তধারা নীরবে বহিয়া গিয়াছে। বহু নারীর পদ-প্রসাধনের নিমিত্ত বহু পুরুষের হৃদয়রক্ত উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এসব কথা ভুলিয়া থাকাই মঙ্গল। সুতরাং, হে রেণুকা দেবী, তুমিও ভুলিয়া যাও।

কিড্

খট্‌খট্-খটাস্। চাহিয়া দেখিলাম আমাদের পাশের বাড়ীর কিড্-সিষ্টার উচ্চহিলের পাদুকার সহিত আদুরে শিশুসুলভ ভঙ্গিমার সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। কোথা হইতে বা চরাবরা করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিবার মুখে শ্রীমতী এণাক্ষী রায়ের আমারই চক্ষুর সম্মুখে এই দুর্দশা ঘটিল।

একমুহূর্ত। পরমুহূর্তেই 'কিড্' এই আদরের নামধেয়া এণাক্ষী রায় বিনা সাহায্যেই গাত্রোত্থান করিলেন। গ্রীবা বক্র করিয়া আমার দিকে কোপকটাক্ষ হানিলেন, যেন তাঁহার এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র আমি। তারপরে অত্যন্ত ক্রোধের ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকাইয়া জোরে পা ফেলিয়া সম্পন্ন পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। এখনি পাঁচভাই মাতাপিতা তদারকে ছুটিয়া আসিবেন সন্দেহ নাই।

গরদের পাঞ্জাবিতে বাস হইতে নামিবার সময়ে একটি খোঁচা লাগিয়াছিল। বিরক্তভাবে ছোটবোন মল্লিকার শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ড্রেসিংটেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মল্লিকা দুই হাতে মুখে কি একটা স্নেহ-পদার্থ মালিশ করিতেছে, চারিপাশে অন্ততঃ তিরিশটা নানা আকারের ও রংয়ের শিশি ও কৌটা।

"কি যে যখন-তখন ঝপ্ করে সাড়া না দিয়ে এসে পড়, ছোড়দা!" মল্লিকার বেশবাস কিছু শিথিল ছিল।

চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, "নেঃনেঃ। মুখের পেছনে এত সময় আর পয়সা খরচ করিস্ কিন্তু দিনের দিন তো অবনতিই দেখছি।" মল্লিকা ক্ষেপিয়া উঠিল, "হ্যাঁ খরচ করি আমি! এ সব তো দিদির আর মিনতির। এই কৌটো দুটো মাত্তর আমার। ভারী একেবারে, হাতে টাকা আমার থাকে কি না! মায়ের মুখে তো সব সময় 'নেই নেই' বুলি লেগেই আছে। হ্যাঁ, খরচ করে বটে ও বাড়ীর কিড্। ওর ঘরখানাই দেখবার মত। ঢুকলেই সুগন্ধ পাওয়া যায়।"

আবার কিড্! কিডের পতন মনে পড়িয়া উচ্চহাসি রোধ করিতে পারিলাম না। "ওঃ, আজ তোদের কিড্ যে সার্কাসটাই দেখিয়েছে।"— কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিল,—"বাড়ী ঢুকবার পথে, হা হা, ধেড়ে খুকু একেবারে, হা হা,"—"কি করছ ছোড়দা, আস্তে। পাশের বাড়ীতে শোনা যাবে যে"— মল্লিকার চাপা ভর্ৎসনায় সজাগ হইয়া চাহিলাম। পাশের বাড়ীর জানালায় কমলারংয়ের নেটের পরদার পাশে একটি ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরদা ঈষৎ সরিয়া গেল, একটি কোপকটাক্ষ আমার প্রতি বর্ষিত হইল। পরক্ষণেই কোপকটাক্ষ ভাসিয়া গেল জলে। অনিন্দ্য দুইটি চক্ষু কানায় কানায় জলে ভরিয়া উঠিল, আমার প্রতি একমিনিট সেই অপরূপ চক্ষু দুইটি চাহিয়া রহিল। তারপরে ধীরে ধীরে জানালা বন্ধ হইয়া গেল। মল্লিকা ভীতুস্বরে বলিল, "কি করলে ছোড়দা? কিড্ শুনতে পেয়েছে।"

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছিলাম, মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলাম, "তাই কি করব শুনি? আমি তো ইচ্ছে করে—। তিরিশ বছরের বুড়ো ধাড়ীর সব সময়ে খুকী-খুকী ভাব দেখলে হাসিই পায়।"

"কক্ষনো কিডের বয়স তিরিশ নয়, ওর বড়দাদাই তো ছত্রিশ। পর পর পাঁচ ভাইয়ের পরে কিড্ হয়েছে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। তিরিশ না হয় পঁচিশ তো হয়েছে। এত বয়সে কোন বাঙালী মেয়ের এমন ন্যাকা-ন্যাকা ভাব দেখা যায় না। বিদেশের মেয়েদেরও তো দেখে এলাম, এমনটি আর দেখিনি।"

"কিন্তু ছোড়দা, জানো? কিড্ মেয়েটা বোকা নয়। ওর বাড়ীর লোকেরাই ওকে এমনি কিম্ভূতকিমাকার ভাবে প্রশ্রয় দেয়—"

"যাক্‌গে। কার মেয়ে কে কিম্ভূতকিমাকার করেছে তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? এখন এই পাঞ্জাবিটা দেখ তো—"

কিড্ কিম্ভূতকিমাকার কি অর্থে? বি-এ পাশ করিয়াছে, গান-বাজনা ভাল জানে, দেখিতে সুন্দরী। সম্পন্ন গৃহের আদরিণী কন্যা। সেইখানেই গলদ। অতি আদরে ও যত্নে কিডের মনোবৃত্তি চোদ্দ বছর বয়সে হোঁচট খাইয়া রহিয়াছে। তাহাকে কিড্ নামে ডাকিয়া পরিজনেরা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পূর্ণযৌবনা তরুণীকে শৈশবের কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। ফলে, কিড্ সত্যই অদ্ভুত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই তাহার পঞ্চভ্রাতা ও জনকজননীর তৃপ্তি ও গর্ব।

কিডের সুযোগ্য ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। কিন্তু, উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও বেকার থাকিবার গ্লানিতে, আহ্বান পাইয়াও কখনও তাহাদের বাড়ীতে যাই নাই। ছয় মাস হইল বিদেশ হইতে নামের আগে-পিছে ডিগ্রী লাগাইয়া আসিয়াছি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের মত মহিলা সম্পর্কে অসংযত উক্তি আমারও স্বভাব ছিল। কিন্তু, বিদেশী পালিশ এখনও ওঠে নাই। সুতরাং, গ্লানি হইল। অপরিণতহৃদয়া তরুণীর অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুইটি মনে পড়িতে লাগিল ক্রমাগত। কি ছেলেমানুষ! স্থির করিলাম কোন সুযোগে ক্ষমা চাহিয়া আসিব।

সুযোগ মিলিল। দুই চারিদিন পরেই পিতার বৈঠকখানায় কিডের দুইটি ভ্রাতা দর্শন দিলেন। বাড়ীতে কীর্তন গান হইবে, তাই নিমন্ত্রণ। একটা কাজের সন্ধানে সাহেব সাজিয়া বাটীর বাহির হইতেছিলাম। কিডের ভ্রাতাদের দেখিয়া অন্যদিনের মত পাশ না কাটাইয়া অভিবাদন জানাইলাম। বড় ভাই সাগ্রহে বলিলেন, "ডক্‌টর মুখার্জি, একবার বিকেল বেলা আসবেন কি? একটু কীর্তনগানের ব্যবস্থা হয়েছে। বাবা আপনাদের খবর দিতে পাঠিয়েছেন। আপনার অবশ্য ভাল লাগবে না—"

বাধা দিয়া সাড়ম্বরে জানাইলাম, "বলেন কি? আমি কীর্তন বড় ভালবাসি। ফিরে এসে আর শোনাই হয়নি। নিশ্চয় যাব।"

গানের আসরে কিডের দেখা মিলিল না। আমার পিতা প্রশ্ন করিতে কিডের মা উত্তর দিলেন, "আর বলবেন না। ভাইদের সঙ্গে কি নিয়ে একটু বেধেছে, ঘরে দোর দিয়ে বসেছে। উনি গেছেন মেয়ের মান ভাঙাতে। এত বয়স, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে পাকল না। কি যে জ্বালা হয়েছে আমার!" কিড্-জননীর মুখে কিন্তু তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল, জ্বালার উত্তাপ নহে।

আমার বাবা বলিলেন "সত্যি, একেবারে ছোট বাচ্চার মত মন রয়ে গেছে আপনার মেয়ের। বিয়ে নিয়ে মুস্কিল হবে, কারণ সবাই তো বুঝবে না—"

কিড্-জননী অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বলিলেন, "সেই রকম লোক দেখেই দিতে হ'বে। মেয়ে আমার আমাদের কয়টি প্রাণী ছাড়া জানে না। বিয়ের কথা ওর ভাবতেই পারিনে।"

জ্যেষ্ঠ কিড্-ভ্রাতা হাসিয়া উঠিল, "কিডের বিয়ে? হায়, হায়!"

বিবাহ-ব্যাকুল মাথুর পালার অবসানে কোমল-কাতর চিত্তে বাড়ী ফিরিবার

সময়ে রায়বাড়ীর গেটের কাছে কিডের সহিত দেখা হইল। সে বন্ধুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছে। কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব চিন্তার বিষয়, কারণ এক্ষেত্রে শ্রীমতী বয়সে যুবতী হইলেও মনে শিশু। বক্র কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া কিড্ পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। মরিয়া হইয়া হাতযোড় করিয়া ঈষৎ ঠাট্টার ভাবে বলিলাম, "মাপ করতে হবে।"

কিডের অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, আবদেরে শিশুর কণ্ঠে সে বলিল, "থাক, ঢের হয়েছে। জানেন, আপনি এসেছেন বলেই আমি আজ গানের আসরে যাইনি?"

"আমার অপরাধ?"

"আপনি আমার পড়ে যাওয়া নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে হাসাহাসি করছিলেন, আমি দেখেছি।"

"কি শোনা গেছে জানতে পারি কি?"

"কথা বেশী শুনিনি হাসি শুনেছি।"

রক্ষা পাওয়া গেল। কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিলাম, "হাসি ঠিক ওই বিষয়ে নয়। নিজেও যে আছাড় খেয়েছিলাম!"

"সত্যি?"

"ছেঁড়া পাঞ্জাবি মল্লিকা সেলাই করে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।"

"ইস্! এ কথা আগে জানলে গানের আসরটা মাটি হোত না। আগে বলেন নি কেন?"

এবার সত্যই হাসাইল কিড্। হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি আগে জানতে চেয়েছিলে? তোমাকে 'তুমি'ই বলছি কিন্তু।"

পঞ্চবর্ষীয়ার সারল্য ও সঙ্কোচহীনতায় বিস্ফারিত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া কিড্ বলিল, "সকলে তো আমাকে তুমিই বলে!"

তাহার পর হইতে কিডের সহিত আলাপ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। মল্লিকা ওই দিন ওই সময়ে আমার পাঞ্জাবি রিপু করিয়াছে জানিয়া আমার উপর কিডের অগাধ বিশ্বাস জন্মিল। ভাগ্যচক্রে মল্লিকা নিজেও পাঞ্জাবি ছেঁড়ার ইতিহাস জানিত না।

কিডের বাড়ী দ্বিতীয় দিন প্রবেশের ঘটনা একটু অদ্ভুত। মধ্যে পথে-ঘাটে দেখা-সাক্ষাৎ ও সামান্য কথাবার্তা হইলেও কিডের এই ধরনের আহ্বানের

জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বেয়ারার হাতে চিঠি—"সুবীরদা, এখুনি একবার আসুন—কিড্।"

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্তে বেয়ারা-পরিচালিত হইয়া কিডের ঘরে প্রবেশ করিলাম। পরিবারের প্রায় সব কয়েকটি প্রাণী সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিল না,—সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আমার ডাক পড়িয়াছে। দর্জি কিডের জন্য একটি মূল্যবান ব্রোকেডের জামা সেলাই করিয়া আনিয়াছে। কিডের মতে তাহার একটি হাতা লম্বায় বড়, একটি ছোট হইয়াছে। আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া দিতে হইবে।

হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আমাকে কেন? আমি কি বুঝি?" কিড্-জননী বাৎসল্যের হাসি হাসিলেন,—"আর বাবা বোল না। আমি বলছি, ঠিক আছে। তা মেয়ের কি তক্ক। শেষ হাল ছেড়ে আমি বললাম, পাশের বাড়ীর যে কোন লোককে ডাক, বলে দেবে ঠিক আছে। অমনি পাগ্‌লি সত্যি সত্যি ছুটল। এখন তো মেয়েরা সব কলেজ-স্কুলে। তাই তোমাকেই ডেকেছে।"

জামার হাত দুইটি নিজের হাত দিয়া মাপিতে মাপিতে কিড্ বলিল, "সুধু সেইজন্যে বুঝি? মল্লিকা বলছিল সেদিন, ছোড়দা জামাটা নিজে আমাকে দেখিয়ে সেলাই করাল।' তাহ'লে তো উনি ভাল সেলাই জানেন।"

মধ্যম কিড্-ভ্রাতা হাসিয়া উঠিল,—"দেখছেন তো ডক্টর মুখার্জি, সাধে কি আমরা ওকে কিড্-সিষ্টার বলি?"

বালিগঞ্জের আধুনিক পাড়ায় বাড়ী। উভয় পরিবারে পূর্বেই হৃদ্যতা ছিল। এবারে আমিও সেই চক্রে যোগদান করিলাম। কিডের ভ্রাতাদের বিশেষতঃ তৃতীয় জনের সহিত খানিকটা সৌহার্দ দেখা দিল। ছোট ছোট নানা ঘটনার মধ্য দিয়া কিড্-চরিত্র আমার চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার দিকে কিড্ এ-বাড়ী আসিয়া আমার হাতে একখানি বই দিয়া বলিল, "সেজদা আপনাকে পাঠিয়েছে।"

বইখনি সযত্নে কাগজ ও দড়ি দিয়া মোড়া, সর্বাঙ্গে গালার শিলমোহর। পাশাপাশি বাড়ীতে এভাবে পার্সেল করিয়া পাঠানোর তাৎপর্য বোঝা কঠিন। বিস্মিত হইয়া প্যাকেটটি খুলিলাম। একখানি যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক, কিড্-ভ্রাতার কাছে পড়িতে চাহিয়াছিলাম। কিডের চোখে পড়িবে বলিয়া এই

সাবধানতা! হাসিব কি কাঁদিব স্থির করা কঠিন হইল। পূর্ণবয়স্কা নারীর শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় যে পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা, সেই পুস্তকই কিডের হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে।

বইখানি তুলিয়া কিডের হাতে দিলাম, "পড়বে কিড্?" কৌতূহলে বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কিড্ বলিল, "ওমা, এই বুঝি! সেইজন্যে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে পাঠিয়েছে। ভয় হয়েছে যদি আমি খুলে দেখি, তাই গালার ছাপ। আমার যদি এ বই পড়তে এতই ইচ্ছে হবে তাহ'লে আমার বন্ধুদের কাছ থেকেই তো নিতে পারি। তারা তো সবাই পড়েছে এসব বই।"

"তুমি পড়নি?"

"না, আমাকে বাড়ীতে ছুঁতেই দেয় না। দাদারা সব সময়ে আমার ভয়ে বইয়ের আলমারিতে চাবী দিয়ে রাখে। কোন বই পড়তে হ'লে আগে তাদের দেখিয়ে নিতে হয়।"

"পড়বে এ বই? আমি দিচ্ছি। এখানে বসে পড়।"

চকিতদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কিড্ বলিল, "না, দরকার নেই। আমার ওসব ভাল লাগে না।"

আর একদিন। বালিগঞ্জ প্লেসে এক পরিচিত বাড়ী হইতে দেখা করিয়া ফিরিতেছিলাম। সহসা অভিমান-মিশ্রিত আবদারের কণ্ঠে—যেমন করিয়া একটি কণ্ঠই ডাকিতে পারে—শুনিলাম, "এই সুবীর-দা, দাঁড়ান।"

দেখিলাম, দ্বিতল বাড়ীর বারান্দা হইতে হাত নাড়িয়া আমাদের কিড্ আমাকে ডাকিতেছে। তাহার পার্শ্বে সমবয়স্কা অন্য একটি তরুণী! বুঝিলাম কিড্ বান্ধবী অথবা আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। দরজার কাছে অপেক্ষা করিতে কিড্ ঊর্ধ্বশ্বাসে আলুথালু বেশে নামিয়া আসিল,—"আমি আপনার সঙ্গে বাড়ী ফিরব, চলুন।"

আলাপ হইবার পর হইতে কিড্ কখনও আমাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করে না—প্রত্যেকটি অনুরোধ তাহার অমোঘ আদেশ। বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত হয়ে গেছে। এ সময়ে তোমার বাড়ীর লোকেরা তো তোমাকে একা ছাড়ে না।"

"আমাকে নিতে গাড়ী পাঠাবে। কিন্তু সে এখানে নয়, আমার মামীমার বাড়ী ডোভার লেনে।"

"সে কি?"

"আমাকে তো সেইখানেই পাঠিয়েছিল। গাড়ী নাবিয়ে দিয়ে চলে গেছে, আবার নিতে আসবে। আমার মামীর বাড়ী ভাল লাগল না। আমি বন্ধুর বাড়ী মামীর দারোয়ানকে নিয়ে চলে এলাম। গাড়ী ডোভার লেন থেকে ঘুরে বালিগঞ্জ প্লেসে আসবে। আবার এখানেও না পেয়ে বাড়ী চলে যাবে। কি মজা!"

"ছি, কিড্। পেট্রোল পাওয়া যায় না, অথচ গাড়ীটাকে এত ঘোরাবে?"

"বা রে, আমি কি কঁরব?"—কিডের স্বর আনুনাসিক,—"আঁমাকে জোঁর করে পাঠায় মামীর কাছে। মামীকে আমার ভাঁল লাগে না, ভারি হিংসুটী। কি রকম জানেন—"

তাড়াতাড়ি পরচর্চায় বাধা দিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমার সঙ্গে এলে, হাঁটতে হবে। ট্রাম-বাসের ভিড়ে তোমাকে নিয়ে উঠ্‌তে পারব না, ট্যাক্সির পয়সা নেই।"

"অল্‌রাইট। আমি খু-উ-ব হাঁটতে পারি। অসঙ্কোচে দুই হাতে আমার কোটের আস্তিন চাপিয়া কিড্ চলিতে লাগিল। মাথার উপর পূর্ণিমার চন্দ্র, পথ নির্জন। কিডের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিলাম। বেশভূষায় কিড্ কিন্তু শিশুসুলভ সাদাসিধা নহে। তাহার সযত্ন-অঙ্কিত ভ্রূরেখার মধ্যে কুঙ্কুম-চন্দনের পত্রলেখা, গ্রীবাতে অবলুণ্ঠিত এলোখোঁপায় বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো, হাতে লাল কাল রেশমী চুড়ির শিঞ্জন। বাসন্তী অঞ্চলে, আরক্ত অধরের কোণে নারীচিত্তের চিরন্তন ইঙ্গিত লেখা রহিয়াছে, শিশুর সারল্য নহে।

আদরে প্রশ্ন করিলাম, "ভয় করছে না, কিড্? দাঙ্গা এখন না থাকলেও রাস্তা কি নির্জন, দেখছ তো?

"ও সবে আমার ভয় নেই।"

গলার স্বরে আরও আদর ঢালিয়া বলিলাম, "তাহ'লে তোমার ভয়টা কিসে, কিড্?"

বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল দুইটি চক্ষু বিদ্যুতের শাণিত প্রাখর্যে আমার চোখের উপর ঝলসিয়া উঠিল,—"ভয় আপনাকে।"

সহসা মনে হইল এ কিড্ অন্য মানুষ, হয়তো এতদিনে তাহার যথার্থ পরিচয় পাইতে যাইতেছি। অজানিতে আমার একটি বাহু কিড্‌কে নিবিড় আলিঙ্গনে কাছে টানিতে উদ্যত হইতেছিল। সর্পদষ্টের শিহরণে কিডের

কাঁধের উপর হইতে সেই হাত টানিয়া লইলাম। তাহার আরক্ত অধরোষ্ঠের স্বাদগ্রহণে ব্যগ্র আমার অধরকে নিষ্ঠুর দংশনে নিবৃত্ত করিলাম। মনে হইল, আমার পার্শ্বের এই নারী নিজের উপর এতটুকু কর্তৃত্ব কখনও হারাইতে পারে না। গলা পরিষ্কার করিয়া সহজভাবে বলিতে চেষ্টা করিলাম, "তার মানে ?"

"কি জানি। আচ্ছা সুবীরদা, দেখুন চাঁদটা যেন একটি থালা। স্রেফ ভাত খাবার থালা। কবিরা চাঁদের সঙ্গে ভাত খাবার থালার উপমা দেয় না কেন ? লোকে তো সহজে ধরতে পারে। এমন একখানা ভাত খাবার থালা সবাইকার আছে, নয় কি ?"

নিশ্চিন্ত হইলাম। আমারই ভ্রম। কিড্ কিডই আছে।

বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা সত্য। আমার কপালে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। কিড্ এই নামে অভিহিতা, কুমারী এণাক্ষী রায় সম্পূর্ণভাবেই আমার মনোহরণ করিয়াছেন। আজ আমার শ্লেষ কৌতুক কিছুই নাই, আছে কেবল প্রেম। সাতাশ বৎসরে পুরুষের প্রথম প্রেম প্রেয়সীর মধ্যে কোন অনুপম গুণের সন্ধান পায় নাই। তাহার রূপ অনন্যসাধারণ নহে। নিজে পশার ও চাকুরীবিহীন বেকার ডাক্তার হইলেও তাহার পিতার অর্থে আমার আসক্তি নাই, আমার জন্য অধিকতর ধনী কুমারীরা লালায়িত। তাহার ওই অদ্ভুত অসাধারণ চরিত্রই আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহাকে বুঝি না, তাই অন্ধ আবেগে আরও বেশী ভালবাসি।

কিন্তু, জানাই কি ভাবে ? শিশুর কাছে প্রেম-নিবেদন সহজ কার্য নহে। কিডের দর্পণের মত রেখা লেশহীন ললাট, স্বচ্ছ চক্ষুর অসঙ্কোচ চাহনী দেখিয়া কবির কাব্য মনে উদিত হয়—

"আমার কুসুমকোমল হৃদয় সহেনি কখনও রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি সহেনি কখনও ভ্রমর-ভর।"

মনে হয় এ জগতে কোন ব্যক্তিই তাহাকে প্রেমের দায়িত্ব বহনের ভারে বিন্দুমাত্র ক্লিষ্ট করিতে চাহিবে না। তবে সে ফুল যথাকালে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিজন তাহাকে কাচের বাক্সে লোকস্পর্শের অতীত করিয়া পুষ্পের জীবনে চিরস্থায়ী রাখিতে চান—ফলের পরিণতি তাঁহাদের বা নিজেরও কাম্য নহে। তবু মূঢ় ভ্রমর কাচে পক্ষ প্রতিহত করিয়া ব্যাকুল হয়।

কয়েকদিন উপর্যুপরি কিডের সাক্ষাৎ না পাইয়া কিড্-জননীকে প্রশ্ন করিলাম।

"আর বোল না, বাবা। দাঁতের মাড়িতে খোঁচা লেগে দাঁত মুখ ফুলে উঠেছে ক'দিন হ'লো। ফুলো আছে। এখনও তাই মেয়ে আমার লজ্জায় কারুর সামনে বার হননা। শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকেন।"

ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "অসুখ হয়েছে, আমরা জানি না তো, একবার যেয়ে দেখে আসা দরকার আমার। নইলে বাড়ী গেলেই মল্লিকাটা জ্বালিয়ে খাবে। তার বন্ধু কিনা!"

"তা, যাওনা বাবা, তুমি তো ঘরের ছেলে। ডাক্তার হিসেবেও তোমাকে একবার দেখাবার কথা আমি বলেছিলুম। কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজী হ'ল না। আদিখ্যেতাই বেশী বেশী! তা যাওনা বাবা, ওর ঘর তো চেন তুমি। আমি সঙ্গে গেলেই রাগ করবে মেয়ে। তুমি তো ওর নিজের ভাই বল্লেই হয়! যথার্থ আপন দাদার মত দেখে তোমাকে।"

কথাটা ভাল লাগিল না। কিডের ঘরে প্রবেশ করিলাম সাড়া দিয়া। ক্ষীণ নীল আলো জ্বলিতেছে, খাটের উপর কিড্ শায়িতা।

"ইস, এ ভুতুড়ে আলো জ্বালিয়ে রেখেছো কেন? দাঁড়াও, বড় আলো জ্বালাই।"

"না, জ্বালাবেন না বলছি।"

"কেন শুনি?"

"আমার মুখচোখ ফুলে রয়েছে না?"—

"তাতে কি হয়েছে? আমি কি তোমার চেহারা দেখতে আসি?"

অতিস্পষ্ট লাস্যজড়িত স্বরে উত্তর শুনিলাম, "তবে কি করতে আসেন?"

এক মিনিট নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ইহা কিডের কণ্ঠ নয়। তাহার খাটের উপরে বসিলাম, দুই হাতে টানিয়া তাহাকে বিছানা হইতে তুলিতে তুলিতে বলিলাম, "তুমি জান না, ন্যাকা?"

"আমি কি জানি! ছাড়ুন"—স্বর আদেশের নহে।

পরমুহূর্তে কিড্ সম্পূর্ণভাবে আমার বক্ষে নিবদ্ধা হইল! তাহার ঈষৎ শুষ্ক অধরে আমার অধর প্রথম মিলনের ক্ষণে অনুভব করিল শিশুসুলভ আত্মসমর্পণ নহে, যৌবনের আবেগময় প্রতিদান। পরমুহূর্তেই আমার অধরের একাগ্রতা ব্যাহত হইল অস্ফুট আর্তনাদে।

"কি হ'ল? কি হ'ল?"

"দাঁতে লাগে না ?"—কিডের স্বর আর প্রেমিকার নয়, শিশুর।

সাদা আলোটা জ্বালাইয়া দিলাম। নিজের মুখের স্ফীতি গোপন করিতে কিড্ দুই হাতে মুখকে আবরিত করিল।

তাহার মুখ হইতে হাত জোর করিয়া নামাইয়া ধরিয়া ডাকিলাম—

"এণাক্ষী, শোন। তোমার নাম যেমন কিড্ নয়, তুমিও তেমনি শিশু নও। বাস্তব জগতের দিকে তাকাতে ভয় পেও না। ভালবাসাকে নিতে ভয় পেও না।"

কিড্ ভীতকণ্ঠে অর্ধ-উচ্চারণ করিল, "ভালবাসা!"

"হ্যাঁ। ভালবাসার চোখে তোমার মুখের ওই বিকৃতি কিছুই নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি।"

কিড্ নিরুত্তর রহিল। আমি বলিতে লাগিলাম, "তোমার বাড়ীর লোকেরা তোমাকে শিশু করে রাখতে চান। তোমার মা-বাবার বয়স হয়েছে, আর সন্তান নেই। সুতরাং একটি শিশু সন্তানের মত তোমাকে মানুষ করে তাঁরা নিজেদের অতৃপ্ত বাৎসল্য-লালসা মেটাতে চান। পাঁচ ভাইয়ের কল্পনা-শিশু-ভগিনীমূর্তি—তারা তোমাকে কিড্-সিষ্টার রূপেই চায়, বড় হয়ে তাদের সমকক্ষ একজনের মত নয়। তুমিও এদের হাতে নিজের সত্তা হারিয়েছ। নিজের উপর, তোমাকে যে ভালবাসে তার ওপর অবিচার ক'রো না।"

ক্ষণকালের জন্য কিডের চোখে যেন সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক বিদ্রূপের আভা খেলিয়া গেল। আমি স্থির নিশ্চিত হইবার পূর্বেই চোখ নামাইয়া কিড্ আদুরে ভাবে প্রশ্ন করিল, "বা রে, আমি কি করব ?"

"আমাকে বিয়ে করো। তোমার মা-বাবা তোমাকে কাচের পুতুলের-মত অন্য একটি কাচের পুতুলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাচের প্রাসাদে পাঠিয়ে দেবেন! আমি বেকার, রোজগার একশোর মত। তোমাকে বিয়ে করলে আলাদা থাকতে হবে। একশো টাকায় সংসার চালাতে হ'লে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবে তুমি। বুঝবে নিজের হাতে কাজ করার কত কষ্ট, কত তৃপ্তি। ছোটখাটো আনন্দের মূল্য কত।"

কিড নিজের কিউটেক্স-মার্জিত সুদীর্ঘ নখগুলি নীরবে লক্ষ্য করিতে লাগিল, মনে হইল চিন্তা করিতেছে। তারপর অবুঝের ভঙ্গিতে আধ আধ স্বরে বলিল, "বিয়ে কি করে হবে ? আমি কায়স্থ আপনি ব্রাহ্মণ।" ক্ষণপূর্বের চিন্তিত মুখের সহিত এ স্বরের কোন সামঞ্জস্যই নাই।

আর সহ্য হইল না, তাহার হাতে সবলে ঝাঁকুনির সহিত ধমক দিলাম, "ছেলেমি কোর না।"

পলকে প্রলয়ের মেঘের মত কিডের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষে অশনির বিদ্যুৎসূচনা দেখা দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিড্ চিরাভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফিরিয়া আসিল,—"আঃ, হাত ধরে ঝাঁকাবেন না। আমার হাতে লাগে না বুঝি? যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো না।" কিড্ ঘর হইতে নিমেষে বাহির হইয়া গেল। শূন্য ঘরে নির্বোধের মত আমি বসিয়া রহিলাম একা।

আমার ও কিডের পরিচয়-পরিধিতে অনুরূপ ঘটনার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। বহুবার ভালবাসার জালে জড়াইয়া অগাধ জলের রোহিতকে টানিয়া সাধারণ মানুষের ডাঙায় তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিবারই পিচ্ছিল মৎস্য সহজ মসৃণতায় আমার হস্তচ্যুত হইয়া গভীর জলের অবোধ্যতায় ফিরিয়া গিয়াছে।

* * * *

এ আখ্যায়িকার শেষ জানি আমি। আমার নাম মল্লিকা। আর, আমার নির্বোধ দাদা যাহা জানে না, তাহাও জানি।

আজ আমার ছোড়দা অখ্যাত নহে, আজ সে কর্ণেল সুধীর মুখার্জী সি—আই—ই। আজ অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার সমকক্ষ বাংলাদেশে কেহই নাই। কিন্তু আজও সে অকৃতদার। এণাক্ষী রায়ের আশায় নহে—কারণ বিরাট ধনীগৃহে কার্তিকের মত সুকুমার সুন্দর যুবকের সহিত কিডের বিবাহ হইয়াছে! সে জননীর গৌরবও লাভ করিয়াছে! কিডের মা এখনও আত্মপ্রসন্নহাস্যে আমাদের সংবাদ দেন, "আমার কিডের একটুও বদল হয়নি। কে বলবে বিয়ে হয়ে ছেলের মা হয়েছে! যেন সেই আদুরে খুকীই রয়ে গেছে। হিংসুকেরা বলে ন্যাকা, যারা চেনে তারা বোঝে কি মেয়ে আমার। সরল শিশু।"

সত্যই দেখিয়াছি কিডের কোনোই পরিবর্তন হয় নাই। যুদ্ধোত্তর জগৎ কত বদলাইয়া গিয়াছে। মানুষের কত পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু, কালের শাসন কিড্কে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই। পিরামিডের ধ্বংস আছে, গ্রহতারার বিলুপ্তি আছে, কিডের পরিবর্তন নাই।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক হইয়াও ছোড়দা কিড্কে সম্পূর্ণ দেখিতে

পায় নাই। তাহার কারণ সে প্রেমে অন্ধ। ঘনিষ্ঠ আলাপে আমার নারী-চক্ষে কেবল কিডের প্রকৃত রূপ ধরা পড়িয়াছিল।

অত্যন্ত স্বার্থপরতা লুকাইয়া রাখিতে কিড্ শিশুসুলভ সারল্যের আবরণে নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণনখরের মত গোপন করিয়া অপরিণত-হৃদয়া খুকী সাজিয়াছিল। তাহার কিম্ভূতকিমাকার অত্যাশ্চর্য ধরন-ধারণ তাহার নিজেরই আবিষ্কৃত, পরিজনেরা তাহা প্রশ্রয় দিত মাত্র। আহ্লাদে মাতাপিতা ও ভাইদের চক্ষে ধূলা দিয়া কিড্ জীবনের সমস্ত গুরুভার দায়িত্ব এড়াইয়া নিজের ইচ্ছামত লঘু জীবনের আনন্দে ভাসিয়া চলিত। তাহার চিররুগ্ণা মাতা শত অসুবিধা সত্ত্বেও সংসারের কোন কর্তব্যের ভার প্রাণে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে দিতে পারিতেন না। ভাইদের অসুস্থতায় তাহাকে কেহ ডাকিত না, কারণ সে শিশু, তাহার মন রোগ দেখিয়া খারাপ হইবে। পিতার কষ্টার্জিত অর্থের হিসাব-নিকাশ না রাখিয়া নিজের খেয়ালে জলের মত ব্যয় করা কিডের ছেলেমানুষির অপর লক্ষণ। পসারহীন সদ্য ডাক্তার সুধীর মুখার্জীকে জাতির বাধা অমান্য করিয়া বিবাহের ক্লেশ-স্বীকার কিড্ করিবে কেন? তখন সে শিশু। জমিদার-গৃহে নব-কার্তিকের আদরিণী বধূত্বের আরামের জন্য অভিভাবকদের মতবাদ শিরোধার্য করিবার সময়ে কিড্ শিশু। কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও রূপবান যুবকের সহিত প্রেমলীলার বিলাসের সময় সে পরিণত-যৌবনা, রহস্যময়ী নারী। অভাব-অনটন ও বাধার মধ্যে প্রেমকে বরণ করিবার সময়ে কিড্ কিড্। প্রসাধন-নৈপুণ্যে লীলা-বিভ্রমে পুরুষকে উন্মাদ করিবার সময়ে সে পঞ্চবিংশবর্ষীয়া এণাক্ষী রায়।

ছোড়দাকে আমি কিছু বলি না। কারণ, আমি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ মেয়ে, কারুণ্য ও মমতা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এখনও নিরালা মুহূর্তে দাঁতে পাইপ সুধীর মুখার্জি আকাশের দিকে চাহিয়া উদাস হইয়া যায়। সেই ঔদাস্যের মূলে আছে হৃদয়হীনা কিড্। অগাধ অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী আজও বিবাহ করে নাই। এই কিশোরসুলভ তরল ভাবপ্রবণতার জন্য সে হাস্যাস্পদ। এই স্থিরবুদ্ধি উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক অতি সাধারণ একটি ন্যাকা মেয়ের নিকট চিরদাসত্ব আজও করিতেছে মনে মনে।

তবে অতিসতর্ক কিডেরও হিসাব-খতিয়ানে কিছু ভুল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সুধীর মুখার্জির এই গৌরবময় বর্তমান সেদিন অতীতে লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। অখ্যাতনামা, ক্ষীয়মাণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী অপেক্ষা

স্বনামধন্য ছোড়দাকে কিড্ অবশ্যই প্রাধান্য দিত। কিন্তু সে জানিত না, বুঝিতে পারে নাই। কিম্বা কিড্ যথার্থই বুঝিয়াছিল। কিড্‌কে পাইলে সেই পরিতৃপ্ত পূর্ণচিত্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থান লাভ করিত না। তবু, স্মৃতিসুখ হইতে ছোড়দাকে বঞ্চিত করিব না। কিড্ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ছেলেমানুষ রূপেই সে জানিয়া সন্তুষ্ট থাক্—স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব নারীরূপে নহে।

* * * *

মল্লিকার ধারণা আমি নির্বোধ। সাতাশ বৎসরের অনভিজ্ঞ ছোড়দা ও সাঁইত্রিশ বৎসরের বিজ্ঞ কর্ণেল মুখার্জি এক ব্যক্তি নহে। কিড্‌কে তখন না চিনিলেও পরে ঠিক চিনিয়াছি। কিডের স্বার্থপরতার যথার্থ রূপ আমি বুঝিয়াছি। আর বুঝিয়াছি কেন কিড্‌কে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার সমস্ত জীবন নিজের খেয়ালে ছিনিমিনি খেলিবে, তুচ্ছ ইচ্ছাপূরণের জন্য অসাধ্যসাধনের নির্দেশ দিবে, এমনি প্রেয়সী নারী আমার অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষিতা ছিল। যাহার মনোহারী স্বার্থপরতা আমার অপরিসীম প্রেমকে বার বার পরীক্ষায় ডাকিবে, যাহার কুটিল বুদ্ধি সহস্রবার আমাকে দিশাহারা করিবে।

নারীর কাছে পুরুষ দুই বস্তু চায়—প্রেমলিপ্সা পূরণ ও পিতৃত্বের অধিকার। কিড্ আমার এই দুই প্রবৃত্তিই তৃপ্ত করিয়াছিল একা নিজেই। তাহাকে ভালবাসিতাম প্রিয়া রূপে, শিশু রূপে। তাই সে আমার চক্ষে অসামান্যা।

আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি কিডের জন্য নহে। স্বামীর প্রেমে সন্তানের স্নেহে অকলঙ্ক চরিত্রগৌরব থাকুক তাহার। আমি তাহার সুখের ঘর ভাঙিব না। কিন্তু, আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি কিডের মতই আর এক নারীর জন্য। স্থানপূরণ অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে।

আমার জীবনে সেই নারী আসুক—যে কিডের মতই হৃদয়ের শেষ বিন্দু ভালবাসা নিঙড়াইয়া লইতে জানে।

রঞ্জনরশ্মি

মৃত্যুর মহান্ মাধুরী সহসা সাধারণকে অসাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করিল। দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দার নিম্নে আধুনিক হাল্কা স্প্রিংএর পর্য্যঙ্কে মৃতদেহ রাখা হইয়াছে। প্রত্যুষের রক্তিম আলোক সেই গৃহেরই চূড়ায় প্রতিফলিত, যদিও নীচের লনে এখনও অন্ধকার।

শ্বাপদের মত মৃত্যু সুখের ঘরে হানা দিয়াছে। জমিদার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী পুরন্দর চৌধুরী সাধারণ শবদেহে পরিণত হইয়া—অগ্নিসাৎ হইবার প্রতীক্ষায় অসহায় দ্রষ্টব্য বস্তুর মত পড়িয়া আছে। যে সমাজের বিরুদ্ধে উন্নাসিক বিদ্রোহে আপন জগতের দায়িত্বহীন আধুনিকত্বের মধ্যে পুরন্দর আশ্রয় লইয়াছিল, এখন সেই সমাজের স্কন্ধারোহণ পূর্বক সেই সমাজেরই অনুকম্পায় পুরন্দরের স্বর্গারোহণপর্ব সমাপ্ত হইবে। বহুমূল্যে রক্ষিত যৌবন, বহুপ্রসাধন-চর্চিত দেহ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে এখনই—একটু পরে—ক্যাওড়া-তলার মহাশ্মশানে। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সকলে উদাসী। মাতা ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। পিতা বিহ্বল,—বিবাহিতা ভগিনী ভগিনীপতি, খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা শেষ ব্যবস্থা করিতেছে।

দীর্ঘ রোগভোগের চিহ্ন পুরন্দরের সর্বদেহে। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে যে ভোগীর স্থূলতা ছিল, রোগের শাসনে তাহা অদৃশ্যপ্রায়। তবু অভিজ্ঞ অধর, নিমীলিত সুদীর্ঘ নয়ন, নাসিকার গঠনের আশেপাশে এখনও পড়া যায়—'এই ব্যক্তি জীবনে সুখ ও আরামকে প্রাধান্য দিয়াছিল।' টাইফয়েড রোগীর বিগত-জ্বর মৃত মুখের পাণ্ডুরতার দিকে চাহিলে সহসা মনে হয়—তাহা হইলে পুরন্দরের বয়স হইয়াছিল? প্রতিদিনের জীবনে তাহাকে তরুণ বলিয়াই বোধ হইত।

পুরন্দর চল্লিশ পাইয়াছিল। কেশমূলে শমনের থাবা না লাগিলেও তাহার অধরপ্রান্তের রেখায়, ললাটের অস্পষ্ট কুঞ্চনে যৌবনসীমায় উপনীত তাহাকে বুঝাইত। অধরোষ্ঠের মোহন বক্র ভঙ্গীতে ঈষৎ নিষ্ঠুরতা, নয়ন-নিমীলনে দৃঢ়তা বুঝাইত, পুরন্দর সুকুমার তরুণ নহে। পুরন্দর অকৃতদার ছিল। পরিজনদের সচেষ্ট অনুরোধেও সে দার-পরিগ্রহ করে নাই। তবে সকলে

প্রত্যাশা করিত, আজকালের মধ্যেই পুরন্দর বিবাহ করিয়া উত্তরাধিকারী-নির্মাণে মনোযোগী হইবে। যাই হোক, নানা কারণে পুরন্দর বিবাহ করে নাই, তবে বহু তরুণী, কিশোরীর সহিত আলাপ ছিল। অবিবাহিত ধনী বিবাহযোগ্য ব্যক্তিকে পাত্রীর মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিতেন। এই ধরনের নিমন্ত্রণ পুরন্দরের প্রতিদিন লাগিয়া থাকিত।

খবর পাইয়া অনেক বন্ধু ও হিতৈষীবর্গ আসিয়াছেন। কেহ বা পুষ্পস্তবক আনিয়াছেন; পুরন্দরের জাগতিক দেহের উপরে ন্যস্ত করিতেছেন সসম্মানে। ধীরে ধীরে নানা বিভিন্ন ব্যক্তিবৃন্দের একটি ভীড় জমিয়া উঠিল। সমাজের সকল স্তর হইতে বন্ধু ও পরিচিতবর্গ আসিয়াছেন।—তাহা হইলে পুরন্দর সত্যই জনপ্রিয় ছিল?

পুরন্দরের ভগিনী শোকের মধ্যেও অভ্যাগতদের প্রতি এক চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে। স্যর কল্যাণ রায়ের স্ত্রীর স্কন্ধে হাত দিয়া কিছুক্ষণ হায়-হায় করিল; সিনেমা-প্রযোজক নবেন্দু মজুমদারের কাছে অগ্রসর হইয়া ক্রন্দন করিল; জমিদার কুন্তলকৃষ্ণের কন্যার হাত ধরিয়া ভ্রাতার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করিল। এদিকে ক্রমাগত আলোকচিত্র উঠিতেছে এবং বিশিষ্ট উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। ভিতর-বাটীতে চা-কফি বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

পুরন্দর যাহাদের টাকা ধার দিয়াছিল, তাহারা এত দুঃখেও ঋণের ভার হ্রাস হইল ভাবিয়া হৃষ্ট হইবার উপক্রম করিয়া আবার মনকে চেষ্টা-কৃত বিষণ্ণতা দিয়া শাসন করিতেছে। যে সকল স্থানে পুরন্দর বিল মিটায় নাই, তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া শোকপ্রকাশ করিয়া যাইতেছে, ভদ্রজনোচিত সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধ পিতার নিকট বিল সহ হাজির হইবে।

যে নারীগণ পুরন্দরের সহিত কোন-না-কোন সময়ে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত। দুই-এক জন তাঁহারা বিবাহিতা আছেন।

একজন ছিল, আজ সে নাই—তাহার সম্পর্কে নানা অভিমত লোকের মুখে মনে ফিরিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ পুরন্দর দেবতা হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর অমরত্ব তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার কোন দোষ থাকিতে পারে না। সকলে আপাতদৃষ্টিতে পুরন্দরের ভক্ত আজ।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে আমাদের লক্ষ্য চারিটি মহিলা। একজন প্রায় পুরন্দরের সমবয়স্কা। শাদা রেশমের জামা ও শাড়ী পরিধানে, সীমন্ত সিন্দূরশূন্য। হাতে একগাছি সাদা মোটা সোনার বালা, গলায় বৃহৎ লকেটসমেত হার, হাতে হীরকাঙ্গুরীয়। পুরন্দরের বাল্যসঙ্গিনী, পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার-পুত্রী, বালবিধবা।

এক পাশে থামের আড়ালে যে দাঁড়াইয়া, সে বিশিষ্ট ধনীর পত্নী। প্রখর সৌন্দর্যশালিনী। মদ্যপ স্বামীর অনাদৃতা পত্নীর জীবনে প্রেম আনিয়াছিল পুরন্দর।

পুরন্দরের পর্যাঙ্কের পার্শ্বে আধুনিকা তরুণী। মধ্য-বিংশবর্ষীয়া। কণ্ঠশিল্পী সে, প্রতিভা আছে। পিতৃবংশের খ্যাতি আছে। রূপ যতটুকু নাই, ততটুকু বৈশিষ্ট্য আছে। সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি। হয়তো পুরন্দর তাহাকেই বিবাহ করিত! তাহার দৃষ্টি—এক পার্শ্বে বড়লোকের বাড়ীতে যে সঙ্কুচিতা কিশোরী দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দিকে। রূপ অনবদ্য, কিশোরীর বয়স অষ্টাদশ। স্কুল-শিক্ষয়িত্রী সে। সমস্ত দৃশ্যটি তাহারা দেখিতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতেছে নিজেদের অন্তলোক, দেখিতেছে অতীত। পুরন্দরের সম্পর্কে শেষ কথা তাহারা জানে। পুরন্দর কেমন ছিল? বিভিন্ন সংবাদপত্রে আগামী কল্য বিশিষ্ট নাগরিকের তিরোভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে। দূরের আত্মীয়-স্বজন আঘাত পাইবেন, বন্ধুরা শোকপ্রকাশ করিবেন। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, মধ্যদেহী, গৌরবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ—সুপুরুষ ছিল সে। সকালে কফি, বিকালে চা, রাত্রে সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল। সৌখিন পোষাক, মার্জিত বাক্যবিন্যাস, মোলায়েম ব্যবহার। লোকে বলিত, তাহার অহমিকা নাই, সে সুবিধাবাদীর যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুবিধাবাদী নয়। অর্থসাহায্য বিপন্নকে সে করিত, কখনও কাহাকে প্রতারণা করে নাই। বন্ধুবৎসল ছিল। রসিক, গুণগ্রাহী পুরন্দর চৌধুরী। কিন্তু, এ সমস্ত কথা তো ছবিতে রং-চড়ানো। আসল চিত্রখানি কেমন ছিল? কিছুক্ষণের মধ্যে পুরন্দরের চিহ্ন থাকিবে না। শবযাত্রার আয়োজন প্রস্তুতপ্রায়। তাহার পত্নী নাই, সন্তান রহিল না। কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারে নাই। তাহাকে জনতা মনে রাখিবে কি দিয়া? সুতরাং হিসাব-নিকাশের প্রকৃষ্ট সময় এখনই।

বিলাপের স্বরে বৃহৎ অট্টালিকা মুখরিত। আশ্রিত-আশ্রিতারা কাঁদিবার

এমন সুযোগ পাইবে না। সকলেরই আশা অপুত্রক কর্তার উইলে। ভগিনী-পতির বিষাদে হরিষ। তাহার পুত্র আছে। বিষয় তো নাতি পায়।

মাতাকে ডাকা হইতেছে শেষ দেখার জন্য। আর রাখা যায় না। সংকীর্তনের দল, খই, পয়সা প্রস্তুত। জন-সমাগম শোভাযাত্রা করিবে। আর্ত-চীৎকার উঠিতেছে—পুরন্দরকে এখনি শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে। আজ পুরন্দর দেবতা। তাহার কোন দোষ-ত্রুটী নাই তাই তাহাকে অমরত্বের আলোকে দেখা সঙ্গত।

পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নারীর প্রতি তাহার ব্যবহারে। বহু সংস্কৃতি, বহু শিক্ষার মেকিত্ব সেখানে ধরা পড়ে। অনেক প্রেমে গলদ দেখা যায়, অনেক পুরুষত্বে ফাঁকি। প্রথম শ্রেণীর মন না হইলে নারীর নিকট পুরুষের সামীপ্য নির্দোষ হয় না। আমরা দেখি মৃতকে সেই রঞ্জনরশ্মি-সম্পাতে।

বালবিধবার চোখে অশ্রু। লজ্জা নাই। কারণ সকলেই জানে, সে পুরন্দরের খেলার সাথী ? সাদা রেশমের অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া মনে মনে হৈমবতী বলিতেছে—'পুরন্দর, জানি তুমি কথা বলতে না পারলেও আমার কথা শুনতে পারছ। অনেকবার যা বলেছি, আবার শোন তুমি। আমার একমাত্র স্বামী ছিলে তুমি। শৈশবের খেলা-ঘরে তোমার উদ্বোধন, বন্ধু! সগোত্র বলে বিয়ে হল না। চলে গেলাম অন্যের কাছে। সে যাওয়া মন চায়নি। ফাঁকির ঘর ধ্বসে গেল। ফিরে এলাম পিতৃগৃহে। কিন্তু ব্যবধান আরো বেশী হল। বিধবা চৌধুরীবাড়ির বধূ হতে পারে না। তবু সমস্ত জীবন সূর্যমুখীর মত তোমার পথের দিকে ফিরিয়ে রেখেছি। কলকাতায় বাসা বেঁধে তোমার কাছে-কাছে আছি, শিক্ষা-দীক্ষায় তোমার উপযুক্ত হবার চেষ্টা করেছি। তোমার মন যে আমাকেই সম্পূর্ণ দিয়েছিলে, হে আমার সূর্য! তুমি বলেছিলে সেই স্মরণীয় পূর্ণিমার তিথিতে,—'হৈম, আমাকে বাহিরজগতে স্বামীভাবে চেও না তুমি! বাবা বেঁচে থাকতে হবে না তা। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ তোমার, এটাও জেনে রেখো।'

জানি, জানি পুরন্দর। আমার আশায় তুমি সংসার করনি। তোমার জীবনের সত্য আর মুখের কথার কোন পার্থক্য নেই। তোমার সীমাহীন ভালবাসা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে আমার কাছে ফিরে আসে, কানে কানে বলে যায়—'আর একটু অপেক্ষা কর হৈম,—আর একটু। বাইরের জগতে তোমাকে মর্যাদা আমি দেব। অপেক্ষা করছি শুধু সময়ের আশায়। আমি

রাজর্ষি। অন্তরে আমার বৈরাগ্য, তপস্বিনি, তোমার জন্যে! তোমার ভালবাসা আমাকে গৈরিকবাস পরিয়েছে। অসংখ্য নারীর মধ্যে বিচরণ করেও পদস্খলন হয়নি আমার, কাউকে তো সহধর্মিণীর মর্যাদা দিতে পারিনি।'

পুরন্দর, আমার মত ক'রে কে তোমাকে জানে? আমার মত ক'রে কে তোমাকে দেখেছে? বাইরে ভোগী, অন্তরে উদাসী তুমি। লোকে তোমাকে ঠিক চিনতে পারে না, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, তাই আমি জানি, শত প্রলোভন তোমার চার পাশে, কিন্তু হে দেবতা, এক দিনও তোমার বিচ্যুতি ঘটেনি।

হে আমার পাথরের দেবতা! এত নিষ্কলুষ তুমি, এত পবিত্র! আমার সাহচর্যেও কখন তুমি চরম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দাওনি। মনে পড়ে সেই দিন? আমার বাগানে তুমি হঠাৎ এলে! আমি বেদীতে বসে মালা গাঁথছি। শুক্লা চাঁদ মাথার ওপরে! বাড়ীতে কেউ নেই। ক্লান্ত তুমি। তোমার সেবা-যত্ন করলাম। মনে হল সেদিন, আকাশের চাঁদ তুমি নেমে এলে হাতের কাছে। কতদিন অপেক্ষা করেছি, কতদিন আরও অপেক্ষা করতে হবে, জানি না। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি আমাকে ঠেলে দিতে লাগলো—তোমার দিকে পুরন্দর! আমি কেঁপে উঠলাম, বৈধব্য আমার বাইরের, অন্তর তো তোমারি প্রেমে লালে-লাল। তোমার মনে আমার নিরাভরণ জীবন গেরুয়া রং বুলিয়েছে। আমার মনে তোমার প্রেম ফুটিয়েছে রক্তগোলাপ। কি প্রভেদ, না পুরন্দর?

আমার ধৈর্য-সংযমের বন্ধন খসে গেল। তোমার কাছে প্রার্থনা করলাম। একটি দিন শুধু জীবন আমার ধন্য করে দিতে। সম্পূর্ণভাবে চাইলাম তোমাকে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে চাইলাম। আমি তো কুমারী নই, পুরন্দর! স্বামী আমাকে অনাঘ্রাতা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন নি। যে বস্তু অন্য পুরুষ ছিনিয়ে নিয়েছে, সে বস্তু কেন তুমি গ্রহণ করবে না? আমার দেহ-দেউল কি অবাঞ্ছিতের পাদস্পর্শে আবিল হয়ে থাকবে? অহল্যার পাষাণে, রামচন্দ্র, তুমি পদক্ষেপ-করবে না?

বলেছিলাম অনেক কথা। অনেক—অনেক কথা। সেই রাত্রিকে ধরে রাখতে কত চেষ্টা করেছিলাম! যদি জীবনের খেলা সহসা শেষ হয়ে যায়, বাঞ্ছিত, মনে করে রাখবার মত কি কিছু দেবে না? আমার ধর্ম?

হিন্দু-বিধবার ধর্ম ?—আমার ধর্ম তুমি। আমার স্বামী তুমি। যে আমার স্বামী ছিল, সে আমার ওপর বলপ্রয়োগ করেছে। পরপুরুষ সে! আমার ধর্ম সে বলাৎকারীর স্মৃতি-পূজা নয়, প্রকৃত মালিকের পায়ে আত্মদান। নাও আমাকে, পুরন্দর! মৃত্যু যদি অকস্মাৎ আসে, কি হবে? জীবনের চরম ও পরম পাওয়া কি এ পারে ফেলে-রেখে যেতে হবে?

নির্লজ্জায় আত্মপ্রকাশে একবার অসহায় ভাবে আকাশের দিকে তাকালে তুমি। যেন বল-প্রার্থনা করলে। চাঁদের আলো তোমার দেবদুর্লভ রূপকে অপার্থিবতা দান করলো। এ জগতের উর্ধ্বে নিমেষে চলে গেলে, তোমার স্ফটিক-শুভ্র পবিত্রতায় আমার বাসনা রেখাপাত করতে পারলো না। মাথায় হাত রাখলে তুমি আমার। করুণ স্বরে আর্তনাদের মত বলে উঠলে—'হৈম, হৈম! আমাকে দুর্বল ক'রো না। তোমাকে আমি যতদিন বাইরে স্বীকার না করতে পারি, ততদিন স্পর্শ দিয়ে ম্লান কোরব না। হৈম, আমার মনের কথা জানো। আমাকে আদর্শবিচ্যুত ক'রো না।'

তোমার পায়ে উদ্ধত মাথা নামিয়ে দিলাম। মুহূর্তে বাসনার বিহ্বলতা কেটে গেল। মন ভরে উঠলো। সেইদিন থেকে তুমি আমার চক্ষে দেবতা। আজ মৃত্যু এসেছে তোমার আমার মাঝে। চরমপ্রাপ্তি তোমার হাতে এবারের মত পাওয়া হোল না, বন্ধু, কিন্তু ক্ষোভ নেই! তুমি আমাকে ভালবেসেও আমাকে মলিন করনি। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও তুমি তোমার আদর্শ বজায় রেখেছ। বাল্যসঙ্গিনীর প্রেমে সমাজের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র হয়েও বিবাহ করতে পারনি তুমি। জানি, আমাকেই তুমি বিবাহ করতে সমাজ অমান্য ক'রে। পিতার মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলে তুমি। কিন্তু, তার আগে মৃত্যুই যে তোমাকে নিয়ে গেল।

আমার আজন্ম বল্লভ—আমার আবাল্য সুহৃদ! নাও, ধরো আমার চোখের জলের মালা! তোমার মর্মর-শুভ্র, হিম ললাটে ঝরুক আমার চোখের জল। দেখুক—দেখুক সকলে, সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হলেও শোক-প্রকাশের অধিকার আমার আছে। সে তোমার প্রেমের অধিকার।"

. . .

পুষ্পাঞ্জলি যেন বলিতেছে মনে মনে—'এই বিধবাটি কে? এত কাঁদছে কেন? বয়স তো ঢের, কিন্তু চেহারা এখনও ভাল আছে। কে জানে, পুরন্দরের কোন আত্মীয়া বোধহয়। ওকে তো কোথাও দেখিনি কোন দিন।

বোধহয় গোঁড়া পরিবারের লোক। পর্দানশীন, ফ্যাশন আছে কিন্তু। ওধারে কুঙ্কুম বোস দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এসেছে! একখানা দুঃখের গান ধরে না দেয়! ওই গলার জোরেই তো পুরন্দরকে প্রায় বেঁধে ফেলেছিল আর কি। আমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো ওর ভাগ্যেই পুরন্দর চৌধুরীর পত্নী হওয়া নাচছিলো। এধারে ও মেয়েটি কে? বেশ দেখতে! পুরন্দরের কোন কাজিন নয় তো? এত সুন্দর দেখতে! তবে গরিবানা পোষাক-আষাক কেন? ও, হাঁা, উনি তো নলিনী লাহিড়ী। এই বাড়ীতেই দেখেছি। স্কুল-পড়ানে হা-ঘরে মেয়ে। পুরন্দরের এক বাই ছিল, যার তার সঙ্গে মেশা। কিছু ছিল না তো দু'জনের মধ্যে? নইলে নেহাৎ বাজে মাষ্টারনী আজ ধেয়ে এ সার্কেলে এসেছে কেন? আরে ছিঃ, কি ভাবছি! নেহাৎ বাচ্চা মেয়ে একটা, পুরন্দরে মেয়ের বয়সী; তাছাড়া পুরন্দরের কি অন্য দিকে তাকাবার অবকাশ ছিল? আজ ছয় বছর আমাদের আলাপ হয়েছে। তার পরে কত মেয়েই ঘুরলো পুরন্দর চৌধুরীর পেছন-পেছন। কিন্তু কেউ তো আমল পেল না। কি একনিষ্ঠ পুরন্দর; আমি বিবাহিতা তাই বিয়েই করলো না।

কাল উনি বেশী নেশা করেননি। খবর পাওয়া মাত্র আসতে পারলাম ওঁকে নিয়ে। একা আসাটা ভাল দেখাতো না, অথচ শেষ দেখাও হত না। আমি বাঁচতাম কি ক'রে? উনি জানেন পুরন্দর ওঁর বন্ধু, আমাকে ওঁর সম্বন্ধে ভাল বুদ্ধি দেয়। পুরন্দর আমাকে ভালবাসলো, আমিও তৃপ্ত রইলাম। ওঁর নেশা-করা বা বাড়ী না-আসা নিয়ে কান্না-কাটি, হৈ-চৈ বন্ধ দিলাম। উনি ভাবলেন, পুরন্দরের পরামর্শে আমার পতিভক্তি উছলে উঠেছে। মহা খুশী হলেন বন্ধুর ওপর। ভাবতে হাসি পায়। ভাবতে হাসি পায়? এই কি আমার হাসির সময়? সত্যি, কি হয়ে গেল, না? ভাবতেও পারিনি সত্যি-সত্যি পুরন্দর মারাই যাবে। এত স্বাস্থ্য যার, এত রূপ যার, এত উৎসাহ যার, সে অকালে মারা যাবে? টাকার অভাব ছিল না, চমৎকার চিকিৎসা হচ্ছিল। ডাক্তারেরা বলেছিলেন, সেরে উঠবে। রোজ প্রায় দেখতে আসতাম। সেরেই তো উঠেছিল। হঠাৎ হার্ট-ফেইল করলো।

পুরন্দর আর নেই। ভাবতে অদ্ভুত লাগে। দেড় মাস আগেও ছিল সে। জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলছিল আমাকে শোবার ঘরের খাটে। রাত্রি দশটা, উনি তখনও ফেরেননি। সে রাত্রে ফিরলেন না মোটে। বন্ধুর বাড়ী ককটেল-পার্টিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। পুরন্দর কি পাগলের মত করেছিল

সেদিন! ওই এক দোষ ছিল ওর। সংযম ছিল না একেবারে। সব সময় এক জিনিষ চাই। যাক্, আমার তো স্বামী থেকেও ছিলেন না। পুরন্দরই আমার স্বামী হয়েছিল। সে একমাত্র আমাকেই ভালবাসতো। এত সুন্দরী, বাছা-বাছা মেয়েরা ওকে বিয়ে করতে লেলিয়ে বেড়াতো। ও আমার জন্যে বিয়ে পর্যন্ত করেনি। স্পষ্ট বলেছিল আমাকে, 'পুষ্প, এ জীবনে এ পাট হোল না। তোমার আশায় তোমাকে ভালবেসে কাটাবো দিনগুলো।' সত্যি, এত ভালবাসা কি কোন মেয়ে পেয়েছে? আমার কি দুঃখে দিন কাটতো ওর সঙ্গে দেখা হবার আগে! স্বামী ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন। একা বিছানায় ছটপট করছি। মনের কষ্টে কি করতাম কি জানি? পুরন্দর এল এ-সময়ে, ভালবেসে আমাকে ভরে তুললে। সব দিকে। এখন কি করে থাকবো আমি?

আমি দোষ মনে করিনি। যে আমাকে ভালবেসেছে, সে-ই আমার স্বামী। ছয় বছরের বন্ধন, পাঁচ বছরের প্রেম। আমার স্বামীর তো অনেক নারী ছিল। কিন্তু পুরন্দরের জীবনে আমি একা। তাই বোধহয় অত আবেগ ছিল ওর। কিছুতেই যেন তৃপ্তি আসতো না। প্রত্যহ সম্পূর্ণ ভাবে আমাকে গ্রহণ করতো সে। বাধা দিতাম মাঝ-মাঝে, লোক-জানাজানি হবে, ভয় দেখাতাম। পুরন্দর হেসে বলতো—'তোমার তো স্বামী আছে, পুষ্প! প্রদোষ তোমার স্বামীর ছেলে। ছবি যে আমার মেয়ে তার প্রমাণ তো নেই। তোমাকে দেখলে স্থির থাকতে পারি না আমি। তোমার রূপ জ্বলন্ত আগুন, আমাকে জ্বালিয়ে মারে। 'অগ্নি-শিখা, এসো—এসো, আনো আলো।' টেনে নিয়ে গেল আবার। বড় জ্বালাতন করতো। তা কি হবে? রক্তমাংসের মানুষ তো পুরন্দর, পাথরের দেবতা নয়! অত ভালবাসা যার, অত হৃদয় যার, সে তো ও-সব চাইবেই।

পুরন্দর চলে গেল। কই, আমার চোখে জল কই? ভাল করে বুঝতে পারছি না, যেন আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল! কে আমাকে ভালবাসবে? আমি কি নিয়ে থাকবো? আমি ছবিকে নিয়ে থাকবো। পুরন্দরের চিহ্ন। আমার পুরন্দরের প্রেমের প্রতীক। যত বড় হচ্ছে, ওরই মুখে-চোখে খুঁজে পাচ্ছি পুরন্দরকে। পুরন্দর গেলেও আমার তো ছবি আছে!'

•

নলিনী লাহিড়ীর মনের কথা—'কেন এলাম? কেন এলাম এখানে এই সমস্ত হৃদয়হীন বড়-লোকের মধ্যে! আমার পুরন্দর নেই, শেষ দেখার লোভ

সামলাতে পারলাম না। মনে হচ্ছে এখুনি চীৎকার করে কেঁদে উঠবো। এদের সব লোক-দেখানো শোক। উনি ঠিক বলতেন—'নলিনী, আমার সমাজের লোকদের হৃদয় নেই। তাই ছুটে ছুটে আমি আসি তোমার কাছে। মনে হয়, তুমি বুঝি অন্য রকম। আমার জন্যেই আমাকে ভালবাসো তুমি। আমার টাকার জন্যে নয়, নামের জন্যে নয়।'

এত বড় পুরন্দর চৌধুরী! অতি গরীব ঘরের মেয়ে আমি, স্কুলে মেয়ে পড়িয়ে খাই। আমাকে পথের ধুলো থেকে বুকে তুলে নিলেন। চাঁদা চাইতে এসেছিলাম। কলকাতার বাছা বাছা বড়লোকের তালিকায় স্কুল থেকে জমিদার পুরন্দর চৌধুরীর নাম দিয়েছিল। বাড়ী দেখে, ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হলাম। মানুষ দেখে মুগ্ধ হ'লাম। নিজে আলাপ করে নিলেন। আমাকে বললেন কিছুদিন পরে,—'তোমার বয়স আঠারো, আমার চল্লিশ। কিন্তু মনে হয়, তোমার অখণ্ড অধিকার আছে আমার ওপরে। একমাত্র তুমি এ ছন্নছাড়া জীবনের মালিক হতে পারো।'

বিশ্বাস করতে পারিনি নিজের সৌভাগ্যকে। পুরন্দর চৌধুরীর নামে আধুনিক সমাজ ব্যাকুল, আধুনিক মেয়েরা তাঁকে বিবাহ করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। আমার মত লোকের সঙ্গে ওঁর আলাপ কল্পনাতীত। তাতে, উনি আমাকে ভালবাসলেন এবং একমাত্র আমাকে। কত কথা বলতেন মন খুলে! বলতেন জীবনের সমস্ত গোপন অধ্যায়, যা কাউকে বলেননি। বলতেন আমাকে তিনি আসল অস্তিত্বের কথা তাঁর—যা কেউ জানে না। এই যে সমস্ত বড়ঘরের ফ্যাশানী মেয়েরা, যারা তাঁকে গ্রাস করে ফেলতে ব্যগ্র হয়েছিল, তাদের কাউকে তিনি ভালবাসেননি। এদের আমি চিনি। এরা আমাকে অবজ্ঞা করে, জানে না, এদের কত ঘৃণা করতেন তিনি। এদের অক্টোপাশ-জাল এড়িয়ে আমার গলি-রাস্তার একতালা ঘরে ছুটে যেতেন। ওই যে বিধবা, বুড়ো বয়সেও ওর পুরন্দরের মোহ যায়নি। ওর পায়ে-ধরাধরি থেকে মুক্তি পেতে কষ্ট হ'ত তাঁর। তবু যাকে ভালবাসেন না, তাকে স্পর্শ করেননি। এত টাকা ওই বুড়ীর! কিন্তু প্রবৃত্তি কি!

এই যে পুষ্পাঞ্জলি সেন। ছি ছি! স্বামী থাকতেও কি লালসা! পুরন্দরকে চাই ওর। পুরন্দর প্রত্যাখান করেছেন ওকে, তবু ছাড়েনি। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, বিশেষত বন্ধুর স্ত্রী। পুরন্দর তাই দশ হাত দূরে সরে ধর্ম রেখেছিলেন।

গায়িকা কুঙ্কুম বোস আমার দিকে চেয়ে আছে, যেন বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেবে। চাউনি যেন ওর ছুরি। কি ধার, বাবাঃ! উনি এ জন্যে দেখতে পারতেন না ওকে। সকলে বলতো, ওকেই উনি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবেন। অত নাম ওর, অত নাম ওর পরিবারের। যে ধারালো মেয়ে, গেঁথে তুলে ক্ষ্যান্ত হবে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন—'ভুল খবর, নলিনী। কুঙ্কুম আমাকে চায় না, চায় আমার টাকা, আমার বাড়ী, আমার গাড়ী। আমার স্ত্রী হিসাবে সমাজে পরিচয়টুকু চায় মাত্র। ও তো আমাকে ভালবাসে না। ওরা সকলে শক্ত, কঠিন। এই কঠিন পথে একগোছা কিশলয়ের মত তুমি এলে। ভাল তোমাকেই বাসি, বিয়ে করলে তোমাকেই করবো। কিন্তু, জানো তো আমার মা বেঁচে। একমাত্র ছেলে আমি। তোমাকে যদি অসবর্ণ বিয়ে করি, তিনি আত্মহত্যা করে মরে যাবেন। অপেক্ষা করতে হবে, নলিনী। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, অজস্র চুম্বনের পরে সহসা ছেড়ে দিতেন, বলতেন 'না, আমার যত কষ্টই হোক, তোমার ক্ষতি করতে পারবো না। তুমি কিছু জানো না, নলিনী। তোমাকে অন্যায়ের পথে টানবো না।' কপালে কষ্টের রেখা ফুটে উঠতো, হাত মুষ্টিবদ্ধ করতেন, তবু সংযমের অবধি ছিল না। আমার চোখে তিনি স্থান পেতেন মহাভারতের বীরকুলের মধ্যে। কত বড় ছিলেন, আমার চেয়ে। কিন্তু, রোমাঞ্চ জাগাতো তাঁর সাহচর্যে। অত ধনী—অত মানী! জীবন সম্বন্ধে অত অভিজ্ঞতা! সমস্ত আমারি পায়ে বিসর্জন দিয়েছিলেন। আমার মত সামান্যার জন্যে অসামান্য পুরন্দর ব্যগ্র হয়েছিলেন, আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন—প্রেমে। এই তো আমার সান্ত্বনা। পুরন্দর না থাকলেও এ স্মৃতি তো কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু আর থাকতে পারবো না। উনি নেই! আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। এই নকল শোকের দৃশ্য আর তো সহ্য করতে পারছি না। কেঁদে ফেললাম বুঝি! হৃদয়হীনা কুঙ্কুম বোস কেন আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে?'

কুঙ্কুম বোসের মনের কথা—সে মনে মনে বলিতেছে:—'নলিনী বুঝি কেঁদেই ফেলে। তা-তো হবেই। ভেবেছিল এত বড় ধনী ব্যক্তির গৃহিণীত্ব তার অবশ্যম্ভাবী। শোক তো লাগবেই।'

পুষ্পাঞ্জলি সেনের ভাব ইংরাজী ভাষার মার্জারের মত প্রীত, যে মার্জার

ক্যানারী পাখীটি গলাধঃকরণ করে আত্মতৃপ্তিতে ফুলে উঠেছিল। পুষ্পাঞ্জলি ভাবছে, সে-ই একমাত্র পুরন্দরকে পেয়েছিল,—পুরন্দরের স্মৃতিচিহ্ন তার কাছেই আছে। ছবির মুখের দিকে তাকানো মাত্র আমি বুঝেছিলাম। পুরন্দরের স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল না।

এধারে হৈমবতী প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করছে। বাল্য বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে দেখাচ্ছে ও ভালবাসা। বঞ্চিত জীবনে পুরন্দর ভিন্ন কি-ই বা ছিল?

আরও অনেক মহিলা; কেউ এখানে এসেছেন, অনেকে আসেন নি। তাঁরা প্রেম করেছেন পুরন্দরের সঙ্গে। সকলে ভেবেছেন তিনিই একমাত্র প্রেয়সী।

আমি? হ্যাঁ, আমিও তার সঙ্গে প্রেম করেছি! আজ এইক্ষণে সত্যের সন্ধানী রশ্মিতে দাঁড়াব। সকলে ভেবেছিল আমার সঙ্গে পুরন্দরের বিবাহ হবে। এখনও এরা তাই ভাবছে। ভাবছে, জীবনের এত-বড় পুরস্কারটি আমার হস্তচ্যুত হয়ে মৃত্যুর গহ্বরে ডুবে গেল। ভাবছে আমি কি হতভাগ্য! আজ সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াব আমি। মৃত্যুর মুখোমুখী পুরন্দর। অনেক সত্যের সন্ধান জানে না, এরা পুরন্দরের সম্বন্ধে শেষ কথা জানে না। পুরন্দর আমার বিষয়ে সত্য জানে না। শুধু অজ্ঞানতার মধ্যেই এতগুলো জীবন ভুলের মালা গেঁথে কাটালো। এরা কেউ পুরন্দরকে ভালবাসেনি। কখনো কোন মেয়ে হৃদয়হীন, নির্মম পুরন্দরকে প্রকৃত প্রেম দিতে পারেনি। তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে সুন্দরের পূজা করেছে মাত্র। হৈমবতীর কাছে পুরন্দর ধর্ম। শিশুকাল থেকে দেবতার পূজার বদলে পুরন্দরকেই পূজা করেছে ও। দোষ-গুণের মানুষকে সে চেনেনি। চিনলে ভয় পেত। পুষ্পাঞ্জলির যৌবন-কামনা মিটিয়েছিল পুরন্দর। ততটুকু মূল্য পুরন্দর পেয়েছিল। কামনার জলের রং-এ শ্রদ্ধার সোনালী পাড় বসেনি। নলিনী, ঐশ্বর্য-অর্থ, যা চোখে দেখেনি, চেয়েও পায়নি, তারই আশায় জমিদার পুরন্দর চৌধুরীর সাহচর্যে গর্ববোধ করতো। এখনও ভালবাসতে শেখেনি ও। আরও যারা—কেউ অর্থের বিনিময়ে, কেউ আনন্দের বিনিময়ে, কেউ মোহের বিনিময়ে পুরন্দরকে প্রেম দান করেছে। পুরন্দরকে কেউ ভালবাসেনি। অনীতাও নয়!

পুরন্দরও এদের কাউকে ভালবাসেনি। নিঃসন্তান হৈমবতীকে স্তোক দিয়ে রাখতো সে ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে। হৈমবতী বিগত-যৌবনা। পুরন্দরের সমবয়স্কা, তার বয়স জানে পুরন্দর। নিজে প্রৌঢ়ত্বে পা দিলেও

প্রৌঢ়ার হিসাব পুরন্দরের খাতায় টোকা হয় না। হৈমবতীর প্রেম নিবেদন পুরন্দরের প্রমাদ ছিল। চিরদিনের কুশাগ্র-বুদ্ধি তবু পরিস্থিতি বজায় রাখতে পেরেছিল। পুরন্দরের অনেক আশা ছিল—হৈমবতীর মৃত্যুর পর তার বিস্তীর্ণ সম্পত্তি একমাত্র পুরন্দর পাবে। সে কথা জানতো পুরন্দর। তবে মৃত্যু যে আগে পুরন্দরকেই নিতে পারে, এ কথা ভেবে দেখেনি সে।

পুষ্পাঞ্জলির অনন্যসাধারণ রূপ-যৌবনে দৈহিক প্রয়োজন ছিল পুরন্দরের। অর্থের বিনিময়ে যে প্রেম তাতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। বহু-বল্লভার প্রেম সে সব প্রেম। জৈব প্রয়োজনে অকৃতদার পুরন্দরের প্রয়োজন মিটতো পুষ্পাঞ্জলির কাছে। তাই তার সঙ্গেও অভিনয় করতে হ'ত। নলিনী ছিল নূতন অভিজ্ঞতা, অনাঘ্রাতা কিশোরী। পুরন্দরের ঐশ্বর্যে তার লুব্ধ-বিস্ময়। তাকে যা বলা যেত তাই বিশ্বাস করতো। অনভিজ্ঞা বালিকার চোখে বীর-পুরুষ বা 'হিরো' সাজবার লোভ ছাড়া যায় না। উচ্চে থেকে নিম্নের পূজা-গ্রহণ ভাল লাগে বই কি! তাই তাকেও প্রেম জানিয়ে হাতে রাখতে হ'ত। তবে তার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হ'ত। নির্বোধ কুমারী সে। বাধ্য-বাধকতায় না পড়তে হয়। আরও যারা, তারাও দৈহিক প্রয়োজন, ব্যবহারিক স্থবিধা ও খেয়ালের তাগিদে ব্যবহৃত হয়েছে। কাউকে ভালবাসেনি পুরন্দর। আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভালবাসেনি পুরন্দর, সে কথা আমি জানি। তবু কেন আত্মদান করেছিলাম? তাই কি সে বিবাহ-ছাড়া পেল বলে বিবাহ-প্রস্তাব করেনি? না। আমি পুরন্দরের বন্ধু ছিলাম। মাঝে মাঝে সে আমার কাছে স্বীকারোক্তি করে ফেলতো। আমার গানে মুগ্ধ হয়ে এসেছিল সে, আমার আভিজাত্যে আকৃষ্ট হয়েছিল। আবার চলে গেল! আবার ফিরে এলো। বারে বারে যাতায়াত করতো সে। আমি দ্বার খুলে রাখতাম আশায়। কিন্তু চিনেছিলাম তাকে। তবে আমিও তো প্রথমে এদের মত নির্বোধ ছিলাম। মোহিত হয়েছিলাম পুরন্দরের নিখুঁত অভিনয়ে। হৃদয়হীনের হৃদয়ের সন্ধান পেতাম, প্রেমশূন্য মনের প্রেম দেখে ধন্য হ'তাম। ইতরকে প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃতিসম্পন্নের মর্যাদা দিলাম। চলে গেল সে কিছুদিন পরে, আর আসতো না। পুরনো হয়ে গেলাম কিনা! তবু দুঃখের মধ্যে ছিল আমার গৌরব। অসামান্য সে, সামান্যের প্রেমে কি তাকে বন্ধন দেওয়া চলে? আবার সহসা একদিনে ফিরে এল, আগের মত আদর-সোহাগে প্লাবিত করে দিল। নিমেষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম। অত্যন্ত আগ্রহে কাছে বসে তাকে লক্ষ্য করে

যেতে লাগলাম। আমার কপালের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে সে বলে উঠলো—'আচ্ছা, উনি তো খুব আসেন এখানে, না? একটা সভায় তোমার গানের যা প্রশংসা করছিলেন! মনে হলো, তোমার প্রেমে পড়েছেন উনি।'—'উনি'-নামধেয় ব্যক্তি তখন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সংবাদপত্র খুললেই প্রত্যহ নাম দেখা যায়। আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

প্রেম তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে দেয় শুনেছি। সাধারণ দৃষ্টির অতীত গুণ-সম্পদ প্রেমাস্পদের ধরা পড়ে প্রেমিকের সেই তৃতীয় নয়নে। সহসা আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেল—এত দিন গুণ-মুগ্ধ তো ছিলাম, আজ বিদ্যুতের আলোকে তোমার দোষ দেখলাম, দেখলাম তোমার দীন সত্তাকে। তুমি এসেছ পুরন্দর, আমার টানে নয়। 'Man of moment' আমাকে ভালবাসেন বলে। তুমি কৌতূহলী হয়েছ। হয়তো আমার মধ্যে দুর্লভ কিছু আছে, যা দেখে তোমার অপেক্ষা অনেক বরেণ্য ব্যক্তি এসেছেন। তুমি চলে যেয়ে ঠকে গেছ বোধহয়। আমার সেই দুর্লভতা ধরতে পারোনি তুমি, তাই এসেছ খুঁজে দেখতে। আমার কোন মূল্য তুমি দিতে পারোনি। অন্যের মনোযোগেই আমার মূল্য। কি করে আমাকে মূল্য দেবে তুমি? তোমার নিজের যে কোন মূল্যই নেই। তুমি তো হীরা নও, কাচখণ্ড। মণি কি করে তুমি পরীক্ষা করবে? পুরন্দর, মৃত্যু তোমাকে অমরত্বের রাজ্যে নিলেও মহিমা দিতে পারেনি। তোমার যে পরিচয় তুমি পেছনে ফেলে গেছ, তাতে কারুকে মর্যাদা দেওয়া চলে না। তবু পুরন্দর, সত্য কথা শোন আজ। মুখোমুখি দাঁড়াও রঞ্জনরশ্মির। অবচেতনকে ভূতের মত ভয় করে দূরে সরিয়ে রেখো না। চেয়ে দেখ তার দিকে। কেন সহস্র রমণী তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারলো না? হৃদয়হীন প্রতারকের মত খেলার পুতুল দু'দণ্ড পরে পথের ধারে ফেলে যেতে তুমি। চল্লিশ বছর বয়সেও কেন বিবাহ করতে পারোনি? কারণ, তোমার অবচেতন মন অজানিত একটি স্থানে নিবদ্ধ হয়ে থাকতো। কে সে? নাম করলে শিহরিত হবে। সে তোমার মা। ঈডিপাস্ কমপ্লেক্স বলি, ফিক্সেশন বলি, খুঁজে বেড়াতে তুমি জননীর প্রতিচ্ছায়া। জীবনে একটি মাত্র নারীকে ভালবেসেছ তুমি, আদর্শ সন্তান ছিলে তাঁর। যে নারী তোমার জননীর তিলমাত্র প্রতিচ্ছায়া ধারণ করতো, তারি কাছে ছুটে যেতে তুমি। আমার কাছে এসেছিলে, কারণ, আমার গলার স্বর ছিল তোমার মায়ের স্বর।

নলিনী বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে, সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। তারা ভাবতো তুমি আমাকেই বিয়ে করবে। কারণ, আমাকে একেবারে ফেলে দিতে পারতে না তুমি অন্যদের মত। বারে বারে ফিরে আসতে আমারি কাছে। আমার কণ্ঠ তোমাকে ডেকে আনতো। মজ্জমান নাবিক ছুটে আসতো সাইরেনের গানে। বাংলাদেশকে গানে গানে প্লাবিত করে দিয়েছি। বেতারে বেজে উঠতো আমারি গান। পথে গ্রামোফোনে আমার সুর। তোমার মায়ের মুখে শোনা ঘুম-পাড়ানী ছড়ার সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে বিপ্লব আনতো। ডাকতো আমার কণ্ঠ জননীর কণ্ঠ হয়ে। ছুটে আসতে আমার কাছে। অন্য সাদৃশ্য না পেয়ে ফিরে যেতে। তবু আমি জানি, তোমার আমার সঙ্গে বিবাহ হোত না, এদের কারুর সঙ্গেও হোত না। তোমার বিবাহ ঠিক হয়ে গিয়েছিল যার সঙ্গে, সে আজ এখানে উপস্থিত নেই। জীবনে অত্যন্ত ঠকেছ পুরন্দর, তারই কাছে। তুমি হৃদয়হীন নির্মম, তাকে ভালবেসেছ। কিন্তু সে তো তোমাকে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছে বিরুদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়কে, যার সন্তান সে বহন করেছে গোপনে। তাকেই নিজের সন্তান ভেবে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বিবাহের দিন স্থির করে ফেলেছ। কেউ না জানলেও আমি জানি।

মাতৃভক্ত সন্তান তুমি। মাতা চোখের জল ফেলে মনোনীতা পাত্রী অনীতা মিত্রকে দেখতে বললেন। একুশ বৎসর বয়স তার, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা। অনীতার মা বাল্যসখী, মেয়ের বিবাহের জন্যে অতিশয় ব্যস্ত হয়েছেন। মাতাকে সন্তুষ্ট করতে অনীতার বাড়ী গেলে। ফিরে এলে অন্য মানুষ। না, পুরন্দর কাউকে ভালবাসেনি বলে মিথ্যা বলেছি। এক জনকে ভাল বেসেছে সে, তার মা—সেই মাকে অনীতার মধ্যে দেখে উন্মাদের মতো ভালবেসে ফেললো সে অনীতাকে। বিবাহের কথা দিয়ে যাতায়াত আরম্ভ করলো।

সন্ধ্যার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল অনীতা গাড়ী-বারান্দার আলিসায় হেলান দিয়ে। এক-পিঠ কালো চুল তার সর্বপ্রথম চোখে পড়ে পুরন্দরের। রাত্রির আকাশের মত কালো, সাগরের মত তরঙ্গায়িত, অমাবস্যার মত ভীষণ চুলের যবনিকা। সমস্ত মনে বাঁশী বেজে উঠলো পুরন্দরের। অবচেতন মন ইঙ্গিত পাঠালো: 'এ'কেই তো খুঁজছি।' এই চুল তার পরিচিত। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব রূপসী মায়ের ঠিক এই রকম এক-পিঠ চুল নিয়ে

খেলা করেছে সে। ফিরে দাঁড়ালো অনীতা মাতার আহ্বানে। আশ্চর্য! পুরন্দরের মাতার তরুণী রূপ যেন মূর্তি-পরিগ্রহ করেছে। মিল শুধু একটাতে নয়, সর্বত্র। পুরন্দর তো এ'কেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। শাশুড়ী ও ভবিষ্যৎ বধূর সাদৃশ্য অন্তরঙ্গ-মহলে বিস্ময়ের উদ্রেক করলো। অনীতার মা গর্বভরে জানালেন যে, তিনি গর্ভাবস্থায় পুরন্দরের মায়ের পাশের বাড়ীতে থেকে সর্বদা মেলামেশা ও সখী-চিন্তা করেছিলেন। তাই এ সাদৃশ্য।

অনীতা পুরন্দরকে সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছিল বিবাহের পূর্বে। কেন? ভালবাসায় নয়। সে পুরন্দরকে কণামাত্রও ভালবাসেনি। সন্তানকে পিতৃনাম দিতে চেয়েছিল সে। যেদিন পুরন্দরকে এ খবর জানালো, সেদিন কৃতার্থ হয়ে উঠলো পুরন্দর। এই তো কামনা। অনীতার দেহ থেকে নূতন রূপে জন্ম লাভ করা। বিবাহের পূর্বেই সেই অধিকার দিল পুরন্দরকে অনীতা। দেবী সে। বিবাহের দিন যত শীঘ্র সম্ভব গোপনে স্থির করলো। কিন্তু অসুখ হয়ে পড়লো।

জানি, অনীতার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ। পুরন্দরের মা তাকে কুড়িয়ে পাওয়া পোষ্য বলে বুকে তুলে নেবেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে-ই হবে। অনীতা যথাকালে বিবাহ করবে বিরুদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়কে, বাড়ীর প্রতিবাদের বিরুদ্ধে। জোর পাবে তখন সে। প্রেমকে স্বীকার করবে। অনীতা আত্মদান করেছিল বিবাহের পূর্বে; তাতে পুরন্দরের চক্ষে তার মূল্য হ্রাস হয়নি। পুরন্দর তাকে এত ভালবাসতো যে, আগে-পরের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। আমার কাছেও পুরন্দরকে আত্মদান করা না করা অবান্তর।

সেই তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে আমার সমস্ত সুখ, সমস্ত ভবিষ্যৎ জলে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখে জানার আলো জ্বলেছে, চেয়ে দেখেছিল পুরন্দর। অস্বস্তি বোধ করেছিল সে। আর কি প্রেম হয়? সতর্ক দৃষ্টি আমার দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতায় তার আসল সত্তা আবিষ্কার করে ফেলেছে, এ কথা বুঝেছিল পুরন্দর। কিন্তু আমার মধ্যের সত্যকে সে আবিষ্কার করতে পারেনি। আমি তো স্বীকার করিনি।

পুরন্দর, তুমি ভাবতে তোমার ঐশ্বর্যে আমার লোভ? দশ জন মেয়ের মত তোমাকে বিবাহ করতে চাই সম্পদের আশায়? কিন্তু পুরন্দর, যে কথা আধুনিক সমাজে কেউ জানে না, যে কথা তোমরা বীজমন্ত্রের মত গোপন

রেখেছ, সে কথা যে আমি জানি। আজ যারা তোমার মৃত্যুতে সম্পত্তি-লাভের আশায় হৃষ্ট হচ্ছে, তারা তো জানে না কত অলীক সেই আশা। কেন তুমি হৈমবতীকে তোয়াজ করতে সম্পত্তির প্রত্যাশাতে—কেন অনীতা মিত্রকে বিস্তর মুদ্রার সঙ্গে তোমার মা মনোনীতা করেছিলেন? পুরন্দর, তুমি মরে ভালোই করেছ। চোরাবালি ছিল পায়ের নীচে, ক্রমেই ডুবে যাচ্ছিলে তুমি। শেষে হয়তো ভরাডুবি হোত! ওই সম্পত্তি—যার জন্যে তুমি আমাকেও লুব্ধ ভেবে আমার দিকে ফিরেও চাওনি, পুরন্দর, সে সম্পত্তি যে মরীচিকা মাত্র। দেনার দায়ে বহুবার বন্ধক দেওয়া বিষয়ে কে আশা রাখে? আমি কি করে জানলাম কেউ যে কথা জানে না? আমাকে সে-ই বলেছে যার হাতে ধরে তোমার বৃদ্ধ পিতা শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন গোপনতায়। সে-ই আমাকে বলেছে, যার কাছে তোমাদের চুলের টিকিটি পর্যন্ত বিক্রীত। সে শপথ চাপল্যে ভাঙেনি, প্রাণের দায়ে ভেঙেছিল। সেও ভেবেছিল আমি তোমার টাকার অলীক মোহে ভুলেছি। তাই প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছিল দলিল-পত্র দেখিয়ে। কেন? সে আমার পাণিপ্রার্থী ছিল। আর—আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

জীবনে একমাত্র নারী, যে পুরন্দরকে স্বার্থশূন্য প্রেমে ভালবেসেছিল, সে আমি। মিথ্যা বলে বাঁধতে পারতাম তাকে কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু অনিচ্ছায় বন্ধন দিতে চাইনি আমি, যখন সে আমাকে ভালবাসেনি। কেন তাকে চিনেও ভালবাসলাম প্রতিদানের আশা না রেখে? কেউ কেউ আলোর চেয়ে অন্ধকার পছন্দ করে কেন? কেন বিষ তুলে নেয় অমৃতের পাত্র দূরে ঠেলে? এ ভালবাসা কারণহীন, অন্ধ। যুক্তি-তর্কের জালে ধরা পড়ে না। রঞ্জনরশ্মিও এ প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারে না। এখানে রঞ্জনরশ্মিও পরাজিত।

উপলব্ধি

৩

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো।"

শ্রীমতী আবার পিত্রালয়ে এসেছে। স্বামীর ভ্রাম্যমাণ কাজে শান্তি নেই একদণ্ড। হয়তো আজ লাহোর, কাল পাঞ্জাব ট্যুরে যেতে হবে। বিবাহের পরেই শ্রীমতী সঙ্গে শখ করে গিয়েছিল। কিন্তু জীবন যাত্রা এতই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, তার চেয়ে এই বিরহ ভাল। চুপচাপ শয্যায় শুয়ে দিবাস্বপ্ন। আতঙ্ক নেই। স্বামী আছেন। প্রত্যেক ডাকে চিঠি, মাঝে মাঝে 'তার' আসছে। যথা সময়ে ফিরে আসবেন তিনি। শ্রীমতী নিজের গৃহে যাবে। কয়েকমাস নিরুপদ্রব দিনযাত্রা চলবে। আবার হয়তো ডাক আসবে। স্বামী বিমনা মনে চলে যাবেন কলকাতার বাইরে। শ্রীমতী কলকাতায়ই পিত্রালয়ে থাকবে।

বন্ধুরা বলে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি যাও না কেন শ্রীমতী? ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট নেই। একা মানুষ, কত জায়গা দেখতে পার। তাছাড়া অমুকবাবু একা একা ঘোরেন। সেটা কি ভাল?

শ্রীমতীর সুন্দর চোখ দুটিতে বিষাদ ছায়া ফেলে। চুপ করে থাকে সে। মা একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন শ্রীমতীর লিভারটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। অনিয়ম তো ওর সহ্য হয় না।

ডাক্তারবাবু দেখতে আসেন। নীল চাদর ঢাকা বিছানায় শুয়ে থাকে বিরহিণী। একখানা হাত ঝুলে আছে, যেন কঙ্কণপরা কমনীয় মণিবন্ধ ভার বহন করতে পারছে না। অনামিকার চুনির আংটিটি একটুও ঢিলে হয় নি।

যদিও অনামিকার চুনির আংটিটি একটুও ঢিলে হয় নি তবু ঔষধের প্রেসক্রিপশন লেখা হয়। মিষ্টি সুস্বাদু ঔষধ। শক্ত সমর্থ ডাক্তারবাবু লোভী দৃষ্টিতে অবসন্ন তন্বীদেহের দিকে চান। রুক্ষ গলা মোলায়েম করবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামী এখানে নেই?

ক্ষীণস্বরে উত্তর হয়, তিনি ট্যুরে গেছেন। ডাক্তারবাবু মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলেন। মনে মনে হা-হুতাশ করে গাড়িতে ওঠেন।

দিন কাটে না আর। পাশের বাড়ির তরুণ স্তাবক অর্জি বিদেশে চলে গেছে। কাজ নেই, কর্ম নেই। শ্রীমতীর মন উড়ুউড়ু করে, হুহু করে।

তবু ভাবতে পারে না স্বামীর সঙ্গিনী হবার কথা। পাহাড়ের পথে হাঁটা, অস্নাত থাকা। রং পুড়ে ছাই হয়ে যায়! কোমল মুখ চোখ্ কঠোর হয়ে ওঠে। ত্রিশ বৎসর বয়সেও যে পেলব লাবণ্য শ্রীমতীর বিশেষত্ব, কোথায় চলে যায় সে লাবণ্য। তা ছাড়া নিত্য রজনী পুরুষের ভোগ্য হওয়া সত্যই পোষায় না। বয়স হয়ে যাচ্ছে, এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। বন্ধ্যাত্ব শ্রীমতীর বর। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। কোনরূপ চিকিৎসা সে করতে চায় না। চায় না রাতারাতি জননীত্ব লাভ করে ধন্য হতে।

ভ্রাতৃবধূদের দেখে গা সিরসির করে ওঠে তার। বুক ঢুকে গেছে পিঠে, ঢিলে হয়েছে পেশীর বন্ধন। ছিমছাম পোশাক রাখা যায় না। ছোট শিশুদের লালন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে হয়।

চব্বিশ বছরে বিবাহ হয়েছে শ্রীমতীর। কন্যার শালীন বিলাসিতা দেখে মাতাপিতা চিন্তিত হতেন। ভাগ্যক্রমে জামাতা হয়েছেন মনোমত। একমাত্র কন্যা, অতি আদরের। বিবাহিতা হলেও মাঝে মাঝে রাখা যায় কাছে। জামাতা ব্যবহার করেন—স্ত্রী যেন মহামূল্য কাচের পুতুল।

কুমারী জীবনের রুচি নিঃসন্দেহে রক্ষা করতে পেরেছে শ্রীমতী। বিবাহটাই সহ্য করা কঠিন তার পক্ষে, বড় কঠিন। সারা জীবন কৌমার্য-মোহের পরিমণ্ডল রচনা করে যদি সে থাকতে পারত। যদি সন্ধ্যার সময়ে পুরুষালী ভিড় ও স্তবগুঞ্জন সহ্য করে, মাঝে মাঝে দেহের সীমানায় নেমে এসে ঊর্ধ্বের মানসী হয়ে থাকত সে! কেন এমন ভুল করে ফেলল হঠাৎ?

বড়লোকের ছেলে, সচ্চরিত্র, বড় চাকুরে, বিদ্বান। এইটুকু মাত্র দেখে দিয়েছিল। অসার্থক প্রণয় একটা ঘটেছিল তখন শ্রীমতীর জীবনে, অখিল বসু। মরিয়া হয়ে মা-বাবার মতে মত দিয়ে মরছে এখন শ্রীমতী।

তবু রক্ষা এই ছুটিটুকু আছে বিবাহিত জীবনেও। wife's holiday! স্বামীর মুখ চেয়ে এটুকু বর্জন করলে বাঁচা যায় না। বন্ধুরা যা বলে বলুক, মাঠে ঘাটে এত বয়সে ঘোরা শ্রীমতীর পোষাবে না। ভালই হয়েছে স্বামীর

ভ্রাম্যমাণ কাজ হয়ে। তা না হলে দেহ ও মনের এমন অবকাশ মিলবার সুযোগ থাকত না।

পার্ল বাক্ 'Pavilion of Woman' বইতে চরম সত্য কথা লিখে গেছেন—চল্লিশ বছরের নায়িকা স্বামীর কাছ থেকে ছুটি চাইলেন পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করে। অবশ্য স্বামীর জন্য বেশ সহৃদয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন একটি রক্ষিতা নিজে সংগ্রহ করে দিয়ে; শুধু তাই নয়, স্বামীর মনোমতরূপে গড়ে দিয়েছিলেন তাকে।

এই অদ্ভুত নায়িকার মর্মবাণী কি? নির্লিপ্ততা বা উদারতা কোনটাই নয়—প্রেমহীনতা। প্রেমের বেদ কামনা। প্রেম করা নির্লিপ্ত দেহমনে অসহ্য লাগে।

স্বামীকে সত্যই ভালবাসতে পারিনি—শ্রীমতী ভাবছে বিনা প্রস্তুতিতে নরনারীর সম্পর্ক স্থাপনা। তারপরে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য। কারণ আকাশের রামধনু যে প্রেম, সে তো ফুটবার আগেই আমরা চাই মেঘ, চাই বর্ষণ।

যারা এসেছিল জীবনে তার, পাখির মত লঘু ডানায় আকাশ ছেয়ে ছিল; আজ তারা নেই। তবু আসে মাঝে মাঝে কোথা থেকে উড়ে বিদেশী পাখি? গানে গানে ভরে যায় দিন শ্রীমতীর।

মনের এ-হেন অবস্থায় দেখা হল পাশের বাড়ির বিবাহিতা কন্যা মনোরমার সঙ্গে। বিবাহ করেছে সে মনোনীতকে, বাড়ির মত অগ্রা[illegible] করে। কাছাকাছি তার শ্বশুর বাড়ি। কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসে।

শ্রীমতীর একজন নারী-ভক্ত মনোরমা। শ্রীমতাদির সব কিছুই ভাল—মত পোষণ যারা করে, তাদের একজন মনোরমা। অবশ্য শ্রীর কৃপাদৃষ্টি কোনদিনই তার ওপরে পড়ে নি।

দুটি সন্তান হয়েছে মনোরমার। স্বাস্থ্যটি গেছে, হয়তো বা জন্মের মত। গৃহস্থ বাড়িতে ঘরের বউ-এর বিশেষ যত্ন সম্ভবপর নয়। অথচ সম্পন্ন পিতৃগৃহে বিশেষভাবেই মনোরমা মানুষ হয়েছে। একদিন আদর ছিল তার, আজ শ্বশুরালয়ে হয়েছে হতাদর।

পাতলা চেহারা মনোরমার। প্রাক্-বিবাহযুগে ছিল তন্বী, এখন হয়েছে হ্যাংলা। বড় বড় চোখের দৃষ্টি ধৈর্যে করুণ। স্বাস্থ্যহীন দেহে ঠোঁট দুখানি চোখে লাগে স্ফীত ও আরক্ত বলে।

গান গায় সময় পেলে, বিয়ের আগে গাইয়ে মেয়ে ছিল।

এই মেয়েটি কিছুদিন যাবৎ শ্রীমতীকে ক্রমাগত তোয়াজ করছে একদিন তার বাড়ি নিয়ে যাবে বলে। শ্রীমতীর গতায়াত মনোরমার পিত্রালয়ে আছে। মনোরমা চায় শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যেতে শ্রীমতীকে। গর্ব করে দেখাতে চায় ননদকে, জাকে—এমন সুন্দরী একজন মহিয়সী শ্রীমতী মৈত্র ভালবাসেন মনোরমাকে। পিত্রালয়ের আভিজাত্য যেমন বধূদের গৌরবের বস্তু, তেমনি গর্বের বস্তু অভিজাত বন্ধু।

ফলে, মনোরমার পীড়াপীড়িতে অধীর হয়ে উঠল শ্রীমতী।

প্রথম মনোরমার সঙ্গে দেখার দিন মনে পড়ে গেল! সদ্য বিবাহ হয়েছে শ্রীমতীর। সর্বভারতীয় সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কয়েক মাস আগে স্বর্ণপদক পেয়েছে ও। পাড়ার মেয়েদের একটি ক্লাবে তাকে সভানেত্রী করে নেওয়া হল।

সেদিন মনোরমাকে অনিবার্যরূপে বারে বারে তার চোখে পড়ছিল। গান গাইছে কে, উদ্বোধনী সঙ্গীত? মনোরমা। গানের দলে নেতৃত্ব করছে কে? মনোরমা। মেয়েদের ব্যায়ামে কম্যাণ্ড দিচ্ছে কে? মনোরমা। দৌড়ে এসে প্রেসিডেণ্টকে বসানো, তক্ষুনি আবার ছোট মেয়েদের নাচের নির্দেশ দেওয়া, বয়স্থা মহিলাদের কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া সেই একটি মেয়েই একা করে যাচ্ছিল। সমস্ত উৎসব-ক্ষেত্রে সে ছিল সচল দীপশিখা।

তারপরে জানা গেল দীপশিখা থাকে বাড়ির কাছে। কখনও দুটো একটা গানও দেখিয়ে নিয়ে যেত শ্রীমতীর কাছ থেকে।

তারপর প্রেমে পড়ল দীপশিখা। নিজের চেয়ে অনেক নীচু ঘরের ছেলে। অনেক বাধার পর বিবাহ হল। লুচি-কালিয়ায় ভরা পেটে আশীর্বাদ করে এসেছিল শ্রীমতী। তার পরের তিন চার বছরের মধ্যেই সচল দীপশিখা হল কালিঝুলি মাখা অচল কুপি। হঁ্যা, কেরোসিনের টিমটিমে কুপি একটা মিটমিট করে জ্বলছে। ভয় হয়, পথের মধ্যেই নিবে না যায়।

কেন যে মনোরমা প্রেমে পড়ল? হয়ত কত কি কাজ ও করতে পারত! সার্থকতা খুঁজে পেত। তা-না, মরি-বাঁচি ভাবে শেষে সেই প্রেমই প্রতিপাদ্য হল ওর জীবনে। আর কিছু নয়? প্রেম মানে কি? অযোগ্যের প্রেমে আত্মবিলোপ। নীতি-কাহিনী হয়, জীবন-দেবতা আর খুশী হন না। হালের বাস্তবতা যে তাঁকেও স্পর্শ করেছে।

কেন যে প্রেমে পড়ে মেয়েরা, কেন যে আবার আমি পড়ছি না? হলফ করে বলতে পারি, যদি বিয়ে না হয়ে যেত, শুধু আলাপ হত, তাহলে আমি প্রেমে পড়তাম এই স্বামীরই। জীবনটা কত সহজ হয়ে যেত।

নিঃশ্বাস পড়ল আবার শ্রীমতীর। কিন্তু আপাতত কি করা যায়? কুপি ছাড়ছে না, নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবেই ও।

এ বাড়িতে তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়—অতদূরে যাবার দরকার কি? আমি তো প্রায়ই এসে থাকি, তুমিও আসা-যাওয়া কর। আবার তোমার শ্বশুর বাড়ি যাবার দরকার কি? ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ করেছিল শ্রীমতী।

মনোরমা সবেগে বলে উঠেছিল, না না, শ্রীমতীদি, আমার বাড়িতে নেবই আপনাকে। যেতেই হবে। গরীব বোন বলে কি বড়লোক দিদি যাবেন না?

অকাট্য আবেদন। বিরক্ত হয়ে শ্রীমতী প্রতিবাদে নিরস্ত হয়েছিল।

সেই জোরে যখন গতকাল মনোরমা এসে বলল, কাল কিন্তু যেতেই হবে, শ্রীমতীদি। উনি এসে নিয়ে যাবেন আপনাকে।

শ্রীমতী নানা অজুহাত দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে নিরস্ত হল। নিরুপায় ক্রোধে গা জলে যাচ্ছিল ওর।

সারাটা দিন অশান্তিতে কাটল শ্রীমতীর। চেনা নেই, শোনা নেই, বেহালার এক অখ্যাতনামা বাড়িতে যাবার দায়িত্ব এত লোক থাকতে তার স্কন্ধে পড়ে কেন? মধুর ব্যবহার শ্রীমতীর। সামান্য পরিচয়েও অন্তরঙ্গতার দাবি করে বসে পরিচিতেরা। কোন মেয়ের শ্বশুর বাড়ি বড়াইবুড়ি সেজে গোটা একটা সন্ধ্যা নষ্ট হোক আর কি।

আয়াস আমি পছন্দ করি না, অনায়াস আমার জীবনের মটো। তবু কি এই ধরনের অবাঞ্ছিত কাজ করতে হবে। সন্ধ্যায় নিয়মিত কেউ না কেউ স্তাবক আসে। বসবার ঘরে ঘষা কাচের আলোর নীচে সভা জমে ওঠে। রজনীগন্ধার সৌরভে উতলা হয় রাত্রি। এক একটা দিন আমার সঙ্কল্প। অতর্কিতে কারুর অধরোষ্ঠ থেকে ঝরে হয়তো পড়বে কোন বাণী, সেই কথা, যা এক মুহূর্তে আমার অনন্ত আলস্যকে শক্তি-সাধনায় রূপান্তরিত করে তুলবে। আমার যে দিন নেই। মেয়েরা বোঝে না কেন আমার যে দিন নেই। তাদের সঙ্গেই যে জীবন কাটাচ্ছি। ষোল পর্যন্ত ছিলাম প্রমীলার রাজ্যে, কারণ পুরুষ থাকলেও আমাকে নারী মনে করে নি। তারপর ক্ষণ অভ্যুদয়—চিত্রাঙ্গদার বিজয়। আমার বিবাহের পর নারীমণ্ডল চাইছে

গ্রাস করতে। শাশুড়ী, জা-ননদ ইত্যাদিরা প্রকাণ্ড থাবা বসায় সময়ের থলিতে। পিত্রালয়ে মা মাসী-বউদি-পিসী লালায়িত হয়ে ওঠেন—দাও, দাও, আমাদের দাও তোমার সময়।

স্বামী আছেন—তাঁর করগ্রাসে কমনীয়তা শ্রীমতীর অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। রজনীর মোহিনী নয়, শয়নের সঙ্গিনী। এই ছুটির দিনটা হলি-ডে শ্রীমতীর। এখনও কি কর্তব্য করতে হবে? হেসে কথা বলেছি বলেই কি খানা-খন্দ ভেঙে তার শ্বশুরবাড়ি ছুটতে হবে। আমার সঙ্গে আলাপ আছে এই গৌরব দেখাতে হবে তাকে। তাই আমাকে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মাস্টারনী-ননদ, কেরানী-ভাসুরের সঙ্গে বাজার দর আলোচনা করতে হবে? আমার একটি দুর্লভ সন্ধ্যা বন্ধ্যা করে দিতে হবে একজন মেয়েকে, যার ওপর আমার কোন আকর্ষণ নেই? যার মেয়েত্ব আমাকে পীড়া দেয় মাত্র?

আমার যে দিন নেই। আজও জীবনে সঞ্চয় পেলাম না। স্বামী আছেন। দেহের প্রয়োজন মেটে। কিন্তু চির ক্ষুধার্ত মন হাত প্রসারণ করে আছে। এক মুহূর্ত বৃথায় কেটে যেতে দিতে পারি না আমি। কে জানে কখন ডাক আসবে?

স্বপ্ন দেখল শ্রীমতী, দিবানিদ্রার স্বপ্ন। দিব্যি মোটাসোটা বছর চল্লিশের প্রৌঢ়া একজন। চওড়া লালপাড় সাদা শাড়ি, ঢিলে সেমিজ পড়ে বিছানায় গড়াচ্ছেন। সামনের কয়েকটা দাঁত বাঁধানো, মুখে পান জরদা। তাঁকে ঘিরে গাদা গাদা মেয়ে। একটিও পুরুষ নেই। মেয়েরা বলছে, আমার স্বামীর একটা কাজ করে দিন। আমার দিন চলে না কিছু টাকা ধার চাই, আমার গানের গলা আছে, শেখা হচ্ছে না, একটু গান শেখান, আমার মেয়ের পড়াটা একটু বলে দেবেন, পাঠিয়ে দেব। ইত্যাদি বহু কাজের কথা।

কে এই প্রৌঢ়া? চমকে উঠল শ্রীমতী—এ যে সে! হায়, হায়, এই কি তার পরিণতি, অ্যা? সে তন্বী তরুণী গেল কোথায়? কোথায় গেল শ্রীযুক্তা শ্রীমতী? দিনেরাত্রে চাওয়ার থাবা বসিয়ে বসিয়ে মেয়েরা তাকে এখানে নামিয়েছে। অতএব মহিলাদের বর্জন। নারী লতার মত শুধু পুরুষসহকারে আশ্রয় নেয় না। আশ্রয় নেওয়া তার ধর্ম। শক্ত লতার গায়েই লতিয়ে ওঠে। সাহায্য করলেই চাই। সময় একটু দিলেই রক্ষা নেই। পুরুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ওরাই নারীকে ঘিরে রাখে নিজেদের মধ্যে। দেখতে দেখতে সে মেয়ে ফুরিয়ে যায়।

ওগো তিরিশের খুকী, ভাবছ কি? দশ বছর পরেই তো ওই দশা হবে। সুতরাং দিনরাতকে বসে ভরে তোল যথাসাধ্য। যা পাও নি, এখন আর পাবে কি? সময় নষ্ট করো না গো।

ঘুম ভেঙে বিরস চিত্তে বিছানায় বসল শ্রীমতী। না, সে তো ঠিক আছে। সেই কমনীয় কান্তি, ললিত পেলবতা। যেতেই যখন হবে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বেশ-সংস্কারে মন দিল শ্রীমতী।

আমাকে নিয়ে যাওয়া সস্তা বাহাদুরির লোভ ছাড়া কিছু নয়। কঠিন মুখে সাজ করল শ্রীমতী। সাদা সিফন, সাদা মুক্তাগার। কি বা খাব ওখানে? কড়াপাকের দুটো সন্দেশ ও কমলালেবুর শরবত খেয়ে নিল।

মনোরমার স্বামী এল নিতে। শ্রীমতীর গাড়ি 'লিঙ্কনে' বসল উঠে। চলল বেহালা অভিমুখে অনিচ্ছুক অতিথি। মনোরমার মনোনীত সস্তা আলাপে বাজার মাত করবার চেষ্টা করলেন পথে। বয়সের গাছ পাথর নেই; অথচ শ্রীমতীকে 'দিদি' ডেকে ন্যাকামি দেখ। মনোরমার আর যা হোক ন্যাকামি নেই। গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা মনোরমার স্বামীর। এমন একটি ধুরন্ধরকে ভালবেসে বিবাহ করে দারিদ্র্য ও দুঃখ বরণ করবার মানে বোঝে না শ্রীমতী। দায়সারা সংক্ষিপ্ত কথা বলে গাড়ির এক কোণে শ্রীমতী চুপ করে বসে রইল।

বেহালায় সারি সারি নূতন বাড়ি হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন কলোনীতে আনকোরা নূতন গৃহপুঞ্জ। কোনটা শেষ হয়েছে, রং পড়েছে, অথচ দরজা জানলা বর্ণহীন। কোনটা বালির আস্তরণে শেষ, কোনটা অর্ধেক তৈরি।

একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ। শ্রীমতী কুঞ্চিত ললাটে কাঁচা নর্দমা বাঁচিয়ে ভেলভেটের চটি-পরা পা ফেলল।

দরজার কাছেই সবিনয়ে প্রতীক্ষা করছিল মনোরমা। হঠাৎ তাকে যেন চিনতে পারল না শ্রীমতী। বধূসুলভ লজ্জায় মাথায় উঠেছে শান্তিপুরী শাড়ির আঁচল। কপালে বড় করে সিন্দুরের টিপ, খালি পা, সব কিছুতেই লেখা আছে এটা তার শ্বশুর পরিবেশ। মিটমিটে কুপি বটে, যেন শিখাটা উস্কে দেওয়া হয়েছে।

এত করেও শ্বশুর বাড়ির মন পেল না বেচারী। সম্মানিতা অতিথি রূপে বাড়ির ভাল ঘরটিতে বসতে বসতে মনোরমার গার্হস্থ্য জীবনের ভুলে থাকা

কথাগুলো মনে পড়ে যেতে লাগল শ্রীমতীর। এতদিন এসব কথা ভাববার অবকাশ পায় নি সে নিজের ছোট জগতে ডুবে থেকে। এখন ভেবে দেখল, মনের কোণে মনোরমার কথা চাপা ছিল। সময় ও সুযোগ পেয়ে বার হয়ে এল। কিছুই হারায় না মনের কাছে।

প্রেমের বিবাহ। দোষ পড়ল বউ বেচারীর ঘাড়ে। নবনীত মনোনীতকে ভুলিয়ে নেবার জন্য; আজন্ম দাসত্ব হাতের লৌহ বলয়ে বরণ করে মুখ বুজে কলেজের পড়া ছেড়ে রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দেবার জন্য; বড় বাড়ি ছেড়ে কাঁচা রাস্তার কদর্যতাকে আশ্রয় করে স্বাধীনতা, আনন্দ বিসর্জন দেবার জন্য বিনে পয়সার ঝি—বামনী—বারমাস পাবার জন্য।

মনোরমা সুন্দরী, মনোরমা শিক্ষিতা, মনোরমা বর্ধিষ্ণু ঘরের মেয়ে। তার অপরাধ, শ্বশুর-শাশুড়ী স্বজন-সমভিব্যাহারে দশবার মেয়ে দেখে, দশখানা মিষ্টান্ন আকণ্ঠ গিলে, বহুবার দর দস্তুর করে বিবাহ ঠিক করবার অবকাশ পেলেন না কেন? বেহায়া ছেলে কোথাকার একটা ধিঙ্গী এনে ফেলল! বাবা, ধন্যি মেয়ে! মায়ের পেট থেকে পড়েই আচ্ছা ছেলে ধরা শিখেছে মেয়ে! হবে না? লেকের পাড়ের বেপরোয়া সব। নির্লজ্জের ধাড়ী। গিলে খেতে চায়, চিবানোর সবুর সয় না, দেখ। আবার বাপের কাণ্ড দেখ। নগদে একটি পয়সা ঠেকাল না। অথচ খাট আলমারি টেবিলে ছোট বাড়িখানা ভরতি করে দিল। দে না দুপাঁচ হাজার নগদে, বুঝি মেকদার। গ্রাজুয়েট পাত্র, চাকুরি করছে। এমন নিজের বাড়ি রয়েছে। পাঁচ হাজার নগদে কি চেষ্টা করলে আমরা পেতুম না?

রাজ্যের শাড়ি দিয়ে পয়সা নষ্ট করেছে। সোনা দেবার বেলায় সোনাগাঁথা কখানি মাত্তর। আ মরণ, গেরস্ত বাড়ির বউ এত শাড়ি জামা দিয়ে করবে কি?

আহা, ভাবখানা দেখ! ভাসুর বাড়ি থাকতে আবার গান ধরা চাই সুন্দরীর। চোখ উল্টে অমন নাকী সুরের গান না ছাই, করে লাভ কি? তবু যদি এক আধখানা কেত্তন জানত!

এদের মন জোগাবার দুরূহ সাধনা মনোরমার। নইলে—মনোরমার স্বামীর নাম ভুলে গেছে—শ্রীমতী-মনোনীত বলেই ভাবে তাকে। মনোরমার মনোনীত। নইলে—মনোনীতের যে দুঃখ হবে।

বিরক্তিতে শ্রীমতীর মন বিষিয়ে উঠল। জা, ননদ ও বাড়ির মেয়েরা ঘিরে

বসেছে শ্রীমতীকে। মনোরমা অল্প সল্প কথা বলছে। শ্রীমতীদি যে দয়া করে তার বাড়ি এসেছেন, তাতেই সে ধন্য। এর বেশি চাওয়ার বুঝি কিছু ছিল না তার।

আবার অনিবার্যরূপে মহিলা-মণ্ডলী। কি দিতে পারে এরা শ্রীমতীর মত মোহিনীকে? শ্রীমতীর শিল্পী মনের যে ক্ষণে ক্ষণে অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে, সে অনুপ্রেরণা কে দেবে তাকে?

মনোরমা চা করে আনল। আয়োজন দেখে শ্রীমতী অবাক। যত রকম খাবার জানে ও, বোধহয় সবই করেছে, একদিনে নিশ্চয় নয়, দু'তিন দিন ধরে। নারকেলের নাড়ু থেকে ডিমের কচুরি। কড়াপাকের সন্দেশ আর কমলায় ভারাক্রান্ত শ্রীমতীর পাকস্থলী আর্তনাদ করে উঠল।

মনোরমা সমস্ত খাবার এমন করে খাওয়াতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যেন ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে শ্রীমতীর আহারের ওপর। অতি কষ্টে ওর হাত এড়িয়েও যা জোর করে গলাধঃকরণ করতে হল, তার প্রভাবে শ্রীমতীর অতিভোজনের ফলে গা গুলোতে লাগল। মনে মনে বাড়ি থেকে খেয়ে আসবার অবিমৃষ্যকারিতায় সে নিজেকে ধিক্কার দিল। মিঠে পান সযত্নে গুছিয়ে দিয়ে এতক্ষণে কাছে বসল মনোরমা। হাতে একখানা পাখা তার। বাড়িতে বিজলী থাকলেও পাখা ঘোরায় নি।

অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল শ্রীমতীর। বউ-এর ওপরে যে এরা বেশ প্রসন্ন নন, সেটা বুঝে নিয়েছিল সে, আগের শ্রুতি মিলিয়ে মিলিয়ে। এ.. পরিবেশের অপ্রীতিকরতা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, একটা গান কর না মনোরমা। অনেক দিন তোমার গান শুনি নি। মনোরমা অপ্রতিভ মুখ নামিয়ে বলল, কি আর গান আমি আপনার কাছে করব শ্রীমতীদি? তা ছাড়া অভ্যেস নেই তেমন।

বড় জা সম্মানিতা অতিথির সম্মুখে দরদ দেখালেন, কর না গান একটা মেজোবউ, আর তুমি তো ভাল গানই গাও।

অতএব আনা হল যন্ত্র। তক্তপোশে পা গুটিয়ে বসল মনোরমা। কি গান গাইবে সে বিষয়ে শাশুড়ী-জা নির্দেশ দিলেন।

আজ কিন্তু মনোরমা কথা শুনল না; বলল, আমার একখানা গান গাইতে ইচ্ছা করছে—সেটাই গাই।

জীবন যখন শুকায়ে যায়—করুণাধারায় এস। প্রকৃত গায়িকা ছিল

সে। মুখের প্রতি রেখায় কণ্ঠ-কম্পনে ফুটে উঠল শিল্পীর পরিচয়। আত্মবিস্মৃত মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে ভাবল শ্রীমতী, সত্যই গান ভাল গায় ও। অন্তর ওর সুরকে স্পর্শ করে, শুধু কণ্ঠ নয়। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট মুখে ওর ফুটে উঠেছে অনির্বচনীয় লাবণ্য, যেন অনেক পেয়েছে সে। কিন্তু কি পেয়েছে মনোরমা? কি দিয়েছে মনোরমা? দেবারও তো অনেক ছিল।

সঙ্গীত অন্তে বিদায় নিল শ্রীমতী। সন্ধ্যাটা কাটল বৃথা। কি আর করা যায়!

সকলের অগোচরে যাবার সময় কাছে সরে এল মনোরমা, সকলের অগোচরে বলল, আজকের গান কিন্তু আমি আপনার জন্যই গাইলাম—আপনি ওইরকম—আমার শুকনো জীবনে আপনাকে আমার অমনি করুণাধারা বলেই মনে হয়। শ্রীমতীদি একবার কাছে এসে, জানেন না আমাকে কত দিয়ে যান আপনি।

এক মুহূর্তে শ্রীমতীর বন্ধ্যা সন্ধ্যা অপরূপ এক উপলব্ধিতে ভরে উঠল। নিজের ছোট জগতে তুচ্ছ মানসিক বিলাস নিয়ে মগ্ন ছিল সে। প্রকৃত বেদনা সে জীবনে জানে না। শখের বিরহ তার, শখের হুতাশ।

সম্মুখের ব্যক্তিটি কিশলয় তুল্য তরুণ স্তাবক, কি সংসার ভারক্লিষ্টা অকাল প্রৌঢ়া একটি তরুণী এ বোধ লুপ্ত হয়ে গেল। বন্ধ্যা সন্ধ্যা মাধুর্যে অবগাহন করে এল। ঘনীভূত রাত্রি আজ বিফল প্রত্যাশা নিয়ে আসছে না। আছে আজকের বুকে শ্রীমতীর পরম সঞ্চয়। উপলব্ধিই একমাত্র মানদণ্ড, পাত্র পাত্রী গৌণ। যে দিতে জানে। সে বেদনার মধ্যেও দিতে পারে, নিতে পারে।

জীবনে কেউ শ্রীমতীকে এমন করে বলে নি।

তারপরে

আমার আকাশে অনেক—অনেক মেঘ জমেছে। ভেসে ভেসে আসছে তারা দৃষ্টির সীমানায়। আমার গল্প যতটুকু সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র চায়, অনেক পথ ছেড়ে যে প্রান্তসীমায় সে তার ভীরু মিনতিটুকু পাঠায়, সেখানেও যে মেঘ জমেছে!

দোতুল মেঘের অশ্রু ঝরে পড়ছে—কাঁদছে মেঘ। ঝাপসা হয়ে উঠছে দু'খানা কাচ এই আহত নগরীর দুই কোণে। দুখানা কাচ, উত্তর ও দক্ষিণে। দু'খানা আয়না মাত্র।

দু'খানা আয়নায় দু'জনের ছায়া পড়েছে একই সময়ে। কিন্তু, হায়, সঙ্গে যে মেঘেরও ছায়া দেখছি আমি। কখনও বৃষ্টির অস্পষ্ট কুয়াশা।

উজ্জ্বল বিদ্যুতে আলোকিত প্রসাধন-টেবিলের তিনধারে আয়না। আয়নার উপরে আলো জ্বলছে—মুখের ওপর পড়ছে আলো। অবশ্যই এমন টেবিল কোন রমণীর, অবশ্যই তিনি প্রসাধনপ্রিয়া। কিন্তু চোখের নীচে ওই কুঞ্চনলেখা, শুষ্কচর্ম কপোল, চিবুকের শিথিলতা বলে দেয় উনি বিগতযৌবনা। দুই বিন্দু বৃষ্টি আয়নার কাচে ঝরে পড়ে।

অন্যদিকে সরে যায় মেঘ—দেয়ালে টাঙানো একখানা হাত-আয়না। ছায়া পড়েছে একটি মুখের—সুন্দর যৌবনমণ্ডিত মুখ একখানা। তরুণ যুবকের মুখ। কিন্তু, সেখানেও মেঘের ছায়া।

তার বয়স পঞ্চাশের কাছে, ঠিক আমি জানি না। শুধু জানি তার বিচিত্র জীবনের কতকগুলি বিচিত্র বৎসর। কয়েকটি ঘটনার আভাস জানি, জানি কিছু অভিজ্ঞতা। তোমাকে তাই শোনাই, এস।

হাঁা, উনি চিত্রতারকা, তাই এত বয়সে এত প্রসাধন-চাতুর্য ওঁর। পূর্বে বহু অমর কাহিনীর অমরী নায়িকা। আজ সে হতশ্রী-বিলুপ্তির পূর্বের অবস্থা। নায়িকার ভূমিকায় শেষ হয়ে গেল অভিনয় তার—দূরাভিসারিকার দরজায় বন্ধুর রথ থামার পূর্বেই বন্ধুর পথে থেমে গেল সে। সে আমার বিগতজীবনা উর্বশী। ভীনাসের মত সমুদ্র-উত্থিতা, বাসনার সমুদ্র। আজ নিভে যাবার পূর্বের কয়েকটি দিন তার। আহা!

প্রযোজকের সঙ্গে এখনও খাতির আছে। আছে সমাদর পরিচালকের কাছে। টাকা আসছে এখনও। রঙের অন্তরালে লুক্কায়িত মুখ। যৌবন সুদের কারবার শেষ করে দিয়েছে তার। আসল নিয়ে টানাটানি; হয়তো আর কিছুই পাওয়া যাবে না।

চিত্রা নাম তার ধরে নাও, চিত্র যখন ব্যঞ্জনা তার। চিত্রা, চিত্রা! মনের কানে কানে শোনা গান যেন। চিত্রা! চিত্রা! অনামিকায় ফিরোজার আংটি, ফিরোজা সূক্ষ্ম রেশম গায়ে। পায়ে সোনালী আধুনিক স্যাণ্ডেল—আর একটি অলঙ্কার যেন।

বারে বারে মুখে কত কি দিচ্ছে চিত্রা—কত আয়াস বলিচিহ্ন বিলুপ্তির। ফাউণ্ডেশন বা পাউডারে চলবে না। বার হল সোনালী বাক্সে 'Angle Face', বার হ'ল টিস্যু, বার হ'ল রুজের তুলী। বিরলকেশে নকলচুলের 'সুইচ' দিয়ে বাঁধল চিত্রা আধুনিক মুকুটের মত কবরী। বদলেই গেল সে প্রসাধনান্তে। কিন্তু, চোখের নীচে ওই যে বায়সপদলাঞ্ছিত দাগ--কিসে ঢাকবে তাকে?

বস্‌বার ঘরে দিনের আলো প্রবেশ করে না—ডবল নিননের পরদায় সমস্ত জানালা ঢাকা। আলোর সেখানে ঘসা কাচের মধ্য দিয়ে ক্ষীণদ্যুতি প্রকাশ। স্বামিনীর রূপে প্রেতচ্ছায়া ধরা পড়ে না। অনেক ব্যথার শেষে থাকে সহনশীলতা, অনেক রূপের ধ্বংস একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবার আগে দাঁড়ায় বুঝি কিছুক্ষণ। আমার চোখে যাকে বিগতা মনে হয়, কোন পরিচালক হয়তো এখনো তাঁকে বসন্তদেবী মনে করেন।

চিত্রা বিবাহিতা হয়েছিল নামতঃ। অত্যাচারী স্বামীর অত্যাচারের বাইরে চিত্রে আশ্রয় নিয়ে নাম বদলে নূতন জীবনে জেগেছে সে। ঘরে নেই রক্ষক। বাইরের ভক্ষক আসা বন্ধ হয় না। হ'লেও বহুক্ষেত্রে চিত্রার চলে না। অতএব চিত্রা স্বাধীনা।

কিন্তু, বড় যে একা লাগে। চল্লিশ পর্যন্ত চলেছিল। উদ্ধত যৌবন জয়পতাকার মাহাত্ম্যে অসামান্যা করেছিল নটীকে। চোখে-মুখে অপার্থিবতা লেখা ছিল, মাদকতা ছিল ভঙ্গীতে। শেষ হয়ে যাচ্ছে পদ্মিনীর মধু, মধুপ-গুঞ্জরণ থেমে গেল বুঝি। ওই ঘরের কোণের স্ট্যাচু, খেয়ালী শিল্পীর সৃষ্টিমাত্র যাকে অর্থ দিয়ে কিনে এনেছে চিত্রা, সে রইল অচপল যৌবনমণ্ডিতা, তেমনি শাশ্বতী, শুধু চিত্রার হ'ল পরিবর্তন?

একদা বৈষ্ণবজনোচিত ভূমিকায় কীর্তন কণ্ঠে প্রৌঢ়াবৃন্দকে কাঁদিয়েছিল চিত্রা। সেই গান মনে এল, মহাজনের পদ—

"অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব,
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গমাওব,
কি করব সে পিয়া নেহে ॥"

নবযৌবন কেটে গেল খ্যাতির বালুচরে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে। একের পর এক ছবি হচ্ছে। রিহার্সেল্, শুটিং আউট্‌ডোর্। গানের অভ্যাস করা। আর, রূপযৌবন বেঁধে রাখবার দুরন্ত প্রচেষ্টা।

এসেছে বৈত্ত জীবনে—ত্রস্ত পায়ে শয়নগৃহ থেকে বার হয়ে গেছে কোন পুরুষ ভোরবেলায়। কিন্তু, প্রেম? কোথায় সে? কোথায়?

ঝি খবর দিল, "যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনি এসেছেন।"

বসবার ঘরে আলো পিছনে রেখে বসল চিত্রা। আতিথ্যের আয়োজনে পরিতৃপ্ত যুবক রঞ্জন মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "আজ কয়েকটি নূতন কবিতা এনেছি।"

সুরু হয়ে গেল অভিনয়। প্রেক্ষাগৃহের ঘণ্টা বেজে উঠল, মঞ্চের পাদপ্রদীপ জ্বলল।

তরুণের প্রেমারতি—শ্রবণের মাধ্যমে। তরুণীকে নয়—প্রৌঢ়াকে। পরিস্থিতি মর্মান্তিক।

চিত্রার মুখে ফুটে উঠল মুগ্ধ বিস্ময়—একখানা হাত উঠে এল গালে—ঝুঁকে পড়ল চিবুক। 'প্রতিধ্বনি' ছবির নায়িকা সাজে যেমন ভঙ্গিতে সে প্রেমিকের গান শোনা দেখিয়েছিল। বহু প্রসাধন-বিধ্বস্ত মুখের কমনীয় রেখাগুলি জাগাতে চেয়ে চিত্রা জাগিয়ে তুলল রুক্ষতা—সাধারণী নারীর বহু অভ্যস্ত ভঙ্গিমা।

কবিতা পড়া হচ্ছে। বাইরে আর্তনাদ করছে উন্মত্ত প্রাবৃট, মেঘের ছায়া জানালার ডবল নিননকে আরও অন্ধকার করে তুলেছে। বৃষ্টিধারা আসছে সারা পৃথিবী ঢেকে। আবার দেশে বর্ষা নামল।

রঞ্জনের কণ্ঠে স্তুতি, ভাষায় স্তুতি। কোন সুন্দরী প্রতিভাকে সে কাব্যছন্দে বন্দনা করছে। তুমি মানুষী, কিন্তু দেহাতীত। স্বপ্নকে তুমি গড়ে তোল

শরীরের মাধ্যমে—দেহকে অতিক্রম করে তোমার প্রতিভা। হে চিরনারী, স্থিরযৌবনা, অনন্ত তোমার লীলাবিভ্রম। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ করো।

এমনি ঘটছে দিনের পর দিন। বেকার কবি চায় তার কাব্যের একজন পেট্রন। চিত্রাদেবীর দৃষ্টিপাত হ'লে হয়তো গান লিখবার কাজ পাওয়া যাবে সিনেমায়। আসবে অর্থ, আসবে খ্যাতি।

চিত্রাদেবীর আছে সামর্থ্য। এই বাড়ী, ওই গাড়ী সাক্ষ্য দেয়। এখনও প্রাচীরপত্র উচ্চকণ্ঠে লাল অক্ষরে নাম চিত্রার বলে দেয় নায়িকার ভূমিকায়! দরজায় থেমে থাকে হাম্‌বার্, বুইক, শেভ্‌রলে। টেলিফোনের তারে যাদের গলা চিত্রাকে ডাকে, তাদের দূর থেকে চেয়ে দেখে ধন্য হয় রঞ্জন মিত্র।

রঞ্জন মিত্র! মানসীর প্রয়োজন নেই তার, বহুদিনই মিটেছে। রান্নার হাত মুছে পাশের বাড়ীর বালিকা কবিতা শুনতে আসে রঞ্জনের। ডাগর চোখের কোনায় কাজল মাখানো, হাতে বাহারী কাচের চুড়ি, টাইট্‌জামার আধুনিকত্ব জানায় যে, শ্রীমতী পথেঘাটে বা'র হয়ে আধুনিক রীতিনীতি রপ্ত করেছেন।

ডাগর চোখে স্বপ্ন কত! "রঞ্জনদা, কি চমৎকার কবিতা যে আপনার। মনে হয়, অন্য দেশে চলে যাই।"

অমন সমঝদার মানসী যে, তার গায়ে নেই এককুটো সোনা। কেরাণী বাবার তৃতীয়া কন্যার ভাগ্যে কাঞ্চন জোটেনি। রঞ্জন চায় তাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে। যদি মাইডাসের স্বর্ণফলাবার বর পেত রঞ্জন মিত্র!

ওইখানে বসে আছেন যিনি তরুণীর সাজে, বৃদ্ধত্ব প্রায় তাঁকে গ্রাস করছে। তবু দুরন্ত বসন্ত এখনও পীড়ন করে পুষ্পশরে। তাই রঞ্জন সুযোগ পায়।

চিত্রা ধরা দিতে ব্যগ্র, বোঝে রঞ্জন। বিগতযৌবনার লোলুপতা যুবকের জন্য। আহারের আয়োজনে বিশেষ পারিপাট্য, আপ্যায়নে অতিমাধুর্য্য। প্রসাধনে ভীনাস লজ্জা পান। আর বোঝার বাকি নেই রঞ্জনের।

সারা মন যেন ঝুঁকে রয়েছে রঞ্জনের কবিতায়। চিত্রাদেবী ভাবছেন সব কবিতাই তাঁকে উদ্দেশ করে লেখা। তা কি সম্ভব? সর্বনাশ। একটা দুটো আদাজল খেয়ে লেখা যায়। বাকী সব মিনতির। ব্যাকুল প্রার্থনা মিনতিকে চেয়ে। ঘর বাঁধা চাই যে।

নিঃশ্বাস ফেলল রঞ্জন। মিনতিকে বিবাহ করা তার স্বপ্ন। কিন্তু, কি খাওয়ানো যায়? প্রণয় বিলাসে মন ভরতে পারে, কিন্তু পেট ত' ভরবে না।

সুতরাং সব কিছু অভিনয়েই প্রস্তুত আছে সে। দয়িতহীনা চুম্বনে মধু থাকলেও খাদ্যপ্রাণ থাকে না। শয়ন নিশ্চয় ঈপ্সিত বহুবল্লভার। বহুবল্লভার প্রণয়ীর অভিনয়েও? কিন্তু উপায় কি! তারপরে মানসী?

"তোমার তণিমার নবনীড়ে
একদা লভেছিনু অবনীরে।
নাই যে পরিমাণ কেমনে করি পান
জীবনমন্থন নবনীরে।"

স্বস্তি-সুখ আসবে আপনি। অভিনেত্রীর সঙ্গে সে আপাততঃ অভিনয় করবে। সুতরাং রঞ্জন অভিনয়ের মাত্রা চড়িয়ে দিল। আমার কাহিনীর এ অংশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলবে।

যাবার আগে আজ কিন্তু রঞ্জন মিত্র নীরবে চলে গেল না। অকথিত বাণী-ভারাকুল দৃষ্টি তুলে চিত্রার রঙীন মুখে তাকিয়ে আধো কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আমি জগতকে জানাতে চাই আপনি কী। আমার বড় ইচ্ছে হয় বোদ্ধা লোকের সামনে এ কবিতাগুলো শোনাই।"

চিত্রা নতমুখে বলল, "দেখা যাক।"

ডবল-নিননের ঘরের দৃশ্য এখানেই শেষ হ'ল। চিত্রা দোতালায় চলে এল। রাস্তা পার হয়ে বাস্‌স্টপে যাচ্ছে রঞ্জন দেখা গেল। চিত্রা জানালার আড়াল থেকে চেয়ে আছে।

কিন্তু, ওর পদক্ষেপে কি শ্রান্তি? কি ক্লান্তি দেহের গতিভঙ্গীতে? যুদ্ধশেষে সৈনিকের দারুণ শারীরিক গ্লানি যেন। চিত্রার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ডান হাত তুলে মাথার রগ চেপে ধরে রঞ্জন পার হ'ল রাস্তা। অপ্রীতিকর কর্তব্যঅন্তের গ্লানি।

চিত্রা ফিরে এল আয়নার সামনে। সমস্ত মুখে তারও যে লেখা রয়েছে ক্লান্তি। বড়, বড় ক্লান্ত চিত্রা। বড় ক্লান্ত।

দু'ধারেই ক্লান্তি। বয়সের সাহচর্যে তারুণ্যের ক্লান্তি। আবার তারুণ্যকে সহ্য করাই বয়সের শ্রান্তি।

এ অসহ্য। নির্বোধ, ব্যক্তিত্ববিহীন একটি ছোকরা। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঘুরছে শুধু। আজই তো দিব্যি প্রস্তাব দিয়ে বসল যে, লোক ডেকে আসর করে ওর কবিতা শোনানো উচিত। "শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্"। কিছুদিন পরে বিবাহবন্ধা তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে এসে ন্যাকামী করবে—"আপনার

প্রতিচ্ছায়া এরই মধ্যে পেলাম খুঁজে।" লাভের মধ্যে দামী একটা গহনা চিত্রার মুখ দেখতে বেরিয়ে যাবে।

তরুণের কথার পুঁজি কোথায়! বিরক্ত লাগে। এতক্ষণ সহ্য করা যায় না। তবু, প্রসাধনে বয়সকে চাপা দিয়ে বসে চিত্রা। তার যে glamour রাখা প্রয়োজন একান্ত। কোন তরুণ চিত্রাকে নিয়ে এখনও কবিতা লিখছে, চিত্রার জনমতের দাবী। নইলে, নায়িকা সাজার মত সাহস কোথায়?

চিরকাল কিন্তু আমি ভালবেসেছি একজনকে নয়, জনতাকে। তাদের মতামত, খ্যাতি-নিন্দাই ছিল আমার জীবনকে গড়ে তোলার মশলা। আমি মুগ্ধ করতে চেয়েছি জনতাকে। গাড়ী চড়ে যে আসে দরজায় তাকে নয়—অগণিত টম্-ডিক্-হ্যারীকে, পিট্ ও গ্যালারীকে। তাই আমার জীবনে প্রেম এল না। প্রেমের যে প্রয়োজন বিরাট বিস্তৃতির, প্রেম যে স্বার্থপর, সূচাগ্র ভূমি সে অন্যকে দেয় না। জনতার প্রেয়সীকে সে চায় না। সে চায় নিজের বাহুবন্ধনে করায়াত্তা একজন সাধারণ নারীকে। যে প্রতিভা ধরা দিতে জানে না একজন সাধারণ মানুষের কাছে, সে প্রতিভা প্রেম পায় না।

সত্যই, জনতার প্রেয়সী আমি। শুধু হ'তে চাইনি, হয়ে সুখী হয়েছি। এখনও অন্তিমপ্রচেষ্টা নিজের আসনের ধৃতিকল্পে। সারা জীবনে আমার জেলে রেখেছি অসংখ্য পাদপ্রদীপ—গৃহের প্রদীপটি শুধু জ্বলেনি।

মনে পড়ে গেল মিষ্টার মজুমদারের কথা—একজন বিপত্নীক প্রযোজক! নীরব প্রতীক্ষায় চিত্রার প্রতিটি চিত্রের রৌপ্য যুগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি চিত্রাকে দেখেন চিরযৌবনা আর্টমিসের রূপে। চিত্রার নায়িকা সাজায় বাধা পড়বে না যৌবন শেষ হয়ে গেলেও। তরুণ নন তিনি, তাঁর কাছে তরুণী সাজার পরিশ্রম করতে হ'বে না চিত্রাকে।

কিন্তু, জনতা? ওই ছায়ানা-দর্শনায় বসে থাকা কলেজ পালানো, উড়নচণ্ডী ছেলের পাল? ওই হাল্কাপরীর মত আধুনিকী তরুণীর দল? পিট ও গ্যালারী। প্রাণ দিয়ে চিত্রা যে তাদেরি চায়। তাদেরই মতামতে মূল্য অরোপ করেন স্বনামধন্যা চিত্রাদেবী। আর, তারা চিত্রার জীবনের দুরন্ত প্রেম।

প্রতিটি রূপসজ্জায় মনে হয়েছে এইরূপ জনতাকে কতখানি বিমুগ্ধ করবে? প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয় করেছে চিত্রা সাধারণের হৃদয়-

বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। প্রত্যেকটি গান চিত্রার পাগল করেছে জনতাকে।

আস্তে আস্তে চিত্রা চুল খুলতে লাগল। নৈশ-ভোজনের সময় হয়েছে, সময় হয়েছে বিছানার। তোয়ালে ও cleansing cream-এর সাহায্যে মুখ মুছে ফেলল।

আয়নায় ভীত-ত্রস্ত গতযৌবন একখানি মুখের ছায়া পড়ল। বিবর্ণ মুখে কোন বর্ণ নেই আর। মিষ্টার মজুমদার তাকে নায়িকা করলেও জনতা আর চাইবে না তাকে। প্রেতের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে চিত্রা।

তবে মিষ্টার মজুমদারকে বিবাহ? ঘরণী গৃহিণীর অভিনয়ে বাকী জীবনটি কাটিয়ে দেওয়া? অভিনেত্রীর পক্ষে কঠিন হ'বে না। এইমাত্র বিমুগ্ধা মানসীর অভিনয় সেরে এল চিত্রা। রঞ্জন ভেবেছে চিত্রার বড় ভালো লেগেছে। অসহ্য পীড়াদায়ক ছিল পরিস্থিতি।

কিন্তু, সারাজীবন কি অভিনয় করেই যাবে সে? যদি অভিনয়ই করে তবে জনতাকে ছেড়ে চিত্রা কি করে বাঁচে? অভিনয় রক্তে মিশেছে তার। অভিনয় তার রক্তমাংস, তার মজ্জা। বিবাহ পোষাবে না। প্রেম চায় না সে। সে চায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, উত্তাল জনতাকে।

বিবর্ণ রঙহীন মুখ। রঞ্জন মিত্রের মানসী হওয়া গেল না। নিজে অভিনেত্রী। অন্যের অভিনয় সহজেই ধরা পড়েছে চিত্রার চোখে। ধরা পড়ে গেল রঞ্জন, যে তারুণ্য সুবিধার আশায় হাড়কাঠে নিজের গলা এগিয়ে দিতে পারে।

চিত্রার চোখে জল আজ। সেই জলের ছোঁয়ায় বুঝি পূর্ণিমার আকাশে মেঘ। মানুষের মনের মালিন্যস্পর্শ আজ আমার দেশে মেঘ নেমেছে। যে বয়স নিজের মর্য্যাদা ভুলে যায়, যে যৌবন অভিনয় করে তাদের দেশে সূর্য অস্ত গেছে, চাঁদ ওঠেনি।

বিগত বসন্তদিনের বেদনায় আমার গতজীবনা উর্বশীর চোখে জল। আমি তার কণ্ঠের গান আবার শুনলাম—

"অঙ্কুর তপন— তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে?
সিন্ধু নিকটে কণ্ঠ শুকায়ব,
কে দূর করব পিপাসা?"

এই গান গ্রামাফোনে, রেডিওতে বাজছে—'রাধা উন্মাদিনী' চিত্রে চিত্রার গান। অগণিত প্রাণ এই গানের দোলায় দুলেছে। দুলেছে কোটি প্রাণে বিরহ-মিলনের ঝুলদোলা। অপার্থিব যে শক্তি দিয়ে জনতাকে বেঁধে রেখেছিল চিত্রা, সে শক্তি কি নিঃশেষ হয়ে যাবে? চিত্রা বাঁচবে কি নিয়ে? কি দিয়ে চিত্রা জনতাকে মুগ্ধ করবে আর?

হতাশাস্খলিত পদক্ষেপে আয়নার কাছ থেকে সরে এল চিত্রা। একখানি ছবির ওপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—বালগোপাল বিদায় নিচ্ছে যশোদার কাছ থেকে গোচারণে যাবে বলে। প্রসিদ্ধ চিত্রী ছবিখানি উপহার দিয়েছিলেন। চিত্রাকে দেবার পক্ষে অতি সরল চিত্র। কিন্তু, শিল্পী যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বালগোপাল-পুঞ্জ এঁকে।

হঠাৎ অভিনেত্রীর গলায় আগের কীর্তনের পূর্বাভাষ রূপে গান ধরা দিল। জন্ম অভিনেত্রীকে বাৎলাতে হ'ল না। একদা এসব পদ কীর্তনীয়া শিখিয়ে গিয়েছিলেন কর্তব্যপরায়ণভাবে। চিত্রার ভাল লাগেনি।

"এসব পদে আমার দরকার নেই"—বিরক্ত হয়েছিল চিত্রা কীর্তনীয়ার চন্দনলাঞ্ছিত ললাটে প্রশান্তি জেগে উঠল—"তা হোক মা, আমি আমার কাজ করে যাই। একদিন আপনার ভাল লাগবে। এখনও যে সময় হয়নি।"

সত্যই কি জনতাকে ধরে রাখা যায় কেবলমাত্র যৌবন দিয়ে? তাহ'লে, তাহ'লে শার্লি টেম্পল কেন আমেরিকার প্রাণাধিকা হয়েছিল? পূর্ণযৌবনা শার্লি কেন স্থানচ্যুতা হয়েছে? আছে, আরও অনেক আছে। লাস্য-বিভ্রমের উর্ধ্বে আর একটি জগৎ আছে।

কি হ'বে অভিনয়ে? সারাজীবনে ক্লান্তি এসেছে। তাছাড়া, জনতা অভিনয় চায় না—চায় জীবন। অভিনয়ে জীবন দেখাতে হয়। স্বাভাবিক, সহজ যা, তাই তুলে ধর।

বিগতযৌবনার এ তরুণীর অভিনয় কেন? বর্ণবিহীনা দাঁড়াক না প্রৌঢ়ত্ব নিয়ে। দেখুক না পরীক্ষা করে এখনও জনতাকে ধার রাখবার শক্তি আছে কি না?

মনে পড়ে গেল বৃদ্ধ কীর্তনীয়ার প্রশান্ত মুখ—"একদিন আপনার ভাল লাগবে এসব পদ, মা। ভবিষ্যতের জন্য আপনার গলায় মহাজনের এমন পদ রেখে গেলাম।"

সারামুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চিত্রার। বায়সপদচিহ্ন মিলিয়ে গেল কোমলতায়। সস্নেহ করুণতায় অপরূপ হয়ে উঠল প্রসাধনহীন, বিধ্বস্ত মুখ। ছবির দিকে তাকিয়ে জীবনে প্রথম যশোদার মিনতি চিত্রার কণ্ঠে ফুটে উঠল—

"আমার শপথি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি। ***
থাকিবে তরুর ছায়ে, মিনতি করিছে মায়ে,—
পরাণের পরাণ নীলমণি।"

আমার আকাশে মেঘ সরে গেল! আমার দেশে সূর্য উঠল।

———

বর্ষাবিজয়

এমন বর্ষায় বীজ রোপণ ও নানাবিধ চাষবাসের কাজ আয়ত্তাধীন সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু পাহাড়ি বর্ষার রূপের অন্য মুখও আছে। পুঞ্জীকৃত নীল মেঘ জমে ওঠে কুচি ফুলের, গুল্মপত্রের দেশে আকাশ-প্রত্যন্তে। সবুজে ঘনায় কাল অঞ্জন। লাল মাটি তৃষায় বিদীর্ণ—আকাশে স্বস্তি শুধু। দারুণ গ্রীষ্মের দহন-বহ্নির অন্তে আছে আকাশের দাক্ষিণ্য।

আজ তেমনি মেঘদূতের দেশে বর্ষারম্ভ দেখলাম। দেখলাম, বিস্তীর্ণ আকাশমণ্ডপে অনেকদিন পরে উন্মত্ত প্রাবৃট সমারোহ। বিগত-জীবনা বল্লরীর পত্র-গুণ্ঠন যে ঝঞ্ঝা অপসারিত করে তাকে উজ্জীবিত করবে, সে ওই নৈঋর্ত কোণে দেখা দিল। দেখা দিল আমের পল্লবিত আশ্রয়ে নীড়ভিক্ষু পাখীর দল।

এমন বর্ষা যে আমাকে নিয়ে যায় টেনে। অতীতের ঝড় ওঠে নিস্পন্দ বর্তমানের শিরায়-শিরায়। আমাকে ছিনিয়ে নেয় দুর্গসীমার বাইরে। বর্তমানের আশ্বাসের দুর্গ। প্রাবৃটসঙ্কুল পৃথিবী ভয়ের হাসি হাসে।

সেই পুরাতন বাড়িটি—টিলা পাহাড়ের রুক্ষ বুক ঘেঁষে, প্রণয়ভীতা প্রেয়সীর আত্মসমর্পণে। সেই খালের জল, যার যোগ পর্বতের আপাতসুপ্ত উৎসধারায়। ভুল হয়েছিল সেদিন নির্ঝরের ক্ষণসুপ্তিকে চিরন্তনী মনে করায়। যখন জাগে পাহাড়িয়া ঝরণা, সে হয় আত্মবিস্মৃত। চলার পথে তার উপলসঞ্চয় নূপুর-নিক্বনে খসে পড়ে সমতলের আলিঙ্গনে। গাছের বাধা ভেসে যায় গতির বেগে, ভেসে যায় মানুষের রচিত আশ্রয়কেন্দ্র। উন্মাদ সেই ধারার ধ্বংস-নৃত্য দেখেছিলাম একদিন।

বর্ষায় গাঁথা জীবন আমার, করুণের বীণায় বাজে। মধুরের অঙ্গুলি কখনও তন্ত্রীঘাত করে। বিষ ও মধুমেশা জীবন আমার। সম্পূর্ণ বর্জন বা গ্রহণ অসম্ভব। তাই সরু-মোটা দুই তারে জীবন-বীণা গ্রহণ করেছি প্রাণসরস্বতীর হাত থেকে। ভোলা, না-ভোলার পণ আমার! যাকে ভোলা যায় না, তাকে কি ক'রে দূরে সরাই? কাছে রাখা যে গোলাপ, তার কাঁটা কাঁদায়। তবু, গোলাপের সৌরভ যে ব্যথাজয়ী।

মনের আকাশে প্রাত্যহিক মেঘ-সমাগমের বর্ষণক্লান্ত নীরদমালায় ফুটে

ওঠে একখানি মুখ। জীবনের পরম আত্মীয়জন। আমার কনিষ্ঠতম অঙ্গুলি-প্রান্তেও তাঁরই রচনামাহাত্ম্য লেখা আছে। এই হাতের ক্ষীণ তন্তু পর্যন্ত যে শোণিত বহন করছে, তা-ও তাঁরই সৃষ্টি। ভোলা যে অস্তিত্বকে ভোলা।—আমার মা।

সে মূর্তির মুখবিম্ব স্নেহকোমল, বিহ্বল মাতৃত্বমণ্ডিত নয়। তীক্ষ্ণধী ললাটে ভ্রূকুঞ্চন, উচ্চ নাসিকায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর অধরসীমায় গোপন বাক্যনিগড় দৃষ্টিমাত্রে প্রতিভাত হয়।

ভোলা, না-ভোলার সংকল্প আমার বিগত দিনের স্মরণসম্ভার অবচেতনে সরিয়ে রাখে। অশ্রুব্যাকুল দিনের স্মৃতি লেখা হয় বর্ষা-চুম্বিত আকাশে, ধরিত্রীতে। পৃথিবীর মুখে মুমূর্ষু আলো লাগে।

এমন দিনে ফিরেছিলাম। পড়া শেষ হয়ে গেছে। ছাত্রী-আবাস আমার কাছে রুদ্ধ। বিহারী-চরিত্র, বাংলার আধিপত্য আমার গন্তব্যনিবাসে। মা থাকেন অনুচরবেষ্টিত বাংলোর নির্জনতায়।

এসেছিলাম কয়েক বার ছাত্রী-জীবনে। কয়েক বার বোর্ডিংবাসিনী কন্যার তত্ত্বাবধানে মা গিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই পরভৃত-ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম। পিতৃবিয়োগের পূর্ব থেকেই আমি পরবাসী। আমাদের বাসা ছিল পল্লী ও সহরের মিশ্রিত ভৌগোলিক পরিবেশে।

ফিরে আসার দিনে যখন বাসভূমির রাঙামাটি সাইকেল-রিক্সার চক্রক্ষেপে চিহ্নিত হয়ে বাড়ির কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, আমার মনের কোন প্রদেশে একটুও আনন্দ পাইনি। পাইনি ভবিষ্যতের আশ্বাস।

বর্ষণপ্রতীক্ষু আকাশের ইন্দ্রনীলসম্পদ আমার মনে মুগ্ধতা আনেনি। কুর্চিগুচ্ছ রামগিরির প্রাচীন মাধুরী-স্বপ্ন জাগরুক করতে পারেনি। নিঃসীম শূন্যতায় যে দেবদারু, যে শাল চিত্রায়িত, তাদেরই পাতায় পাতায় শুধু বাতাসের উদাসী সঙ্গীত—গৃহহারা-পরবাসীর গান। আসন্ন বর্ষণে আশ্রয় কোথায়?

মনে হয়নি আমার, যাচ্ছি পরিচিতা, একান্ত আত্মীয়ার কাছে, যিনি স্বর্গের অপেক্ষা গুরু, যিনি প্রভাতে প্রথম বন্দনীয়া। তিনি কি আমার অন্তর্নিবাসিনী জননীমূর্তির যথার্থ প্রতীক? হায়, তিনি যে পর।

চাকার তালে এক কথা, তিনি যে পর, তিনি পর, তিনি পর।

পদ্মিনী, তুমি কি ক'রে মনের কাছে স্বীকার করবে, যিনি সবচেয়ে আপন, তিনিই সবচেয়ে পর?

মাথার উপরে সেদিন ডানার ভিড় ছিল···প্রত্যাগত পাখীর দল। মন্দ্রমুখর ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে ঘণ্টা বেজে উঠল তিনটি শব্দে—বৌ কথা কও! ব্যঞ্জনায় পাওয়া গেল: তিনি যে পর!

চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিস্থিতি। ধানের জমির কাছে দাঁড়িয়েছিল বাল্যবন্ধু কল্লোল। সমুদ্রের ধ্বনি তার জন্মশঙ্খরোলে মিশেছিল উড়িষ্যার সমুদ্রতটে। তাই সে কল্লোল।

মায়ের প্রবল রূপবহ্নি অঙ্গরাগ করেছিল সন্তানের। আমি তাই পদ্মিনী।

"তুমি ফিরে এলে পদ্মিনী? পড়াশোনা এত দিনে শেষ হল?" কৃষাণদের নির্দেশ দিয়ে সরে এল কল্লোল। মাথার গ্রাম্য মাথাল খুলে ডালে রাখা হল। বর্ষাতি ঝুলছে সেখানে।

"তুমি না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলে, কল্লোল?"

"মাটির ইঞ্জিনিয়ার হতে হল শেষে। জানো বোধহয়, বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে? এত জমিজমা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের তো আর কেউ নেই, পদ্মিনী!"

"আমি কিছুই জানি না, কল্লোল। বাড়ির পথে তোমার বাবাকে দেখে যাব।"

ছেড়ে এলাম কৃষিকাজ। পড়ে রইল কল্লোল মাটি-মাখা, স্বেদছড়ানো কাজের কবলে। ততক্ষণে 'বৌ কথা কও' আশ্রয় পেয়েছে। আবার ডেকে উঠল দীর্ঘস্বরে ক্লান্ত চাতক।

মা প্রতীক্ষা করছিলেন ডেকৃচেয়ারে। কাছে খাস-ঝি অহল্যা দাঁড়িয়েছিল। প্রবাসিনীর অভ্যর্থনা প্রস্তুত আছে।

আহারান্তে শয়নকক্ষ দেখিয়ে মা বললেন, "তোমার ঘরে এখন আর কিছু আসবাবপত্র লাগবে। এখন তো এখানেই থাকতে হবে। কাল কাঠ-মিস্ত্রীকে অর্ডার দিয়ে দেব। আপাততঃ, আয়নাখানা এসেছে।"

স্বর্ণ-আঙুর-উৎকীর্ণ বন্ধনীর মধ্যে একখানি বৃহৎ মুকুর। আমার যৌবনকে ম্লান ক'রে দিয়েছে জননীর প্রতিফলন। কাল চুলের কিরীটি-ধৃতা তিনি গরিমাধার মহারাণী। ওই মুখে কোথাও ভীরু স্নেহের দুর্বল আতিশয্য নেই।

"এত খরচে দরকার কি, মা? আমার কিছু চাই না।"

রেফারীর বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ ধাতবকণ্ঠে শোনা গেল, "টাকার চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। শুধু নিজের ভাল-মন্দে দৃষ্টি রেখো তুমি। সেই শিক্ষাই তোমার বাকী, পদ্মিনী।"

একাকী ঘরের বৃহৎ মুকুরে যে রূপস্বপ্ন জেগে উঠেছে, কই আমি তো তার আত্মপ্রসাদস্ফীত পূজারী নই? আমার প্রতিবিম্ব নিজের রূপবিহ্বল, আমার সত্তা অমনোযোগী, চিন্তাবিক্ষত।

আমাদের টাকার অভাব নেই। কোন দিন অভাব অনুভব করিনি। দরিদ্র পিতা বিত্তের সান্ত্বনা রেখে যাননি মৃত্যুতে। কিন্তু আমাদের দিন চলে যায় কোন প্রয়োজন অপূর্ণ না রেখে। আমাদের দিন চলে যায় আয়াসের পিচ্ছিল সহজ পথে। রত্নখনির আভাস মাত্র জানি না।

মা এখানে একটি কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র খুলেছেন দুঃস্থ মহিলাদের জন্য। সরকারী সাহায্য আসে। কলিকাতায় উৎপন্ন দ্রব্যের বেসাতি স্বয়ং তিনি তদারক করেন।

নিষ্পাপ চরিত্রের খ্যাতি আছে মায়ের। অনমনীয় দৃঢ়তায় তিনি ভারকেন্দ্র। অবহেলা জীবনে পাইনি। পাইনি দুর্বল স্নেহের স্নিগ্ধতা। একমাত্র সন্তানকে তিনি মানুষ করতে চেয়েছেন নিজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে। দূরত্ব রেখেছেন ব্যবহারের কোণায় বেঁধে। তিনি জননী, মা নন।

বিছানায় আশ্রিতের চোখে সহজে এল না বিস্মরণীর বিশল্যকরণী নিদ্রাবেশ। মনে পড়ে গেল কল্লোলের বাবার কথা। বাড়ির বাগানে পক্ষাঘাতহত বৃদ্ধ বসেছিলেন। আমি গেলাম কাছে। দূরের মানুষ আমি তাঁর। কখনও নিকট হইনি।

"এমন হয়েছে আপনার? আমি জানতাম না।"

"যত না জান, ততই স্বস্তি।" হঠাৎ শান্ত দৃষ্টি বৃদ্ধের উদ্দীপিত হল ক্ষণ-প্রাখর্যে—গলায় নামল ঘৃণার সুর—"তুমি এখন বাড়ি যাও, পদ্মিনী।"

শয্যার শান্তিশিথিলতায় এখন সমস্ত ব্যবহার তাঁর সঙ্গতিবিহীন মনে হল।

কেটে যেতে লাগল দিনের ব্যর্থ সমষ্টি। আপনকে পর রেখে দূর বাড়ায় যে অনিবার্য গ্লানি, তাই গ্রাস করতে চাইল আমাকে। কাছে এসেও মা আমার আপন হলেন না।

নিষেধে শাসিত অস্তিত্ব আমার পাহাড়ি টিলার পাশের বাড়ির নির্জন আলিঙ্গনে অক্ষম আত্মসমর্পণ করল। শুধু কল্লোলের সাহচর্য মুক্তি দিত নিরলম্ব শূন্যতা থেকে কখন কখন। বাল্যবন্ধুর দাবী সমাজ এখনও অস্বীকার করে না।

মা প্রায় চলে যেতেন কলিকাতায় পণ্যহাটে। অহল্যা আমাকে দেখে রাখত। অর্থ যার উপার্জন ক'রে আনতে হবে, সে নারীর বহির্গমন স্বয়ংসিদ্ধ সত্য।

ক্লান্ত দেহে ফিরে আসতেন মা। নিজের ঘরের বিজন গুহায় দিন তাঁর কেটে যেত হিসাবের খাতা ও সেলাই-এর নমুনার আবর্জনায়। খাওয়ার সময়ে মুখোমুখি টেবিলে পাত্র পড়ত আমাদের। অতিথি একসঙ্গে দু'জনকে বসবার ঘরে পেত। এইমাত্র।

প্রাচুর্যে আমাকে মা স্তব্ধ করেছিলেন। কতদিন বিস্ময় বোধ করেছি এই রত্নখনি কোথায় আছে? আমার স্বাধীন জীবিকা আছে এই ঘুমন্ত বাড়ির বাহির-সীমায়। সে আমার কাছে নিষিদ্ধ ফল।

বলে ব্যর্থ হয়েছি। মা কুঞ্চিতভ্রূদৃষ্টি মুখে রেখে বলে দিয়েছেন, "টাকার চিন্তা তোমার করতে হবে না। তুমি নিজের চিন্তা করো।"

অতিথি অবশ্য আসত কেউ কেউ। পাড়ার বাড়ির মেয়েরা ভাব জমাতে এসে বিফল হয়েছে। ফিরতি দর্শনের অনুমতি মেলেনি আমার। এসেছে মায়ের কাছে কার্যব্যপদেশে নানা ব্যক্তি। এসেছে কল্লোল। এসেছে মরাল।

শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি মরাল। বিহার-বাংলা ব্যেপে বিরাট কয়লার ব্যবসা তার। বিধানসভার সদস্য। মাননীয় কর্মকর্তা বহু আয়োজনের। মা তাকে নিজ কেন্দ্রের সভাপতি রেখেছিলেন। আগে চিনতাম, এবারে সে অন্তরঙ্গতা করতে চাইল।

বয়সের দাবীতে সে আমার সম্মানীয়। বন্ধুত্ব সেখানে অচল। একদিন বলেছিলাম তার কোন ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে, "মরাল সরস্বতীর বাহন বলেই জানতাম।"

"জানো না, মরাল আবার পদ্মিনীর প্রিয়। ভক্ষকও বলতে পার।"

"তাই নাকি? পদ্মিনীর হয়তো নামে মিল আছে। মরালের নাম কচ্ছপ হলেই মানাত।"

অপমানে, ক্রোধে বিভীষণ হয়ে উঠল মরালের কুশ্রী মুখ, "তাই নাকি? আমাকে অপমান করার আগে তোমার মায়ের মতটা নিও, সুবোধ মেয়ে।" দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল মরাল সু-উচ্চ পদতাড়নে। মনে মনে হাসলাম।

তখনি এল অহল্যা গম্ভীর আষাঢ়কবলিত মুখে।

"খোকীমা, তোমার মা বলে দিলেন লোকজনের সঙ্গে ভদ্দর চালে চলবে।"

মরাল পথে চলে গেছে, মা দোতলায়। নিচে বসবার ঘরের কাহিনী অকথিত। তবে?

জিজ্ঞাসাচ্ছলে প্রতিবাদ জানালাম, "তোমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন কেন?"

"তাঁর মাথা ধরেছে। জানালা থেকে শেঠী বাবুকে যেতে দেখলেন।"

বুঝলাম, মরাল শেঠের গমনভঙ্গি মাতাকে জ্ঞানী করেছে। নিরক্ষরা দাসীও আমার চেয়ে বুদ্ধিমতী। আমার না-বলা প্রশ্নের উত্তর দিল সে। নির্বাক হলাম।

সেইদিন বিকাবেলায় কল্লোল কথা বলল। আমাদের বাড়ির পাশের শীর্ণ খাল শহরের প্রান্তে চলে গেছে। কল্লোলেরও বাড়ি খালের ধারে একটু দূরে টিলার ওপর। তার জমিজমা অবশ্য সারা গ্রামে ছড়িয়ে দেহাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। খালের ধারের নিশানা ধরে গেলে কোন না কোন সীমায় কল্লোলকে পাওয়া যায়।

আমাকে কল্লোল আজ একটু দূরে ডেকে নিল। পাহাড়ি জমি সেখানে আপনি উঁচু হয়ে নোনাগাছের ছায়া ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে। দূরে ছোট-নাগপুরের পাহাড়ি পরিপ্রেক্ষিতে অস্তমান রক্তিমসমুদ্র দিনের সূর্য। আমি সেখানে বসলাম। একটু নিচে ঢালু জমির ওপরে বসল কল্লোল।

যে কথা সে আমাকে বলেছিল, তার পুনরুক্তি সান্ধ্য তারাটির পর্যায়ে পড়ে। প্রাত্যহিক উদয় ও-তারার, তবু সে স্বাগতা। দিনশেষে আকাশের নীলিম ধূসরে প্রতিদিন সে সব কথা চাঁদের দোলনায় দোলে। শিশিরের চোখে সুখ-বেদনায় ঝরে। প্রাচী-প্রান্তে স্বর্ণবাসা উষার পদচিহ্নে শুকতারার মত উন্মুখ প্রত্যাশায় ঘুম ভেঙে ওঠে। সে কথা স্থিতির শৈলে চির-প্রোথিত। তবু তার ধরা দেওয়ার লগ্ন সাধনা-সম্ভব।

"এ রূপ চিতোরমহিষীর যোগ্য। ভীমসিংহের শৌর্য আমার নেই। কিন্তু, আলাউদ্দীনকে তো বাধা দিতে হবে?"

কল্লোলের কণ্ঠস্বরের উগ্রতায় বিস্মিত হলাম, "আলাউদ্দীন কে?"

"কেন, মরাল শেঠ? তোমার মা তোমাকে বন্দী করেছেন, পদ্মিনী তুমি যে অসহায়।"

"কিন্তু কল্লোল, তোমার বাবা যে আমাকে পছন্দ করেন না?"

অন্যমনা হয়ে গেল শূরী ভীমসিংহ, "না, তোমার অনুমান ভুল। অলক্ষিতে উনি তোমার প্রশংসা করেন। তবে, হ্যাঁ, সম্মুখে দেখলে একটু কেমন যেন হয়ে যান। বোধহয়, তোমার বাবার আকস্মিক মৃত্যু মনে পড়ে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দু'জনে। তুমি তো জানই।"

সে বিয়োগস্মৃতি আমার মনে মূল পায়নি। আমি ছাত্রী-আবাসে। সহসা শুনেছিলাম বাবা আর নেই। ড্রাই কলেরা হয়েছিল।

আমার বিষণ্ণ মুখে দৃষ্টি রেখে বলে উঠল কল্লোল,—'শিরীষকুসুম জিনি যাহাদের তনু, দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু।' গেঁয়ো চাষার কৃত্তিবাস ভিন্ন গতি কি?"

পায়ের কাছে ফুটে ছিল ঘাসফুল। ব্যগ্র করে আমার পায়ের ওপর কয়েকটি রাখল কল্লোল, "জীবনে প্রথম দাসত্ব স্বীকার করলাম।"

আকাশে মেঘ দেখা দিল। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনেও নেমে এল বর্ষা। বর্ষায় গাঁথা জীবনের দিনগুলি আমার।

জলের আশ্রয় খড়ের কুঁড়ে ঘরে এমনি দু'জনে। ঝড় গর্জন করছে নম্রশীর্ষ ধানের তরঙ্গে তরঙ্গে। মাটির দেওয়ালে ভার রক্ষা ক'রে দাঁড়ালাম। দরজার আগড় তুলে দিল কল্লোল।

বিস্মৃতা পৃথিবী পড়ে রইল দূর দিগন্তে—সমস্ত জগৎ সংহত হয়ে এল ঘরের মৃত্তিকা-প্রাকারের মধ্যে। ঘিরে ধরল অজানা অভিজ্ঞতার প্রলুব্ধ প্রয়াস। কল্লোল আর আমি। সারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বারিধিতে দুটি মাত্র বিযুক্ত সত্তা। যুক্তসত্তার অভ্যুদায়িকে জন্ম নেবে নূতন পৃথিবী।

বৃষ্টির মৃদু গুঞ্জন প্রবল আর্তনাদে পরিগণিত হল। কল্লোলের নিমেষহারা নেত্র তারকায় দেখলাম আপনার নূতন ছায়া। তার হৃৎস্পন্দন শ্রুত হল আমার হৃদয়ের স্পন্দিত শ্রুতিতে। পাহাড়িয়া প্রকৃতি ধার'স্নানে উলঙ্গ উল্লাস ব্যক্ত করল। বৃষ্টির অবিরত কলধ্বনি!

আমার নিদ্রিত সত্তায় আবির্ভূত হলেন প্রাণ-সরস্বতী—পদ্মিনী, সরু-মোটা দুই তারে যে জীবন-বীণা আমি বাজাই, তার ঐকতান শোন। যে জীবনে পূজার পবিত্রতা, সেখানেই উপভোগের প্রাচুর্য।

ক্ষতি কি? আজ ওরই মধ্যে নিঃশেষিত আমি নূতন জীবনে জেগে উঠি না কেন?

আমার সমর্পণের প্রশান্তি ভিন্ন উপায় কি? যে আমাকে কঠিন বক্ষে কঠিনতর পেশীর পীড়নে পিষ্ট ক'রে ধরেছে, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আমি তার কাছে একমাত্র নারী। প্রতিরুদ্ধ প্রশ্বাসে তার শ্লথবস্ত্র আমার কম্পিত। চুম্বনের করকাপাতে দেহতট বিপর্যস্ত। আমার কায়ার পুষ্পনন্তারে দুরন্ত ঝড় সে।

নিবিড় অন্ধকারে দু'জনের মধ্যে সূত্র ব্যবধান ছিল না। বাঁ হাতে জামুর পকেট থেকে কল্লোল তীব্র টর্চ বার করল। বোধহয় আমার কৌমার্যের শেষ শুচিশুভ্রতা দেখতে।

আলোর দহনে অনভ্যস্ত চক্ষুর পলকে চলে গেল কল্লোল ঘরের অপর প্রাচীরে। হতাশা-যন্ত্রণামথিত স্বর শুনলাম, "আমি পাগল হয়েছিলাম, পদ্মিনী? যা তপস্যার সিদ্ধি, জোর ক'রে তাতে অধিকার নিচ্ছিলাম।"

প্রাবৃটের আকাশে হয়তো বিদ্যুতের দীপ্তি নিভে যেয়ে ক্ষণনিমিত্ত উদয় হয়েছিল স্বাতী-নক্ষত্র; মনে মনে বলেছিলাম, 'তোমার মহত্ত্বে আজ থেকে তুমি আমার জীবনাধিক হ'লে।'

ক্ষান্ত-বর্ষণ মেঘের প্রসন্ন অনুমোদনে সরু আলের রাস্তা ধরে কল্লোল আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

দরোয়ান আলো ধরে খুঁজতে গেছে। মা বসে আছেন। অহল্যা পদসেবা করছে।

আমার প্রথম বলার কথা যাঁকে, তাঁকে এড়িয়ে চলে যেতে পথ নিলাম নিজের ঘরে। ধাতব কণ্ঠ আদেশ দিল, "দাঁড়াও। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

সাহস হল না সত্যভাষণে, "কল্লোলের বাড়ি বসেছিলাম বৃষ্টি দেখে।"

"বাড়িতে বসেছিলে, কাপড় ভিজেছে কেন?"

"পথে যেতেই বৃষ্টি পেয়েছিলাম।"

তীক্ষ্ণক্রুর একটা দৃষ্টি আমার সর্বদেহে সঞ্চারিত হল—"হুঁ! যাও, কাপড় ছেড়ে এখানে ফিরে এসো। অহল্যা, গরম দুধ দে ওকে।"

ফিরে আসতে হল। মা আমার অলঙ্ঘনীয়া।

"শোনো পদ্মিনী, নিজের ভাল সকলেই বোঝে। মূর্খ তুমি, অতি নির্বোধ। যা হবার হয়েছে। ভবিষ্যতে কল্লোলকে তোমায় ছাড়তে হবে। এতদিন বলিনি কিছু।"

আতঙ্ক শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল কণ্ঠদ্বারে, "কি আপনি বলছেন, মা? কি আবার হবে?"

ধাতব স্বরে তীক্ষ্ণতা শোনা গেল, "পদ্মিনী, চুপ করো! আজ থেকে এক মাসের মধ্যে মরাল শেঠকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।"

উঠে দাঁড়ালাম আসন থেকে, "অসম্ভব।"

"ক্ষেতী চাষার কুঁড়ে ঘরে দু-ঘণ্টা কাটাবার পরে ভবিষ্যৎ ভেবে ব্যবস্থা রাখতে হয়।"

দারুণ বিস্ময়ে প্রথমে এল রোষ—"আমরা কিছুই করিনি। যে চর খবর দিয়েছে, সে ভুল করেছে, সে ভুল করেছে।"

"পদ্মিনী আমি জানি মানুষের কতটা ধৈর্য, কতটা ক্ষমতা। নিজের কীর্তি অনেক সময় বলে জানাতে হয় না।"

বুঝলাম, তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখেছে আমার প্রেম-সাধিত রূপ। প্রেমিকের সোহাগ-করচালনে শিথিল কবরী-বন্ধন, বসনের শ্লথবিন্যাস। শুভ্র ত্বকে ফুটে উঠেছে পিপাসিত অধরের পীড়নের নীলকান্তমণি। দেখেছে অধরের বঙ্কিম কোণায় অশাসিত প্রেমের স্মারক রক্তরেখা।

মাথা নামিয়ে বললাম, "আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি, মা।"

উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবার, "প্রতিজ্ঞায় আমার বিশ্বাস নেই। আমার চোখ ভুল করে না। অনিবার্য ফলের দায়িত্ব আমি যাকে দেব, সে ওই চাষী গৃহস্থ নয়। একটি কথাও না। খেতে যাও ঘরে।"

তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে বাক্য বৃথা। যে অপরাধ করিনি, তারই ভারে মাথা নামিয়ে চলে এলাম।

বৃহৎ মুকুরে আজও ফুটেছে এক সুন্দরী। এ আয়না তো তারই রূপাভিমান জাগাতে? এ বিলাস-প্রয়াস তারই প্রবৃত্তির মুখ ফেরাতে ঐশ্বর্যের দিকে। চিতোরের পদ্মিনীর প্রতিফলন হয়েছিল এমনি দর্পণে।

সকালে আদেশনামা এল—যেখানে যাবে সঙ্গে থাকবে অহল্যা। পিতৃহীনাকে নিজের শ্রমে মানুষ করেছি। আমার দাবী সর্ব উর্ধ্বে। আমি মা।

সন্ধ্যায় হাজির হল মরাল—"বড় সুখী হলাম, পদ্মিনী। এই ধরো মুক্তোর মালা। আমার ঠাকুরমা'র আশীর্বাদ।"

গলার পাশে হাত রূঢ় ভাবে সরিয়ে দিলাম মুক্তাহার সমেত—"সুখী হবার কিছু নেই। আমার মত নেই।"

"তার মানে? তোমার মা কথা দিয়েছেন। মাকে তোমার অমান্যের সাধ্য নেই।"

"মা মত দেবেন না তাহলে।"

মরালের মুখ বিকৃত হল, ছোট ছোট সাপের চোখে এল ইস্পাত—"তোমার মা মত না দিয়ে থাকতেই পারেন না। তিনি যদি মত না দেন, তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কোর।"

দূরে তালে, দূরে শালে বেজে উঠল অশুভ সঙ্গীত বাতাসের মর্মপীড়া। চমকে-ওঠা মনের অধরা তারে যত অস্বস্তির ইঙ্গিত এত দিন বাঁধা ছিল, তারা মুক্তি পেতে চায় ওই দূর বাতাসের বিলাপকাতরতায়। মরালের কথা তারে ঘা দিয়েছে মাত্র।

মরাল বক্রহাসির সঙ্গে বিদায় নিল অনাদৃত মুক্তাহার নিয়ে। আমি কিন্তু মায়ের কাছে ছুটে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে পারলাম না। তিনি যে আমার পর। এই বলে নিজেকে ভোলালাম, হয়তো মায়ের ঋণ আছে মরালের কাছে। শোধ দিতে হবে আমাকে।

তিনি যে নিষ্ঠুর বুঝেছিলাম। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মায়ের নিষ্ঠুরতা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাত হ'ত অতর্কিত শৈথিল্যে। তাঁর কাছে করুণা নেই, তা-ও জানতাম। মরালকে বিবাহ করতেই হ'ত। কাঁ'ড় ঘরের ইতিবৃত্ত গতিবেগ বর্ধিত করেছে সংকল্পের।

কল্লোল হয়তো প্রতীক্ষা ক'রে চলে যায়। হয়তো সে আমাকে ভুল বোঝে। কিন্তু, অহঙ্কার পাহারা আমাকে বেঁধে রাখল। খালের ধারে হয়তো যেতাম। দূর থেকে দেখতাম তাকে, যে আমাকে নবজন্ম দিয়েছে।

আবার নেমেছে বর্ষা গিরিসানু ছেয়ে। জম্বু বনে ঘনিয়েছে শ্রাবণে মেদুর মেঘসঞ্চয়। দশার্ণ গ্রামের গলিত মৃত্তিকায় জনপদবধূর অলক্ত-চিহ্ন। কুর্চি ফুলের ঝরা দলে দলে পিয়াসী ভ্রমর।

রাঙা মাটি গলিত হয়েছে ধারাপাতে। পাহাড়ে খসে যাচ্ছে শিলার ঝুরো মাটি। খালের জল বেড়ে উঠেছে গৈরিক আবর্তে আবর্তে। শ্যামল গাছের ঝরোকায় উঁকি দিয়ে আমাদের নিরালা বাড়িটি যেন ভীতি-স্তম্ভিত হয়ে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার বয়ে এনে দিল একখানি চিঠি গোপনে আমার

হাতে। বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাল চাদর ঢাকা ছোট ছেলে একটি দিয়ে গেল মুক্ত পৃথিবীর লিপিপ্রণয়।

'পদ্মিনী, অহল্যার পাহারা এড়িয়ে দেখা করা অসাধ্য বুঝেছি। এমনি ভয় ছিল আমার। তোমাকে বিনা অনুমতিতে চলে আসতে হবে। চিঠির উত্তর কাল আনতে লোক যাবে। কল্লোল!'

মনে হয়েছিল: বন্ধ দরজা বিদীর্ণ ক'রে প্রচণ্ড জলকল্লোল ভাসিয়ে দিল আমাকে। বৃষ্টির ধারায় বেজে উঠল-সঙ্গীত। আমি যার, সে আমাকে চায়।

চিঠির উত্তর পাঠালাম। ঘরে পা দিয়ে শুনলাম ধাতব কণ্ঠ, "তুমি কি চাও মরালের ভোজপুরী দরোয়ান তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখে?"

অহল্যা ক্রুর হাসিভরা মুখে স্খলিতদন্ত উচ্চারণে বলল, "চিঠি লেখা কেন? কল্লোল বাবুর ছোকরা চাকর আচ্ছা চালাক আছে। মুখে বললেই হত।"

দাসীর আস্পর্ধায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তুলেই দেখলাম মায়ের দুটি চোখ—মিলে গেল দৃষ্টি। অদৃশ্য হিম শলাকা হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ ক'রে দিল আমার। সে চোখ মানুষীসম্ভব নয়। পুঞ্জীকৃত পশুত্ব চীৎকার ক'রে উঠছে চোখের নিমেষপাতে, 'দরকার হলে আমি সবই করতে পারি!'

ইনিই আমার মা! বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। পশুত্ব-প্রস্ফুট চোখ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল প্রেতের মত। কি রহস্য যেন সমগ্র বাড়ির অণু-পরমাণু-প্রবিষ্ট হয়ে আমাকে অস্বস্তির নাগপাশে বেঁধে ফেলতে চায়?

একটু পরে মা নিজে আমার ঘরে এলেন। তাঁর পক্ষে এটি ব্যতিক্রম। আমার শয়নাবস্থা লক্ষ্য ক'রে বিদ্রূপ-কটু স্বরে বললেন, "ধরাশয্যা নিয়েছ যে? শরীর খুব খারাপ না কি? এত দূর?"

আমি নির্বাক্ হয়ে রইলাম বিতৃষ্ণার প্রাবল্যে। খাটের অতি কাছে ধাতব-ঝঙ্কারে ক্রুদ্ধ সর্পিণীর গর্জন শোনা গেল, "আজ রাত্রে মরাল এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছে। তার কথা শুনে তোমাকে চলতে হবে। কারণ, তোমার শারীরিক অবস্থায় বেশী দেরী চলে না। সে যদি তোমাকে—তোমাকে কোন রকম অন্তরঙ্গ অবস্থায় চায়, আপত্তি কোর না। তোমার ভবিষ্যৎ—"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পদতলের কাশ্মীরী গালিচায় ঝরে পড়ল আমার

অবরুদ্ধ অপমানের অশ্রুকণিকা, "আপনাকে শেষ বারের মত বলছি, কল্লোল কিছু করেনি।"

"আমিও শেষ বারের মত বলছি, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

গমনশীলার পথরোধ করলাম শেষ চেষ্টায়, "যদি আপনার সেই বিশ্বাস, তাহলে কেন কল্লোলকেই—"

"হতে পারে না। এ কথা তোমার মুখে আবার শুনলে আমি তোমাকে শক্ত শাস্তি দেব। তোমাকে তৈরি করা হয়েছে ধনীর ঘরের যোগ্যতায়।"

অদৃশ্য হয়ে গেলেন কঠিনা। নিষ্ফল আক্রোশে আয়নার গায়ে আঘাত দিলাম রৌপ্য-চিক্কণীর। দ্বিতীয় চিতোরের যুদ্ধ নাকি পদ্মিনীর জন্য ?

আহারাদির অন্তে মরাল অনুরোধ জানাল, "একখানা গান শোনাও, পদ্মিনী !"

নির্লিপ্ত ঔদাস্যে অর্গানে বসলাম ! সযত্নরচিত নির্জনতার মধ্যে কথার চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক সঙ্গীত ভাল—অনেক ভাল।

যন্ত্রসঙ্গীতে আর্তনাদ করে উঠল আমারি বিরুদ্ধ অন্তর। গানের কথায় বলে দিলাম :

ভ্রমর, তুমি পদ্মিনীর কাছে নও। তবু, তোমাতেই আবদ্ধচিত্তা সে। স্রোতশিহরণে শফরী তার চায় উৎখাতিত করতে। সে তবু একে বদ্ধচিত্তা। ভ্রমর, তুমি কি কুঞ্জবিতানে পথ হারিয়েছ ? পীতমধু পুষ্পের রেণু কি তোমার কাল চোখ অন্ধ করে দিয়েছে ? তুমি কি বোঝ না পদ্মিনীর প্রাণ কোথায় ? ক্ষুব্ধ বারিবীচিভঙ্গ কি তোমার দেশে কল্লোল তোলে না ?

গান আমার প্রাণের বাণীরূপ। বর্ষার দিন কুয়াশাগুণ্ঠনে নিস্তব্ধ হয়ে শুনে নিল ! শুনে নিল গৈরিক, উত্তাল খালের জল। তারা আমাদের দু'জনের সাধারণ সম্পত্তি। কল্লোল কি জানবে না আমার অসহায় অপেক্ষা ?

মরাল ততক্ষণে অতি কাছে এসেছে। ভারাতুর, বিধুনিত তার নিঃশ্বাস গ্রীবাপ্রত্যন্তের গুচ্ছ অলকে লাগছে আমার। গান বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম।

মাংস-পোলাউ পর্যাপ্তাহারে তৃপ্ত মরাল শেঠ কুহুরাত্রির অভিসার ইঙ্গিতে চঞ্চল। আমার দুই হাত সে ধরল অধিকার গ্রহণের ভঙ্গীতে।

আমি নীরবে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। মরালের ময়াল সাপের মত লিক্‌লিকে দীর্ঘ শরীর বেঁকে এল কানের কাছে, "কেন লজ্জা করছ, পদ্মিনী ? আর ক'দিন পরেই তো এক বিছানায় শুতে হবে ?"

"লজ্জা নয়, মরাল বাবু, ঘৃণা। আপনার ভুল হয়েছে। আপনার কাছে থাকার চেয়ে পদ্মিনীর জহর ব্রত ভাল।"

"বড় দেমাক তোমার! রূপ আছে, তাই বলে নিজেকে চিতোরমহিষী মনে করার কারণ নেই। রূপ আছে বলেই তো চেয়েছি। নইলে, যার মা—। থাক, শোন পদ্মিনী, আমাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। তোমার মায়ের শক্তি আমি জানি। অনর্থক ঝগড়া কোর না। আমি তোমাকে সত্যি ভালবেসে ফেলেছি।"

সারা পৃথিবী শিউরে উঠল। ভালবাসার নাম এত সহজে গ্রহণ! অনুচ্চারিত নিষেধ বায়ুস্তরে মূর্ত হয়ে বাধা দিল—"Thou shalt not take the name of thy Lord God in vain!"

আমাকে গহন-সমুদ্রের অক্টোপাস্ ধরেছে—পিচ্ছিল মাংসপিণ্ড, যার অভ্যন্তরে লালসার ক্ষন-সন্তাপ নিরাকৃত হয় প্রাত্যহিক দিনযাত্রার জীবনীবিহীন শৈত্যে। যে মাংসপিণ্ড আত্মার দ্যুতিতে দেদীপ্য হয়ে ওঠে না, আমি তাকে নিয়ে কি করব?

কঙ্কণের তীক্ষ্ণ কোণায় মরালের ভারী গণ্ডারচর্ম কেটে গেল। আমার হাতে সংযমী তারুণ্যের শক্তি ছিল।

মরাল আমাকে ছেড়ে পিছু হটে রুমালে গণ্ডের ক্ষত আবৃত করল। এক চোখ ঢাকা পড়েছে। অন্য চোখে হিংস্র আক্রোশ—"বেশ শিখেছ তো! ডাকব না কি মা-জননীকে? হাণ্টার হাতে নিয়ে আসবেন, যেমন হাণ্টারের ঘা তাঁর নিজের পিঠেও পড়ে।"

"সাবধান আপনি, মায়ের সম্বন্ধে এ সব কথা বলবেন না। আমি তাঁকে বলে দেব।"

"ওঃ, ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজি গে। যাও, যাও। আমার সামনে তার কথা বলার মুখ আছে?"

"মিথ্যাবাদী, মা কাউকে ভয় করেন না।"

মরাল বসে পড়ল সোফায়, চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, "সত্যি কথাটাই বলে যাই তাহ'লে? ভেবেচিন্তে দেখে কাল মতামত স্থির কোর, বিয়ে করবে কি না! সতীকুলশিরোমণি তোমার মা! শিল্পকেন্দ্রের টাকায় এই নবাবী চলে? ওটা ছুতো মাত্র।"

বাতাসে বৃষ্টির শব্দ। ক্রন্দসীর অন্তরালে অকথিত যে রহস্য, মানুষের ভাবা তার প্রকাশ দেয়। মানুষের জীবনে নামে অন্ধকারের প্লাবন।

"শোন গরবিণী, বহুদিন থেকেই তোমার মা অবৈধ প্রণয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। শিল্পকেন্দ্রের বেসাতি বিক্রীর ছলে কলকাতার নাগরের কাছে যাওয়া! একমাত্র আমি জানি। তাই আমাকে সন্তুষ্ট রাখা তোমার ও তোমার ওই মায়ের অবশ্য কর্তব্য।"

চীৎকার ক'রে উঠলাম, "মিথ্যা। আপনি কি ক'রে জানলেন ?"

"আমিও যে একদিন একই হোটেলের বাসিন্দা হয়েছিলাম। পাশাপাশি ঘরের সব দৃশ্য দরজার ফাঁকে দেখা গিয়েছিল। পশুর মত তোমার মা আর সেই লোক উপভোগ করছিল পরস্পরকে।"

"ছি, ছি!" আমি মুহূর্তে মরে গেলাম—"টাকার জন্যে এই করতে হল মাকে ?"

"না গো, না। টাকা নয় শুধু। তোমার মায়ের মধ্যের একটা পশুর দিক আছে, সেটা একমাত্র সেই পশু-প্রকৃতির লোক তৃপ্ত করতে পারে। মাঝে মাঝে সে চাবুক মারে—তাতে উনি আনন্দ পান। হোটেলের পরিচয়ের পরে সে ব্যক্তির যে ব্যবসা-সম্পর্ক হয়েছে আমার সঙ্গে।"

আমার আনত লজ্জাপীড়িত মুখের দিকে চেয়ে নরম গলায় এবার মরাল বলল, "মন খারাপ কোর না, পদ্মিনী! মানুষের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি থাকে। তোমার মায়ের মেয়ে তুমি। তোমার মধ্যেও সেই পশু আছে। আমি তোমাকে সুখী করতে পারব।"

কিন্তু আমি যে মানুষের দেবতার রূপও দেখেছি। আত্মসমর্পিতা নারীকে সে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। পশু ও দেবতা মানুষের মধ্যে পেলাম। কিন্তু, আমি যে দেবতাকেই চাই। জীবন-বীণার সরু-মোটা দুই তার। আমি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের অপার্থিবতা চাই।

বলে দিলাম, "আমার মায়ের কথা আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না। তিনি সকল অবস্থাতেই আমার মা। আমার মধ্যে যদি পশু থেকে থাকে, সে পশুকে আমি হত্যা করব। আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা।"

মরাল অবশ্য ভবিষ্যতে আস্থা রেখেই চলে গেল। তারপরে বিপর্যস্ত আমাকে শাসন করতে এলেন—সেই মা।

দুই চোখে তাঁর জ্বলছে শুষ্ক বনের দাবানল—"সব শুনেছ, বুঝলাম। কিছু বলতে চাও?"

"না, না। আমি আপনার বিচার কোরব না।"

ধাতব-কণ্ঠে নির্লজ্জ ভাষণ হল, "আমার জীবন আমার নিজস্ব। তুমি শিশু, অনেক কিছুই বুঝবে না। ঐশ্বর্য আর শক্তির দাসত্বেই মেয়েদের সুখ। আমি ভুল করেছিলাম মিনমিনে গরীবকে বিয়ে করে।" ক্রূর, নিষ্ঠুর হাসি একটা খেলে গেল তাঁর কুঞ্চিত অধরে—"তোমাকে ভুল করতে দেব না।"

"মা, মা! চলুন, সব ছেড়ে দূরে চলে যাই। সেখানে মরাল থাকবে না।"

"মরালকে আমি ভয় করি না। কারণ, আমি যা করছি, তাতে আমার সাহস আছে। আমি চাই না শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোন অনুসন্ধান হয়।"

মা হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন। ছাই যেন কেউ তাঁর মুখে মেখে দিল। ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললেন, "একটা কথা প্রকাশ হলেই দশটা প্রকাশ হয়।"

আমার সর্বদেহে সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলে গেল—"মা, আরও কি আছে?"

মুহূর্তে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন তিনি—"চুপ করো পদ্মিনী, বহু বাচালতা করেছ। এই মাসের শেষে মরালের সঙ্গে তোমার বিয়ে। আজ থেকে তুমি চাবী-বন্ধ ঘরে থাকবে।"

তবু বর্ষার ঝর্ঝর গানের অবিরত প্রবাহের মধ্যে, তবু শৃঙ্খলিত ঘরের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে এল প্রিয়লিপি।

"পদ্মিনী, আমার চাকর সব খবর এনেছে। তোমাকে চাবি-বন্ধ ক'রে রাখা হয়। অহল্যা পাহারা দেয়। মরালের সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে শুনছি বাইরে। চরিত্রহীন লম্পট সে। আমার চেয়ে উপযুক্ত পাত্র হলে আমি সরে যেতাম। যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। শুধু দরজা খোলা পেলেই চলে আসবে। খালের ধারে রোজ রাত্রে আমি থাকব। কল্লোল।"

আমার দায়িত্ব সে-ই নিয়েছে। আমি শুধু ডাকের প্রতীক্ষা করব। আকাশ ঢেকে ফেলেছে বর্ষাসমারোহ। এমন বর্ষা এ অঞ্চলে জীবনে নামেনি। পথ জলের আধার হয়ে দাঁড়াল। নেমে এল আকাশ মাথার ওপরে। আমার জীবনের বর্ষার সঙ্গে গেঁথে দিলেন প্রকৃতি তাঁর বর্ষাচম্পূ। গদ্য ও পদ্যে গ্রথিত হল ছোট শহরটির দিনযাত্রা।

অবরুদ্ধা আমি চেয়ে থাকি লোহার গরাদের ফাঁকে দূরের রক্তিমাভ পথরেখায়। নির্জন বাড়ি পাহাড়তলীর। তাতে বৃষ্টির যবনিকা সম্পূর্ণ আবরণ ক'রে রেখেছে প্রতিবেশীত্ব থেকে। কেটে দিয়েছে বৃষ্টিধার ধারালো ছুরির যোগাযোগ ও আদান-প্রদান। আমার বন্দিত্ব লোকলোচনের অন্তরালে রইল। নিষ্ফল প্রতিবাদ রইল ঘুমন্ত মনের শীতল গহ্বরে।

আমার শুধু পথ চাওয়া—বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার পুষ্প দিয়ে দিবসের গণনা নয়—বিনিদ্র রাত্রে পূর্বতন সম্ভোগস্মৃতিচিহ্নিত জাগরণ নয়। আমার সমগ্র জীবন ধ্বসে পড়েছে আমারি মাথার ওপরে। ভগ্ন ইমারতের নিচে প্রোথিত আছি আমি। আমার ব্যথা কাকুকে বলবার নয়। আমার মাতৃত্বসম্পর্কহীন জন্ম হ'ল না কেন?

রামগিরি পাহাড়ের প্রাবৃট ঘনিয়ে এসেছে আধুনিক ভূভাগে। স্তিমিতদিবা জ্যোতিহারা ইন্দ্রনীল মেঘমণ্ডলে। আবার ঝরে যাচ্ছে কুর্চিকেশর, আবার বকুলবিস্তৃত শ্যামতৃণে সঞ্চরণ করছে জলজ কীট। পথ নির্জন। পৃথিবীর মুখে চিররাত্রির তমসা।

আমার জীবনের বিশিষ্ট দিনগুলি এমনি বর্ষাব্যাকুল। বিস্ময়বোধ হয়, বর্ষায় গাঁথা জীবন আমার।

সেই বর্ষা-মাথায় নবীন পশারী এল—"পেঁপে রাখবেন, বহিন?" অহল্যা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। মা দোতলায়। আমি আমার একতলার ঘরে বন্দী ছিলাম। জানালা দিয়ে দেখা যায় ঢাকা রোয়াক

"দূর দূর! এমন বর্ষায় পেঁপে খায় কে?" অহল্যা তাড়া দিল। শক্ত-সমর্থ রুক্ষ মজদুরী চেহারা পশারীর। বর্বর মুখে নির্লজ্জ স্পর্ধা। কোথায় যেন মরাল শেঠকে মনে করায়!

চাপা গলায় পশারী অহল্যাকে বলল, "বর্ষায় কি খায়, তা আমি জানি, পিয়ারী। দেহাতী লোকের দোষ নিও না।"

অহল্যা চটে উঠেই চুপ ক'রে গেল। পশারী বজ্রমুষ্টিতে হাত ধরেছে ওর—"আরে কর কি? জোরে কথা বোল না। লোকে শুনবে। পরদেশী, জরু নেই কাছে। এমন বর্ষা নেমেছে। তাই বেসামাল কথা বলে ফেলেছি।"

স্খলিতদন্তা প্রৌঢ়া অহল্যা—কৈকেয়ীর দাসী কুঁজী মন্থরা ওর তুলনা। তরুণ পশারীর ছোঁয়ায় এলিয়ে গেল। আমি ছিলাম বদ্ধ জানালার আড়ালে।

চার দিকে চেয়ে বলল, "আর ভাই, এখন কি বয়স আছে? আগে রোজ এক-একটা মরদ রাখতাম ঘরে। মাইজী এতে মানা করেন না।"

"আরে রাখ তোমার ছেনালী। বয়স কি হয়েছে আর? জান না, বুড়ো হাড়ে ঘুষ বেশী? আজ রাত্রে আমি তোমার মরদ হই না কেন? এমন বর্ষা তো ঝুটমুট কাটানো চলে না। আমার তাগদটা দেখো একবার।"

কুৎসিত ভাষায় কুৎসিত প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল। আমি সেই ভাবে বসে রইলাম। সারা বাড়ির কামদগ্ধ বীভৎস আবহাওয়া বুকে পাথর হয়ে শ্বাসরোধ করতে চায়। মাতার পরিচয় পেয়েছিলাম। দাসীরও যথার্থ রূপ দেখলাম।

এই তামসিক পশুত্বের সাধনায় আমি চাই তাঁকে—সত্য, শিব, সুন্দরকে। আমার ধারণার লক্ষ্য অমৃতের নিরূপক প্রেম। আমার জীবন-বীণায় মোটা তার বাজবে না।

রাত্রির গভীরতায় বর্ষাবিহ্বল নির্জনে খুলে গেল আমার বন্ধ দ্বার। পশারী কল্লোলের প্রেরিত কৃষাণ একজন।

অতি নাটকীয় শেষ অঙ্ক মিলে গেছে সহজ আখ্যানে। কল্লোলের প্রসারিত বাহুর আশ্রয় পেয়ে ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু, নাটক ছিল জটিলতর।

কল্লোলের বাবা অদ্ভুত চোখে তাকালেন। বিতৃষ্ণ গলায় বললেন, "বিষকুম্ভ বাড়িতে আনলে তো?"

আমাদের যুগপৎ বিস্ময়কে অতিক্রম ক'রে কল্লোল বলে উঠল, "ও কি বলছো বাবা? পদ্মিনী না তোমার বন্ধুর মেয়ে?"

"তাই তো বলছি, তাই তো বলছি, বাপু। যাক গে, যা খুশী করো তোমরা।"

আমার পাদধূলিগ্রহণ-প্রয়াসে বৃদ্ধের নিদ্রা ব্যাহত হয়েছিল। ছিন্ন সূত্র ধরে ঘুমের দেশে চলে গেলেন তিনি আবার।

মাথা নামিয়ে বললাম কল্লোলকে আমার পরম গ্লানির ইতিহাস। আমার মায়ের কলঙ্ক। তার অগাধ প্রেম পঙ্ক-জাতা বলে পদ্মিনীকে দায়ী করল না।

সেদিনও তেমনি বর্ষা-রাত্রি—কুঁড়ে ঘরের তেমনি মোহময় নৈকট্য। দুইটি সত্তা নির্জন গৃহে—একটু দূরে শয্যার প্রলুব্ধতা। ওখানে শেষ হয়ে যাক না দ্বৈতবোধ? কমলিনী যদি সমুদ্রে আশ্রয় পেয়েছে, তবে ভাসিয়ে নিক না

সমুদ্র তাকে সীমিত বন্ধন থেকে? এ তো আমার পশুত্ব নয়—আমার দেবতার পূজা-প্রয়াস।

আমার বিহ্বল মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি রেখে উঠে গেল কল্লোল দরজার কাছে। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ভেসে গেল বর্ষণমত্ত বাতাসে।

"পদ্মিনী, আজ ঘুমোও। কাল বিয়ের ব্যবস্থা কোরব।"

"তুমিও যেও না, কল্লোল। আমার যে ভয় করবে।" গমনমুখী দেহ তার জড়িয়ে ধরলাম। বাতাসের মত্ত আক্ষেপ, শালের উচ্চ বিলাপ আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট করেছিল।

জননীর সকরুণ স্নেহে দু'খানি কঠিন বাহু আমাকে ঘিরে ধরল। ভীত দেহ স্নিগ্ধ ক'রে পিতৃ-স্নেহের মাধুরী নিয়ে নেমে এল ললাটে একটি চুম্বন।

"পদ্মিনী, আমি একজন ঝি এনে রেখেছি। সেই তোমার ঘরে থাকবে। জীবনে পশুত্ব দেখে আঘাত পেয়েছ। আমি তোমাকে মানুষের অন্য পরিচয় দেখাব। তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করেছি। তাতেই আমার সুখ।"

কল্লোল চলে গেল আমার অধর স্পর্শবিহীন রেখে।

প্রাণসরস্বতী সহাস্যে সপ্ত-তারে স্পর্শ করলেন।

কিন্তু হায়, এ জীবন তো ওখানেই বর্ষা পার হয়ে এল না। সেদিন মত্ত প্লাবন জেগে উঠল মলয়-সাগরে। ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমার পায়ের নিচের মাটি। সেদিন শালে-তালে-তমালে বাতাস নৃত্য ক'রে গেল নটরাজের। সেদিন দিগন্তে জেগে উঠল প্রলয়ের ইঙ্গিত।

মধ্যরাত্রে ঘা পড়ল সদর দ্বারে—"দরজা খোল, দরজা খোল।" বর্ষাধারাকে অবজ্ঞা ক'রে এসেছে কারা? এমন ক্ষিপ্ত পৃথিবীর তুহিননিথর রাত্রি। পথচারী কি ভয় পায়নি?

দেখলাম মা দাঁড়িয়ে আছেন। অহল্যা ও দারোয়ান সঙ্গে। জানালার কাছে কল্লোল এগিয়ে এল।

"দরজা খোল। আমার মেয়েকে চুরি ক'রে এনেছ, নির্লজ্জ? আমার ঝিকে ঠকিয়েছ। সহজে দরজা না খুললে মরালের বন্দুক নিয়ে লোক আনাব।"

নিরুত্তাপ কণ্ঠে কল্লোল বলল, "বন্দুক আমারও আছে। গেটের সীমানা মরাল পার হতে পারবে না। আপনার মেয়েকে আপনি অত্যাচারে পাগল ক'রে দিয়েছেন। লজ্জা আপনারই হওয়া উচিত।"

"তুমি ভেবেছ ওকে তুমি পাবে? গেঁয়ো চাষা একটা। আমি থাকতে তোমার আশা পূর্ণ হবে না। ভাল চাও তো, দরজা খোল।"

"দরজা খুলছি। কিন্তু, আপনি ছাড়া কেউ ঢুকতে পাবে না আমার বাড়িতে।"

কল্লোল অগ্রসর হয়ে যেতে হাত ধরলাম আমি, "না, কল্লোল, খুলো না।"

হঠাৎ পেছনে দেখলাম, ঝি-এর কাঁধে ভর দিয়ে অথর্ব বৃদ্ধ এক অঙ্গে নির্ভর ক'রে উঠে এসেছেন। মুখে তাঁর বাতুলভাব প্রকাশ।

"দূর হ, এখান থেকে। দরজা খুলে দাও, কল্লোল। ওর অষুধ আমার হাতে আছে।"

"তুমি কেন, বাবা? ঘরে যাও। যা করবার আমি করছি।"

"না, না। অনেক দিন চুপ করেছিলাম। আজ এই স্ত্রীলোকটাকে আমি দেখে নেব। দরজা খুলে দাও। মা, তুমি আমার পাশে এস। ভয় নেই।"

আমি কল্লোলের বাবার পাশে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা হল। একা মাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল কল্লোল। ওরা বাইরে রইল।

বর্ষণসিক্ত বস্ত্র মা পরিবর্তন করলেন না। ক্রোধে কুটিলা সর্পীর মত তিনি আস্ফালন করছেন। আমার চুলের মুঠি ধরলেন চেপে,—"হতভাগী, জেনে রাখিস, তোর নিস্তার নেই।"

কল্লোল ছাড়িয়ে নিল আমাকে। পক্ষাঘাতহত বৃদ্ধ থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, "তুই কি ভেবেছিস, কুলটা? বিধবা হয়ে ভাবছিস আপদ গেল, না? তুমি বাচ্চা মেয়েটাকে বোর্ডিং-এ রেখে স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে উপপতির সঙ্গে উপভোগ করতে। সবই আমি জানতাম।"

"চুপ করুন আপনি। নিজের মেয়েকে আমি শাসন করতে এসেছি।"

"তোমাকে শাসন কে করে, শুনি? এত বছর চুপ ক'রে আছি, পক্ষাঘাতে ঘরে পড়ে মরছি। তাই ভেবেছ সব ভুলে গেছি, না? আমার ছেলেকে তুমি শাসাও? স্বামী থাকতে সুবিধা হচ্ছিল না। তাই বিষ দিয়েছিলে তার রাত্রির দুধে। কি না আমি জানি? ড্রাই কলেরাই বটে!" বৃদ্ধ আমার বুকের মধ্যে কাঁপিয়ে অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। পায়ের নিচের ভূমি বিদীর্ণ হয়ে গেল। বসে পড়লাম আমি।

সেই নারী উঠে দাঁড়াল যাকে আমার মা বলে ডাকতে হয়—"কোন

প্রমাণ আছে ?" ভয়ানক হয়ে উঠল মুখচ্ছবি তার। পশু জেগে হানা দিল উগ্র চোখের তারায়। প্রবুদ্ধিত হয়ে উঠেছে সত্তায় তার পশুত্বের আত্মা।

"প্রমাণ এখন তোমার ওই মুখ। সেদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। শুনলাম খুব অসুখ তোমার স্বামীর। তখনি প্রায় গতায়ু হয়ে পড়েছিল সে। অথচ, ডাক্তার আসেনি। আমার অনুযোগে বিব্রত হয়ে অহল্যাকে ডাকলে তুমি ডাক্তারবাড়ি যাবার জন্য। অহল্যা জানত না যে আমি এসেছি। একটা কাচের গ্লাস ছাই মাখা অবস্থায় হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। দু'জনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেলে। দৌড়ে বেরিয়ে গেল অহল্যা। 'গেলাসটা দেখি', বলে আমিও ছুটলাম ওর পেছনে রান্নাঘরে। আমি দেখবার আগেই ধুয়ে ফেলল গেলাস সে। তুমি ছুটে এসে আলমারীর পাশ থেকে বিদ্যুৎবেগে তুলে নিলে একটা অতি ছোট ভাঙা শিশি। তোমার হাত ধরবার আগেই ছুঁড়ে দিলে পুকুরে। সমস্ত প্রমাণ লুপ্ত হয়ে গেল। ডাক্তারের সাধ্য ছিল না বিষ ধরার। সে এল অনেক পরে। তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

কিছু কাউকে বলিনি। তোমার স্বামী ছিল বন্ধু। মেয়েটা তার রয়েছে। রয়েছে অকলঙ্ক নামের মহিমা। তাছাড়া, প্রমাণ ছিল না কিছু, পোষ্ট-মর্টেমে পাওয়া যেত না হয়তো। তুমি অস্বীকার করলে গ্লাসে বা শিশিতে বিশেষ কিছু থাকার কথা। দ্বিধায় ফিরে এলাম নীরব হয়ে; কিন্তু, বুঝলাম ধীরে ধীরে তোমাকে ভাল ক'রে দেখে যে তুমিই প্রাণহন্ত্রী।"

সেই নারী ক্রুদ্ধ হায়েনার মত দন্ত উদ্‌ঘাটিত ক'রে হিস্‌হিস্‌ স্বরে বলে গেল—"এর ফল পাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলের রক্ষা নেই।"

টিলা থেকে নেমে খালের গৈরিক আবর্ত পার হয়ে ঘাতিনী চলে গেল বর্ষার আচ্ছাদনের নিচে। পাশে প্রেতিনী অহল্যা। রাত্রি একটা বেজে গেছে। আমার ছোট জগৎ ভূমিকম্পে মূলহারা হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল বিশ্বাস চিরমৃত। ভয়ের শিহরণ পাঁজরায় কম্পন আনল আবার। মা বেঁচে থাকতে কল্লোলের রক্ষা নেই।

কিন্তু খালের জলে গৈরিক আবর্ত প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল অবিরত বর্ষার বিক্ষোভে। পাহাড়ে উৎস তার—স্ফীত নির্ঝরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নানা সঙ্গমকামা পরিবর্ধিতা ধারা। সাগর চাই তাদের। পথের কোন বাধা মানবে না একত্রীভূত উচ্ছৃঙ্খল পার্বত্য প্রবাহ।

সেদিন খালের জলে জেগে উঠল পাহাড়িয়া ঝরণা। পাহাড় চূর্ণ ক'রে,

প্লাবিত ক'রে তটভূমি ঝাঁপিয়ে পড়ল সমতলে। টিলার পাশে সেই আমার বাড়ি ভেসে গেল নিশ্চিহ্নে।

আমরা ছুটে গিয়েছিলাম খবর জেনে। পূর্বের রক্তমেঘে প্রভাতী সূর্যের ছোঁয়া লেগেছে। সেই বাড়ির কোথাও চিহ্ন নেই? ভেসে গেছে মানুষের ঘর, মানুষের তৈজস। খরবেগ স্রোত মৃতদেহ টেনে নিয়ে শত শত যোজন দূরের খাদে ফেলে দিয়েছে। ভেসে গিয়েছে। ভেসে গিয়েছে মানুষের পাপ। বর্ষণক্লান্ত আকাশে এত দিন পরে উঠেছে ইন্দ্রধনু।

আমার জীবনের চরম বেদনা, পরম কলঙ্ক তো ওখানেই শেষ হল। বর্ষা আমাকে এনে দিল সুস্থ জীবনের ভরসা। কিন্তু সে যে নিল, অনেক নিল। যেখানে আমার ব্যথা, সেখানেই যে প্রাণস্পন্দন আমার। যেখানে আমার বিষ, সেখানেই আমার মধু। যে ভেসে গেল, সে যে আমার সকলের বড় আত্মীয়। সে যে আমার মা।

আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম হাহাকার ক'রে। ধূলো থেকে কল্লোল আমাকে বুকে তুলে নিল।

তারপর কেটে গেল বহু দিন। আসানসোলের ফার্মে আছি ভদ্র কৃষকের সোহাগিনী ঘরণী হয়ে। জীবনের তারে সূক্ষ্ম সঙ্গীতের অনির্বচনীয় মাধুর্য আমার দিনযাত্রায় এনেছে প্রশান্তি।

তবু তো আকাশ ভেঙে নেমে আসে বর্ষাধারা। প্রাবৃটের দিনে ফিরে আসে জীবনের বর্ষার দিনগুলি। মনে রাখার সাহস নেই, ভোলাও অসাধ্য।

কল্লোল বলে দেয় ছেলে-মেয়েকে, "ওরে তোরা এমন বর্ষার দিনে তোদের মাকে ঘিরে বসে থাকিস।"

ছেলে-মেয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে। তাদের মাথায় হাত রাখি। এমনি নিবিড় বাৎসল্যের মুহূর্তে, যাঁকে ভুলতে চাই, তাঁকেই মনে পড়ে বার বার।

ধাক্কা

তরমুজের টুকরো গলাধঃকরণ করছে একটি ছেলে—বয়স তার বেশি নয়। সতেরো বছর মাত্র, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত আকৃতি। ছেঁড়া হাফসার্ট পরা, সস্তা পাজামা। ধুতি কেনবার পয়সা নেই, তাই বেমানান দেহ অবাঙালী সুলভ পরিচ্ছদে আবৃত ক'রে রাখতে হয়।

ছেলেটা জায়গা পায় না কোথাও। বাড়তির মুখে খাপছাড়া লাগে। প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেড়ায়।

বাড়ির দরজায় বসে গব্‌গব্‌ ক'রে ছোকরা তরমুজের টুকরো খাচ্ছিল। খিদিরপুরের বড় রাস্তার অঞ্চল ছেড়ে বাজার পার হ'তে হ'বে। তারপর সরু গলির দু'পাশে দরজীখানা, মনোহারী ইত্যাদি আনুষঙ্গিক জীবন যাপনের। গলির মধ্যে থেকে গলি—সেখানে একখানা উঠান ঘিরে কতকগুলি ঘরের সমষ্টি। পাকা দেওয়াল, মেঝে, টিনের ছাউনি। খাবার জল আসে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে। প্রাতঃকৃত্যাদির ব্যবস্থা সর্বসাধারণী। বস্তি।

অবশেষে নেমে এলাম বস্তিতে? গ্রীক্ ফোরাম্ ছেড়ে? কিন্তু আমার আপনার মত অনেকে যে বস্তিতে নেমে এসেছে, তাদের বাদ দেব?

বস্তিসাহিত্য বহু লেখা হয়েছে—গণসাহিত্য নামেই যাবৎ তারা চলেছে। যেন নীচুতলার মানুষকে নিয়ে কলম কণ্ডূয়ন মানেই গণসাহিত্য। যেন তাদের চরম অধঃপতন, নোংরামি, ইতরামি লিখলেই বাস্তবতাধর্মী হয়। এঁরা অন্য দেশকে মাথায় তুলে নাচানাচি করেন, তাঁদের গণসাহিত্য কি পড়েও দেখেন না?

যাই হোক, আমার দুরাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি শুধু একটি মনের কথাই বলতে চাই, যে মন ছিল কুণ্ঠিত। দরজায় দরজায় ধাক্কা খেয়েছে, তার পক্ষে স্থানাভাব ছিল। কারণ, একটু বেশি জায়গা লাগত কিনা ওর।

বস্তিও আঁকাবাঁকা—যেন মানুষেরই মন। ছেলেটা দরজায় সকালে বসে তরমুজ খাচ্ছে। মোড়ের কাটাফলওয়ালা পচে ফেলে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে দু'পয়সায় ছেড়েছে। কাছেই ফ্যাক্টরি—সেখানে শ্রমিকেরা ক্ষুধার প্রহরে

কাটাফল কিনে হাউ হাউ ক'রে খায়। কলেরার অজুহাতে কলকাতায় কাটাফল নিষিদ্ধ হলেও এখানে চোরা বাজার বসে।

তরমুজের বাকলা ফেলে দিতে গিয়ে ছেলেটার হাতে লাগল খোঁচা। মহা-বিরক্ত হ'ল সে। চোদ্দ মাস আগে যখন সে এসেছিল এখানে তখন এত খোঁচা খেত না। জামাকাপড়ও লাগত না এত বড় মাপের। ক্ষুধাও এত পেত না।

পদ্মাপারবিতাড়িত ছেলেটার নাম মহানন্দ চক্রবর্তী। আমরা তাকে 'আনন্দ' ডাকব।

'মা' বলে একদা যাকে ডাকত, সেই মাসীকে মনে পড়ে গেল ওর হঠাৎ। মা পঞ্চম সন্তানের জন্মদানের পরে অসুস্থ হওয়াতে মায়ের বৈমাত্রেয় বিধবা বোন এসেছিল শুশ্রূষাকারিণীরূপে। মা উঠলেন না আর।

পদ্মাপারে ভাঙা-চোরা দু'খানা ঘরে থাকত ওরা। মা মারা যাবার দিন-পনেরো পরে গাদাগাদি ক'রে চার ভাই বোনকে একঘরে দেওয়া হ'ল। মাসী তিন মাসের মাতৃহারা বাচ্ছাটিকেও তের বছরের বোনের গলায় গছিয়ে দিয়ে গেলেন রাত্রে। তারপরে বিধবা মাসী তাদের চোখের সামনে সদ্য বিপত্নীকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

রাত্রের পর রাত্রে এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। বিবাহের প্রয়োজন হ'ল না মোটে।

মহানন্দ ব্যাপার দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ক্রমেই মাসীর যেন ভাবন দেখা দিল। বিধবা মানুষ; ধুতি পরা চট ক'রে ছাড়তে পারে না, কিন্তু লুকিয়ে মাছ খেতে সুরু করেছে। পাতা কেটে চুল বাঁধা, গায়ে চারবার সাবান মাখা, ঘন ঘন আয়নার মুখ দেখা চলল।

কাজ-কর্মে অরুচি দেখা দিল ঘোরতর। সকালে মহানন্দ স্কুলে যায়। গরম ভাত না খেলে পাঁচ মাইল হাঁটা পোষায় না। মাসী তাচ্ছিল্যে বলে, "ঘরে পান্তা ঢাকা আছে, খেগে যা।"

ফিরে এসে নিভন্ত উনুনে আবার ভাতের হাঁড়ি বসানো থাকে না। কড়্‌কড়ে ভাতের কাঁসি মাটির মেঝের পড়ে থাকে। কোনদিন বা বেড়ালে মাছ খেয়ে যায়। মাসী তখন পাড়ায় পাড়ায়।

জমিদারী সেরেস্তায় বাবার কাটে সারাদিন। সকালে উঠে জলপান খেয়ে যায়। দিনের খোরাক ওখানেই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। ঘরকন্নার খোঁজ রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাত্রে ছোট খোকা লাথি দেয় ঘুমের ঘোরে, সদ্যজাত কেঁদে আকাশ মাথায় তোলে। বড় বোন সেটাকে থামাতে না পেরে অকথ্য ভাষায় মা-মাসীকে গালি দেয়। ছোট বোন শয্যামূত্রের রোগী। মহানন্দের রাত কাটানো দায়।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা খারাপ হতে লাগল। মাসী কানে সোনার মাকড়ি পরল, এতদিন তোলাই ছিল। একদিন দেখা গেল মায়ের বালাজোড়া মাসীর হাতে উঠেছে। গলায় সরু বিছে গড়াতে বাবার দেনা হ'ল। শোনা গেল, বাবা জামিরতার পণ্ডিতের কাছে যাতায়াত করছেন বিধবা বিয়ের পাঁতি নিতে।

মহানন্দ তখন পনেরোয় পা দিয়েছে, গ্রামের ছেলে হিসাবে মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে।

বাবা একদিন ডেকে বললেন, "ওরে মহানন্দা। শোনস্। বসা বসা করস্ কি? ল্যাখাপড়া তর হইব না। আমি আর খরচ টানবার পারি না।"

অতএব গাঁয়ের কালু ভুলুর সঙ্গে মহানন্দ এক টিনের স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে সিঙ্গিপুরের কারখানায় এসে লাগল। বস্তিতে বাসা হ'ল তার।

এটুকু মহানন্দের গল্প। অতঃপর এল আনন্দ।

সুধা বলল, "তোমার নামটা বিদঘুটে। আনন্দ বলে ডাকব।"

ছোট ঘরখানায় ঘরজোড়া খাট পাতা—বিবর্ণ হয়ে গেছে কাঠ। এককালে হয়তো দামী ছিল। সুধার মায়ের বিবাহ-শয্যা। ছোট ঘরখানা বাকী অর্ধেকে একটা টিনের চেয়ার, কেরোসিন কাঠের টেবল্। পুরনো খবরের কাগজ পাতা; বই দোয়াত-কলম থেকে চশমার খাপ, ছুঁচ-সুতোর বাক্স, সর্বাশ্রয় টেবল্খানা। অন্যদিকে বেঞ্চে হাঁড়ি কলসী। গোটা সংসারের তৈজসপত্র রয়েছে খাটের নিচে। হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ায় সুধা।

দাদা কারখানায় কাজ করে, বাবা মুদিখানায় হিসাব লেখে। বৌদি দাদার মার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেছে! সুধা গৃহিণী। সবই করতে হয় তার। ছোট রোয়াকে রান্না চড়েছে। তাকের ওপর রাঁধা ভাত-তরকারী। আনন্দ উঠানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সুধা ছ্যাক্ছ্যাক্ ক'রে দু'তিন টুকরো পটল ভেজে তুলল। তারপর হাত ধুয়ে পিতলের সরায় জল গরম করতে দিল।

"আমরা একটু চা খাই, কি বল, আনন্দ? আজ খেতে দেরী হবে। দাদা-বাবা ফিরবে না সকালে।"

খাটের নিচে হাতড়ে হাতড়ে কাপ-ডিস্ নিয়ে এল সুধা, "রাসের মেলায় কিনেছি। কোণা-ভাঙা বলে তিন আনায়। কেবা দেখছে ভাঙা?"

গুড় সহযোগে পাতা চা সুধা দিনে কয়েকবার সেবন করে। এই একমাত্র বিলাস ওর।

প্রথম দিন থেকেই আনন্দের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুধার। বছর দুয়ের বড় সুধা। আনন্দকে মাঝে মাঝে তাই শাসন করে। দরকার হলে দেখাশোনাও করে। জ্বর হলে বার্লি সাবু বেঁধে আনে। কালু ভুলুদা তো সারাদিন বাড়ি থাকে না। কাজেই একঘরে থাকলেও পাত্তাও নেয় না আনন্দের।

উঠানেই উবু হয়ে বসে পড়ল আনন্দ। আগে ভারী অস্বস্তি লাগত, এতটুকু জায়গায় এতোগুলো লোক থাকে কেমন ক'রে? চলতে ফিরতে ধাক্কা লেগে লেগে শেষ হত আনন্দ। হাত-পা সামলাতে পারত না। এখন অস্বস্তি গেছে, কিন্তু অসুবিধা রয়েছে। খাপ খাওয়াতে পারছে না আনন্দ, নিজেও বড় হয়ে যাচ্ছে কি না।

চা খাওয়া এখনও অভ্যাস হয়নি ওর। রস পায় না তেমন। ক্ষিদেটা বশে থাকে বটে। মন প্রাণ সর্বদা খাই খাই ক'রে না। এখানে ওখানে কুড়িয়ে খেতে হয় না। গুড়ের চাটুকু দিয়ে সুধা ওর ক্ষুধা মেটায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে সুধার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল আনন্দ। ছিটের সবুজ জামা, সবুজ পাড় একখান শাড়ী। মোটা খাটো হলেও সাবান কাচা পরিষ্কার। চুলটি চ্যাপ্টা খোঁপায় বাঁধা, পরিচ্ছন্ন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হলেও সুধা আগোছালো থাকে না। কপালে কুমকুমের টিপ পর্যন্ত দেওয়া চাই।

কাপটা ধুয়ে রেখে আনন্দ ভাবল, আজ কাজ থেকে ফিরবার মুখে সুধার জন্য একঠোঙ্গা বাদামভাজা নিয়ে আসবে। সুধার সূক্ষ্ম পছন্দ জলভাজাতে তৃপ্ত হলেও অন্য খাদ্য সুধাকে যোগান উচিত মাঝে মাঝে।

ত্রিদিবের প্রায় অচেতন শরীরটা গলির মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাত্রে কয়েকজন লোক বহন ক'রে আনছিল। কারখানা থেকে ফেরার পথে আনন্দের সঙ্গে ছোট গলির মধ্যে ধাক্কা খেল তারা।

দিনের বেলা অনেক কিছুই দেখে আনন্দের কখনও অবাক লাগে। কিন্তু, সন্ধ্যার পরে সে প্রায় অন্য মানুষ হয়ে যায়। যেদিন থেকে

বিধবা মাসীকে মায়ের মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যে রাত্রে বাবার ঘরে দোর দিতে দেখেছে, সেদিন থেকে কিছুতেই আর অবাক হয় না সে। রাত্রে মানুষ বহু কাজই করতে পারে এবং ক'রেও থাকে, যা রাত্রেই করা চলে।

সুধার কথা ভাবছিল আনন্দ। কি জন্য সুধা এত যত্ন ক'রে, খোঁজ নেয়? সুধার বয়স হয়ে গেছে, দেখতেও ভাল নয়। টাকা বা দেখে দেবার অভাবে বিয়ে হয়নি। বাপ-ভাইয়ের দাসীবৃত্তি ক'রে সারাদিন পরিশ্রমে কাটায়।

সুধার চোখ দুটি কিন্তু সুন্দর টানাটানা। চোখে চোখ পড়লে কেমন বুকের মধ্যে সিরসির ক'রে ওঠে! সুধা যেন কিছু বলতে চায়। 'সুধাদি' বলে ডাকতে হলেও, বয়সে বড় হলেও সুধা ছোট—তার পাশে দাঁড়ালে বুকের কাছে জামা ছোঁয়।

সিনেমায় দেখা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। দেশে মাসীর হাবভাব মনে পড়ে! সুধাকে নিয়ে কি যেন একটা করতে হবে?

স্বপ্নের মধ্যে ডুবে পথ চলছিল আনন্দ। ধাক্কা খেয়ে সজাগ হ'ল। বস্তির জীবনে অনেক রাত্রে এমনভাবে বয়ে আনতে হয় কাউকে কাউকে। চিন্তিত হ'ল না সে। শুধু ভাবল, কত নাম্বারের আজ মাতাল হবার পালা?

লোকগুলোর সঙ্গে ঢুকে এল উঠানে আনন্দ। কিন্তু তারা চলল সামনের ঘরগুলোর পেছনে। আনন্দ নিজেদের ঘরখানার তালা খুলল। কালু ভুলুদা এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। ওবেলার ভাত আছে, খেয়ে নেওয়া যাক। তারপরে অন্য কিছু।

কলের পোশাক ছেড়ে, হাতেমুখে জল দিয়ে খেতে বসবে এমন সময়ে দৌড়ে এল সুধা, "আনন্দ, একটু এসো। তাড়াতাড়ি আছে।"

সুধাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আনন্দ, কিন্তু সুধার কথা বলবার সময় নেই, চোখের পাতা ভিজে।

"এস না। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যেন একটি বৃষকাঠ।"

আনন্দ চমকে উঠল। সুধা এমন সুরে তো বলে না কখনও।

"চল, সুধাদি।"

বস্তির মধ্যে সরুসরু দুর্গন্ধময় নোংরা গলি ঠেলে সুধা ওকে একেবারে পেছনে নিয়ে এল? ত্রিদিবদার ঘর। সে কি, শেষে ত্রিদিবদাও মাতাল

হয়ে এলেন? সপ্তাহে তিনদিন ত্রিদিব রায় এখানে স্কুল করেন ছোটদের আর অশিক্ষিতদের জন্য। সপ্তাহের বেশীর ভাগ সময় তাঁকে এখানে ফিরতে দেখা যায় না। তবু আড়ালে নিরালা ঘরখানায় একটা তালা বন্ধ থাকে। রাস্তা থেকে ঘরখানা ধরা পড়ে না।

ত্রিদিবদার ঘরেও নয়। ত্রিদিবদার ভাঙা কাঠের আলমারীটা সরানো হয়েছে। ছোট একটা গুহা ঘরের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, চোরা একপাল্লা কাঠের দরজার পেছনে। টিম্‌টিম্ ক'রে আলো জ্বলছে ওই ঘরে।

এমন একটা ঘরের সন্ধান পেয়ে আনন্দ অবাক্ হ'ল। ত্রিদিবদার ঘরে সে বহুবার এসেছে। সুধা ত্রিদিবদার স্কুলে পড়ে। সুধা এনেছে তাকে। কিন্তু ত্রিদিবদার ঘরের মধ্যে যে আস্ত একটা চোরা কুঠুরি লুকানো আছে, জানত না সে কোনদিন। আলমারী দিয়ে দরজাটি ঢাকা থাকত কি না।

অন্ধকার চাপা সেই ছোটো ঘরটা নীচু—ইলেকট্রিক নেই। দরজার কাছে এগিয়ে আনন্দ যা দেখল, স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ছোট ঘরটা একটা ডাক্তারখানার মত সাজানো। দেওয়ালের গায়ে ঔষধের শিশি বোতল, মলমের কৌটা। কোণে ষ্টোভে ফুটন্ত জলে কতকগুলো যন্ত্রপাতি ফুটানো হচ্ছে। সরু বেঞ্চের ওপর ব্যাণ্ডেজ, তুলোর বাণ্ডিল সাজানো।

সেখানে মেঝের নারিকেল ছোবড়ার গদির ওপরে ত্রিদিবদা পড়ে আছেন মরার মত। মাথার শিয়রে টুলে একটা হ্যাজাক্ লণ্ঠন,—নেভানো। দরকার হলে তবে জ্বালানোর জন্য নিশ্চয়। লোকগুলোর মধ্যে একজন মাত্র বসে আছে ষ্টোভের কাছে, যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত সে।

সুধা বলল, "তোমাকে বাধ্য হয়ে ডেকেছি, আনন্দ। ত্রিদিবদার জন্যে এখন লোকের দরকার। এদিকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেল। আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।" কিন্তু চলে গেল না সে, মাথার কাছে বসল।

আনন্দ পায়ে পায়ে এগিয়ে যা দেখল ফলে তার মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বার হয়ে গেল। সুধা ধমক দিল, "চুপ"।

মেঝের খানিকটা অংশ রক্তে লাল হয়ে গেছে—ত্রিদিবদার পাঞ্জাবীর কাঁধ-হাতা ভিজে কাল হয়েছে—রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে—এখনও।

"কি হয়েছে সুধাদি ?"

"গুলি লেগেছে।"

"অ্যাঁ !"

"আবার চেঁচায় !"

"গুলি কেন ?"

"দেশ স্বাধীন করা এতই কি সোজা ?"

এবার ওপাশের ভদ্রলোক মুখ তুললেন, ভারী-ফ্রেম কালো চশমা চোখে। বললেন, "সুধা, এ বিষয়ে কোন কথা বোল না। তোমার নাম আনন্দ, না ? শোন, ত্রিদিবদা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। লোক জানাজানির ভয়ে আমরা ওঁকে বাইরের ডাক্তার দেখাতে পারছি না। যা করণীয়, আমাদেরই করতে হবে। তাই তোমাকে ডাকা হয়েছে।"

"কি করব ?"

"গুলিটা বার ক'রে ফেলতে হবে। আমি ছুরি চালাব, তুমি ধরবে।"

"অ্যাঁ !"

সুধা আনন্দকে একটা সজোরে ধাক্কা দিল, "হাবার মত কোর না।"

সুধার ধাক্কায় আনন্দ অসামাল অবস্থায় হুড়মুড় ক'রে দেওয়ালে ঘা খেল। কনুই-এর কাছের চামড়া উঠে গেল বুঝি।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, "আমি ডাক্তারী, সার্জারী কিছু কিছু জানি।"

পাঞ্জাবীর হাতা রক্তে ভিজে বসে গিয়েছিল। কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললেন তিনি। আনন্দ কাঁপা হাতে হাতখানা ধরে রইল। সুধার ধাক্কার ফলে সে আর কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না।

সুধা মাথায় বাতাস করতে লাগল। হঠাৎ ত্রিদিবদা চোখ মেলে চাইলেন এবং জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, "মরফিয়া।"

ভদ্রলোক কাঁচি ছেড়ে আলমারীর পাল্লা খুললেন। সুধার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়তে লাগল।

"তোমাকে তখন ধাক্কা দেবার জন্যে খুব চটে গেছ, না আনন্দ ?"

রান্নাঘরে সুধা ত্রিদিবদার দুধ গরম করছে। তার বাবা ভাই কেউ ফেরেনি। ত্রিদিবের ডাক্তারী শেষ হয়েছে। আনন্দ গলির মোড় থেকে দুধ কিনে এনেছে।

"রাগ করব কেন সুধাদি, সারাজীবন তো ধাক্কা খেয়েই কাটালাম।

পদ্মাপার থেকে ধাক্কা খেয়ে এখানে এসেছি। এখানেও চলতে ফিরতে ধাক্কা খাচ্ছি। জায়গা পেলাম না। ফেলে দেওয়া খাবার আর ধাক্কা!"

"দুঃখু করো না। এক্ষুণি চারটি গরম খিচুড়ি রেঁধে দেব। ওই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত তোমার খেতে হবে না গো। যা কাজটা করালাম আজ তোমাকে দিয়ে। ফেলে দেওয়া খাবার ফেলেই দাও।"

আনন্দের মুষড়ানো মন তৃপ্ত হয়ে উঠল। সুধাদি এখনও তার কথা ভাবছে।

সুধাদি ত্রিদিবের কষ্ট দেখে অমন ক'রে কাঁদলে কেন? তাহলে সুধাদি কি ত্রিদিবদার কাছে কিছু চায়? সুধাদি আনন্দের কাছে প্রার্থী, নয় কি? অথচ দিনে রাত্রে সুধাদির হাসি কথার মধ্যে আনন্দ ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে। এখনও এই তো শাড়ীর আঁচল উড়ছে আনন্দের গা ছুঁয়ে। আগুনের আভায় রাঙা মুখে বিদ্যুৎ জলছে। সে কি মিথ্যা? সুধাদি জলভাঙা ভালবাসলেও ত্রিদিবদার জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তু নিয়ে কি তৃপ্ত থাকতে পারে? তার কামনা নিশ্চয় আনন্দের মত বাস্তব।

উনুনের ধারে বসেছে আনন্দ প্রকাণ্ড বেমানান দেহ নিয়ে। গরম রান্নাঘরে সারাদিন পরিশ্রমের পরে দেহও তার গরম হয়ে উঠেছে। সেই শরীর একথালা ভাত, দুটো পাজামা-সার্টের পরেও অন্য কিছু চায়। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বের জগৎ সে জানে না, তাই হাত তার রক্ত মাংসের দেওয়ালে ঘা দিয়ে বেড়ায়।

সুধা দুধের বাটি নিয়ে চলে গেল, "ত্রিদিবদাকে দুধটা দিয়ে আসি। তুমি একটু চোখ রেখো, বেড়াল না ঢোকে।"

তৎক্ষণাৎ ফিরে এল সে, "দুধ দিয়ে এলাম। ওঁর বন্ধু খাইয়ে দিচ্ছেন। বেশ ভাল আছেন ত্রিদিবদা।"

খুশি মনে সুধা বলল, "এস একটু চা খাই।"

আনন্দের মনে পড়ে গেল, পকেট থেকে বাদামভাজা বার ক'রে দিল সে। মাতৃরূপিণী মাসীর জন্য বাবাকে তেলেভাজার ঠোঙা সে বয়ে আনতে দেখেছে এইভাবে।

সুধার আনন্দ ধরে না আজ, "বা, বেশ হবে গরম চায়ের সঙ্গে।"

সুধা খুশি কেন? রান্নাঘরে সে বসেছে বলে, না? সুধা আনন্দের কাছে সেই বস্তু চায়, যা আনন্দের মাসী ভগ্নিপতির কাছে চেয়েছিল। যুগে যুগে নারী পুরুষের কাছে ওই ভিন্ন কিছু চাইতে জানে না।

ভাল কথা। তাই হবে। আনন্দের প্রথম পুরুষত্তার উদ্বোধন হোক সুধা-সাগরে।

চায়ে চুমুক দেবার সঙ্গে গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। একটি মেয়ে বস্তির মধ্যে এসে বিপন্নভাবে চারিদিক চাইতে লাগল। এমন একটি মেয়ে যে আগে কখনও বস্তি দেখেনি, বস্তিও তাকে দেখেনি।

মেয়েটি সুধার দিকে এল, "এখানে ত্রিদিব ব্যানার্জি আছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি কি ওঁর কাছে"—সুধার ভীতু প্রশ্নের উত্তর দিল সে।

"হ্যাঁ আমি করুণা।"

"ও:" সুধা যেন নিভে গেল। "আনন্দ, ওঁকে ত্রিদিবদার ঘরটা দেখিয়ে দাও।"

আনন্দ বিস্মিত ভাবে মেয়েটিকে নিয়ে গেল।

ত্রিদিবদার চোরা-কামরা আবার আলমারীর আড়ালে অন্তর্ধান করেছে। নিজের ঘরে ভাঙা তক্তপোষে শুয়ে আছেন তিনি চোখ বন্ধ ক'রে। বন্ধুটি চুপচাপ শিয়রে বসেছিলেন।

করুণাকে দেখে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করলেন।

ক্ষীণস্বরে ত্রিদিবদা বললেন, "এখানেও এলে?"

সতেজ উত্তর হ'ল, "তবে কোথায় যাব শুনি? গাড়ি এনেছি. ? বাড়ি চল। তোমার মা কান্নাকাটি করছেন।"

"থাক, করুণা।"

"না। আমার আর সহ্য হবে না।"

আনন্দ আস্তে চলে এল হাল্কা মনে। ত্রিদিবদার এমন চমৎকার দেখবার লোক আছে, মা আছেন! ভালই। ত্রিদিবদা ভারী উচ্চাঙ্গের লোক।

ত্রিদিব-করুণার মত হোক আনন্দ-সুধা। সুধা ত্রিদিবদার ভক্ত ছাত্রী, তাই তাঁর কষ্ট দেখে তখন কেঁদেছিল। সুধা ত্রিদিবের কেউ নয়। নইলে ত্রিদিবের গুলি খাওয়ার দিনে আনন্দকে নিয়ে এত আহ্লাদ করতে পারে? অসম্ভব। সুধা প্রাত্যহিক দিনের আনন্দের। ত্রিদিবের সুধা নয়।

ফিরে এসে আনন্দ দেখল সুধা চুপ ক'রে বসে আছে। এত সাধের চা তার ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। চায়ে সুধার অরুচি দেখা যায় না। আনন্দ অবাক হয়ে বলল, "চা খেলে না?"

"এই যে, খাচ্ছি" ঠাণ্ডা চা-টা একচুমুকে শেষ ক'রে সুধা কাপ-ডিস ধুতে লাগল নীরবে।

"উনি কে।"

"ওঁর সঙ্গে ত্রিদিবদার বিয়ে হবার কথা। ত্রিদিবদা তো বড়লোকের ছেলে। আমাদের দুঃখ দেখে এখানে স্বদেশী করেন, লুকিয়ে থাকার আস্তানাও চাই একটা। অত বড়লোককে এখানে কেউ খুঁজবে না।"

ভাঙা-ভাঙা গলা সুধার। কাজে যেন হাতে বল নেই।

করুণা চলে এল, যাবার মুখে সুধার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি সুধা না? ত্রিদিব তোমার কত প্রশংসা করে, আজ ওর জন্যে যা করেছ, আমরা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।"

আনন্দ দেখল এই প্রশংসায় সুধা আরও মনমরা হ'ল। আশ্চর্য!

করুণা বলে গেল, "কাল সকালে ওঁকে নিয়ে যাব। আজ নড়াচড়া করা উচিত নয়, বন্ধু বললেন। এবার চোখে চোখে রাখতে হবে। যা কাণ্ড ক'রে আসেন! আচ্ছা, চললাম, ভাই।"

করুণার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল সুধা একদৃষ্টে, আনন্দ ওকে আনন্দ দেবার উদ্দেশে বলল, "যাক্, ত্রিদিবদা যত্নে থাকবে, কি বল সুধাদি।"

যেন নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে সুধা বলে চলল, "এসেছে যখন নিয়ে যাবে, জানি! রাগ ক'রে এখানে আসত না। ভেবেছিলাম পুলিশের গুলি খেয়ে ত্রিদিবদার এখানে অনেকদিন থাকতে হবে। চলে যেতে পারবেন না। আমি একটু সেবা করতে পারব। তা-ও হ'ল না।"

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল আনন্দ। তাই আজ সুধার এত উল্লাস দেখেছিল সে! ভুল ভেবেছিল সে তাই।

"তুমি এখন কি করবে, সুধাদি?"

সুধা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, মুখে হাসি টেনে বলল, "কি আবার করব? আমার কি আশা ছিল? উনি করুণাকে বিয়ে করুন। ওঁরও তো আমার মত সুখ চাই। আমি ওঁর কাজ ক'রেই সুখ পাব।"

হঠাৎ আনন্দ ধরা গলায় বলে উঠল, "আর, আমার কি হবে?"

সুধা বিস্ময়ভরা স্বরে বলল, "তার মানে? ও, তুমি বুঝি ভেবেছ আমি ত্রিদিবদার বাড়ি গিয়ে কাজ ক'রে থাকব। দুর পাগলা! আমি এখানেই

থাকব। আর তুমি আমার ছোট ভাইটি হয়ে থাকবে। আমার একটা ছোট ভায়ের বড় শখ ছিল, আনন্দ।”

এবারে জীবনের মত শেষ ধাক্কা খেল আনন্দ। কিন্তু এ ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়ল না সে।

স্থানাভাব যার ছিল, সে স্থান পেল। সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে নয়—অনন্ত আকাশের বিরাট ব্যাপ্তির বুকে।

খেলা নয়

"এ-তো খেলা নয়

এ-যে হৃদয় দহন জ্বালা ব্যাকুলতাময়"

একখানি চিত্রের মত দেখা যাচ্ছে শ্রীমতীকে। জানালার আসমানী পরদার পাশে সে বসে আছে। খয়েরী ডুরে শাড়ীর অঞ্চলের নিম্ন থেকে সুডৌল বাহু প্রকাশিত, মণিবন্ধে একগাছি কঙ্কণ, অনামিকায় চুনির আংটি।

পুষ্পাধারে রক্ষিত একটি সিত পদ্মকলির প্রতি অঙ্গুলি প্রসারিত করল শ্রীমতী। নখর গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত। বিপুল কবরী তার শঙ্খ-মসৃণ গ্রীবার উপর অবলুণ্ঠিত। কালো কেশে একটি সাদা ফুল মানাবে ভাল।

কিন্তু পুষ্পাধারে রক্ষিত জলে পুষ্পের জীবন হবে দীর্ঘকাল স্থায়ী, উত্তাপে সে ঝরে পড়বে। আর কি হবে নিখুঁত প্রসাধনে? শ্রীমতীর স্বামী প্রবাসী।

তবু তুলেছি যখন পরাই যাক ফুলটা। কতদিন আর চুলে ফুল ধারণ করবার বয়স থাকবে? বিলম্ব নেই—আসছে অবসান। যৌবনের অবসান, রূপের অবসান।

উনত্রিংশ বৎসর। না এদিক, না ওদিক। গেল গেল রব উঠেছে এখনও যায়নি। এখনও ক্ষীণ কটির গতিভঙ্গি অনেককে লুব্ধ করে, আকর্ণ নয়নে এখনও অনেকে ইঙ্গিত খুঁজে পায়। অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থা এর জন্য দায়ী। নইলে বাঙালী কন্যার উনত্রিংশ? গত যৌবনা।

বাঁচা যায় এক অর্থে। মেদবাহুল্য আর ভ্রূকুটি আনবে না। শক্ত দৃঢ় আবরণী দিয়ে দেহকে পীড়িত করে আর তন্বী সাজার দায় নেই।

আর, মুক্তি প্রেমের থেকে। বয়স্ক সাহিত্যিকেরা হয়তো কল্পনার চক্ষে মধুমঞ্জরীর সঙ্গে তাকে উপমিতা করবেন। সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে তার প্রলেপলাঞ্ছিত মুখের দিকে চেয়ে তদ্‌গত চিত্তে স্বরচিত কাব্য শোনাবেন, কিন্তু তরুণেরা আর প্রলুব্ধ হবে না। তরুণদের জন্যই তো প্রেম। ওই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে দ্বারে অনাদৃত অতিথির মত অপটু বেশে ঘুরে বেড়ায়, অধ্যাপকেরা যাদের মানুষ বলে গণ্য করেন না, যারা সমাজে সম্ভ্রান্ত হয়ে ওঠেনি,

প্রেম তাদেরই জন্য। বড় ডিগ্রিধারী, অনেক উপার্জনকারী ব্যক্তিবৃন্দের জন্য নয়! বস্ত্র ব্যবসায়ী নীলাম্বরী বয়ন করছে তাদেরই প্রিয়ার জন্য। বেলফুলের মালা ফেরি হচ্ছে পথে তাদের ষোড়শী খোঁপায় দেবে বলে। তাদের চরণের শ্রীহীন পাদুকার শব্দ এখনও পঞ্চদশীদের বক্ষে দোলা আনে। নির্বোধের জন্য, অপরিণামদর্শীর জন্য, নিছক তারুণ্যের জন্য প্রেম। প্রেম যৌবনের নিজস্ব সম্পদ।

সত্যই কি বিদায় নেবে তারা, যারা এতদিন ধরে তার জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল? যারা তার কলেজে যাওয়া-আসার পথে নিয়মিত হাজিরা দিত, যাদের অসংখ্য পত্র আবর্জনার ঝুড়ি অলঙ্কৃত করেছে, যাদের পয়সা-ব্যয়-করা টেলিফোনের ডাকগুলি তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল? সত্যই কি সেই সব রবাহূতের দল আজ অদৃশ্য হয়ে যাবে তার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে? কি অস্বাভাবিক হবে সে অবস্থাটা?

অথচ তার তো বিবাহ হয়ে গেছে। স্বামীর প্রেমে এখনও ভাঁটা ধরে নি। এখনও স্বামী নৈশ-শয়নের পূর্বে সুগন্ধি পোমেড সংযোগে কেশ সংস্কার করতে ভোলেন না। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ ইস্ত্রিভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবি পরিধান করে সম্মুখে আসেন। নয়নের তন্ময়তা, আলিঙ্গনের ব্যাকুলতা কিছু হ্রাস হয় নি। ঊনত্রিংশ বৎসরে শ্রীমতীর ভয় কি? জমার ঘর তো শূন্য নয়।

তবু মনে বেদনা লাগে। ঊষা সমাগমে সহসা নিদ্রা ভেঙ্গে যায়। যৌবন চলে যাচ্ছে, আর তাকে রাখা যাবে না। প্রসাধনে বয়স ঢাকা পড়বে, যৌবনকে ফেরানো যাবে না।

অহেতুক প্রীতি এসেছে চিরদিন শ্রীমতীর পদপল্লবে উপহার। আজ অভাব সহ্য হবে না।

পরাই যাক ফুলটা। কবরীর অন্তরালে ফুলটা অদৃশ্য হল। মনে হল ফুলটা যেন অলকে বিকশিত হয়ে উঠল সহসা। মণিবর্ধনবাবু নিশ্চয় কবিতা করে ওইভাবেই কথাটা বলতেন।

কিন্তু, শ্রীমতী গো, শ্রীমতী, কেন ফুল পরেছ? বয়স যাচ্ছে বলে নয়। জর্জি আসবে বলে।

ওঃ, ভারী একুশ বছরের নাবালক শিশু। কমপক্ষে সাত আট বছরের ছোট। 'শ্রীমতীদি' বলে ডাকে, 'আপনি-আজ্ঞে' করে কথা বলে। ছোট ননদের সঙ্গে বিবাহ দিলে বেশ মানাবে। শ্বশুরালয়ে ফিরে যেয়েই কথাটা

পাকা করা যাবে। এতদিন নানা ঘাটের নৌকা দেখে দেখে কিশোর বালকে আর অভিরুচি নেই।

তবু খয়েরী শাড়ি, যেটা পরলে বিশেষ ভাল দেখায় তাকে। তবু চুলে পদ্মকলি। একুশ-উনত্রিশ। হায় হায় করা যাক।

ছোকরার সম্পূর্ণ নাম জলদবরন। কিন্তু ওই সচকিত মৃগনয়নে আর তরুণ তমাল-তনুদেহে অত গুরুগম্ভীর নাম মানায় না। তার চেয়ে ডাক নাম জর্জিটা অনেক শোভন। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মনে করিয়ে দেবে বয়সটা তার একুশ মাত্র।

দ্বিধার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন বলেছিল সে, আমাকে একটা গান শোনাবেন, শ্রীমতীদি ?

গাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার মুখের দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখে শ্রীমতী মত পরিবর্তন করলে। কি সুন্দর! ওই ছিপছিপে সরল কঞ্চির মত গঠন-সৌকুমার্যের জন্য, ওর ত্রস্ত পক্ষ্মসমাকুল নয়নের জন্য, ওই কুঞ্চিত কেশ-স্তবকের জন্য জগতের যত শিল্প, যত সঙ্গীত রচনা হয়েছে।

তারপর সেইদিন জর্জি স্বীকার করল পাশের বাড়ির মেয়ের প্রতি নিজের আসক্তির কথা। একটু নীচু আসনে বসে সে টেবিলের উপর মাথা রেখেছিল, উল্টোদিকের আসনে বসেছিল শ্রীমতী। রক্তকিংখাবের ফিতের মত অধর জর্জির। দেখতে দেখতে সেই অধরের রং সমস্ত মুখে ছড়িয়ে গেল তার—এক হয়ে দেখা গেল তারা। কি আশ্চর্য সৌন্দর্য।

তারপর কাজ হল শ্রীমতীর—জর্জির প্রেমোপাখ্যান শোনা এবং শিক্ষা দান করা। লঘু নীল আলোতে উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্রে দেখা যেত শ্রীমতীকে, যে রকম জর্জি পূর্বে দেখেনি। ষোড়শী পঞ্চদশীর সঙ্গে বিস্তর ভালবাসাবাসি হলেও এই নারীর অভিজ্ঞ কটাক্ষ অর্থজড়িত হাস্য জর্জির পক্ষে সুরার মত মাদক এবং সুরার মতই নিষিদ্ধ।

দিন অতিবাহিত হচ্ছিল না শ্রীমতীর। স্বামী প্রবাসে—পিত্রালয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কর্মবাহুল্য নেই। সরল শিশুটিকে প্রেমের ক্রীড়ায় শিক্ষা দান করে সময় কাটাবার সহজ পন্থা বাহির হল শ্রীমতীর।

না, না। মৌখিক উপদেশাদি দেওয়া ভিন্ন শ্রীমতী কিছুই করে নি। আর প্রশ্নও ওঠে না। জর্জি একুশ মাত্র।

জর্জির প্রেম যেন শ্রীমতীরও প্রেম হয়ে দাঁড়াল! কিছুদিনের মধ্যেই

পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রেম করা অপেক্ষা শ্রীমতীর কাছে প্রেমের অভিনয় প্রদর্শনেই জর্জির বিশেষ রুচি দেখা দিল।

প্রেম কি শুধু যৌবনের জন্য? তাহলে প্রতিবেশিনী সপ্তদশীর সাগ্রহ পথ চাওয়া ফেলে কেন জর্জি এখানে ছুটে চলে আসে উনত্রিশের কাছে? অগাধ দূরত্ব রেখে সামান্য কথার আঘাতে রক্তস্রোতকে উদ্বেল করে তোলা যে সপ্তদশীদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তারা জানে শুধু ভালবাসতে, খেলা তারা এখনও শেখে নি। নারী শুধু গ্রহণ করে যাবে—এইটাই সাধারণের মত। সেই দেবীর পদতলে প্রেম আসবে অর্ঘ্যরূপে—

"মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার
অতিলঘু ভার।"

গ্রহণ করা ভিন্ন নারীর ধর্ম আর কি? সর্বতোভাবে গ্রহণ করা সুতরাং নারীর ক্ষেত্রে বয়সের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু দেবে, পুরুষ। দেওয়া একুশ বাইশেই আসে ভাল। কিন্তু না রেখে উজাড় করে দেওয়া মন শক্ত হলে পারা যায় না। তাই পুরুষের ক্ষেত্রেই বয়স কথাটা প্রযোজ্য।

শ্রীমতী গো, শ্রীমতী, ভাবা হচ্ছে কি আসমানী যবনিকার আড়ালে বসে? ওসব কথা যে বিবেককে চাপা দেবার কথা।

ঘোর ধরে গেছে উভয়পক্ষে। তাই খোঁপায় পদ্মকলি, ডুরে শাড়ির স্খলিত অঞ্চল। হাল্কা সুরের কথা, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ওইভাবে কী লোভনীয় দেখায় যে-কোন নারীকে, বিশেষত রূপসীকে! একাগ্রদৃষ্টি তন্ময় কিশোর, পাপপুণ্যের ধারণা যার সূক্ষ্ম নয়। উপক্রমণিকায় শ্রীমতী অবশ্য জর্জিকে কখনই আমল দেয় নি। তার বিশ্বাস ছিল জর্জি বোধ হয় সত্যই উপদেশলাভের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু অবশেষে সে ধারণার অযথার্থতা সম্বন্ধে শ্রীমতীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল।

আবার হায় হায় করা যাক। উনত্রিশ বছরের একটি রমণী একুশ বছরের কিশোর বালককে বুঝতে পারল না। রমণীটি আবার এমন, যার সমস্ত জীবন পুরুষের প্রেম পেতে অভ্যস্ত।

পক্ষ্মসমাকুল ত্রস্ত মৃগনয়ন যার, নবদেবদারুর মত সরল যার দেহ, অধর যার রক্তকিংখাবের দুইটি অংশ, তার পর্যন্ত কিছু জানতে বাকী নেই। শ্রীমতীকে

শিক্ষা দান করতে সে-ই সক্ষম। প্রেম সম্বন্ধে একুশ বছরের কিশোরেরা কতটা জানে—অনুভব ক'রে শ্রীমতী স্তম্ভিত হল। অপ্রতিভ হল। কৌতুকী হল।

তবে কেন জর্জি অভিনয় করেছিল? কি বিপদ। সেটা তো সহজে বোঝা যায়। মহামহিমান্বিতা শ্রীমতীদি কি তাহলে জর্জির মত অপ্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে আলোচনা করেন? একটু কৌতুহল, একটু করুণা যে জাগানো চাই, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাবে। বোঝার পরেও ছাড়ল না শ্রীমতী। কেন? কারণ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। একুশ বছরের তরুণের প্রেমোন্মাদনা ঊনত্রিশকে ঘিরে। যৌবন তাহলে এখনো যায় নি, এখনও পঞ্চদশী-সপ্তদশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলতে পারে জয়মাল্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত থেকে। জর্জি একটি এম-এ পড়া নগণ্য যুবক মাত্র হলে কি হবে—আজ তার প্রেম শ্রীমতীর কাছে প্রসিদ্ধ কবি মণিবর্ধন বা অসামান্য অভিনেতা অনিরুদ্ধ রায়ের অপেক্ষা অনেক প্রয়োজনীয়। কারণ আজ শ্রীমতীর যৌবন চলে যাচ্ছে। একমাত্র যৌবনের অভিনন্দন, যুবকের মোহই তাকে আশ্বাস দিতে পারে—শ্রীমতী, তুমি এখনও মরনি।

সুতরাং শ্রীমতী, প্রেম নিয়ে এতকাল খেলা করে আজ তুমি যুদ্ধে নেমেছ!

বার্নিং-ব্রাইট

আকাশে শ্রাবণ-শর্বরী। বর্ষাপীড়িত আকাশে দিকচক্রবালমন্থনকারী দিগ্‌হস্তির দল। কাজরী গানের পরিবেশ নয়। ভয়াবহ বন্য বর্ষণসঙ্কুল গভীর কালো সন্ধ্যা।

দ্বারের পার্শ্বচারিণী বন্য গোলাপ কুঞ্জের কাঁটায় খোঁচা খেয়ে কুরুবকী মিত্র বলে উঠলেন, "আঃ! এখানে এভাবে ফুল ফোটাবার মানে হয় না।"

নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে ঘরে তাঁকে বসালাম। তাঁর আগমন অপ্রত্যাশিত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা কিন্তু আমার বান্ধবী। আমার চিরকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর পাণিপ্রার্থীর শ্রেণীবদ্ধ ছিলেন যৌবনে। এখন বসন্ত বিদায়ের পালা দুইজনেরই দেহ-মনে লেখা হয়ে গেছে। নূতন পাণ্ডুলিপির প্রস্তুতি আর হয়তো হয় না।

তিনি আরাম চেয়ারে দোদুল্যমান হলেন। নীচু জানালার কাচ বাসনার মত রক্তিম বন্ধনী আবৃত। কুরুবকী মিত্র লম্বা কালো হোল্ডারে চুরোটিকা ধরালেন। তাঁর কতকগুলি কদভ্যাসের মধ্যে একটি। এই দেশে রঙিন অধরে ধূম্রযষ্ঠী মানায় না।

"তোমার ঘরটি সুন্দর, বিদ্যা। তাই এমন বর্ষার দিনেও চলে এলাম। তুমি কবি, কবিতা শোনাও।"

আয়া জাপানী ট্রে-বাহিত কফির আয়োজন রেখে গেল। আমি বুককেস্ থেকে বোদেলেয়ারের 'লে ফ্লোর দ্যু মাল' টেনে নিলাম। একতলায় উদ্যান বেষ্টিত আমার ঘরটিতে এমন বর্ষা ফরাসী সাহিত্যের 'কলুষ-কুসুমকেই' ডেকে আনে।

> ......"And I will give thee, my dark one,
> Kisses as icy as the moon,
> Caresses as of snakes that crawl
> In circles round a cistern wall."

শ্যামলী আমার, চন্দ্রের মত শীতল চুম্বন আমি তোমাকে দেব—সাপের মত আলিঙ্গন—

"না, না; তোমার ফরাসী কবিতা ছেড়ে নিজের লেখা পড়ো না।"

আমি বুঝলাম কুরুবকী আজ ঠিক মেজাজে নেই। জিজ্ঞাসা চিহ্নের প্রথায় নির্মিত ভ্রূভঙ্গে তাঁর বিরক্তি। পপির মত লাল মাংসল অধরে তাঁর লেখা আছে অসন্তোষ। কালো চুলের অরণ্যে ফ্লোরল্যাম্পের আলো পিচ্ছিল হ'য়ে দুই-একটি সাদা শস্য দেখিয়ে দিল।

আমার কবিতাই এল তখন।
অরণ্য-গভীর এই আফ্রিকা-মানস,
অনেক গোপন গুহা সিংহ ধ্বনিময়,
অনেক পর্বতে ফেরে সতৃষ্ণ হায়েনা,
অনেক ঝোপের নীচে উষ্ণ ধারা বয়!

"তুমি যে আবার আফ্রিকা মহাদেশ টেনে আনলে।" সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কুরুবকী আপত্তি জানালেন—"প্রত্যেকেরই মনে প্রত্যন্ত প্রদেশ আছে। এমন বর্ষার দিনে তুমি কি চোরাবালি খুঁড়তে চাও?"

আমি হেসে বল্লাম, "তবে ছড়া শুনুন—

" 'Tyger, tyger, burning bright'—

বাঘ, তুমি উজ্জ্বল জ্বলো—"

কুরুবকী উঠে দাঁড়ালেন, "নাঃ, আজ কবিতা শোনানোর ক্ষমতা তোমার বেনো জলে ধুয়ে মুছে গেছে। বাঘকে নিয়ে কাব্য হয় না, হয় বাস্তব উপন্যাস।"

"হ্যাঁ, জিম্ করবেট তো—"

"সে তো শিকার কাহিনী, উপন্যাস নয়। জীবন্ত গল্প জানি আমি, লিখতে পারি না। তোমরা লিখে-টিকে থাকো, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই। একটা গল্প শুনবে? সহ্য করতে পারবে তো? প্রাকৃত গল্প, তোমাদের শুদ্ধ সাহিত্যের বস্তু নয়। বরঞ্চ এর আখ্যানবস্তু নিয়ে ফরাসী কবি বোদেলেয়ারের কবিতাগুচ্ছ 'Flowers of Evils' বা কলুষ-কুসুম লেখা চলে।"

আমার গল্পের দিন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যের গল্প শুনতেই প্রস্তুত হ'লাম। বাইরের ভ্রূকুটিবক্র আকাশ, বাগানের বিনম্রবিসিক্ত লতাগুচ্ছ, বিলাপী বাতাস সাহায্য করল পরিবেশে। সমাহিত-সত্তা কুরুবকী বলে চললেন তাঁর উপন্যাস।

ভুলে যাও এই বাগানের ভদ্রজনোচিত লতাবেষ্টন। আমি তোমাকে যেতে বলব তরাইয়ের গভীর বনসম্ভারে। পার হয়ে যাও অভ্রনীল-তুহিন-শুভ্র

তুষারগিরি সুনীল আকাশের পট-ভূমিকায়। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে প্রবিষ্ট হও।

চা-বাগানের বাংলো একটি কল্পনা করে নাও। সেখানে সভ্যতার সমস্ত উপকরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মনে হ'বে তোমার নব্য কোন হোটেলে আছ। প্রাঙ্গণে মরশুমী ফুলের রং। কিন্তু হাতা পার হ'লেই প্রকৃতির ভীষণতা। তার বুকে বাংলোটির বিস্তৃতি। যেন রুক্ষ মরুভূমির বালুচরে রসমধুর একটি আপেল।

চা-বাংলোতে অতিথি এসেছে। মালিকের আত্মীয় ও বন্ধু। বাঘ শিকার হবে। মুভী ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা হবে। বিশ্বের ভয়ঙ্করতম জন্তু বাঘ। তার সন্ধানে চলো তরাই।

পোড়া হলুদ, কালচে সবুজ গুল্মঝোপ, মধ্যে মধ্যে সমতলভূমির সবুজ দাক্ষিণ্য। মাচা বাঁধা হয়েছে সারি সারি। এক-একটি মাচায় মালিক ও বন্ধু বসে। হাতে কারুর কারুর বন্দুক। ভাড়াকরা শিকারীও দুই-একজন আছে। কয়েকজন মহিলাও এসেছিলেন। ফুল্লরা তার মধ্যে একজন।

ক্যামেরায় ছবি তুলতে হ'লে দিনের বাঘকে চাই। একটা প্রকাণ্ড মহিষ বধ্য হয়েছে বাঘের উদ্দেশে। মাটিতে গর্ত খোঁড়া হ'য়েছে দীর্ঘ। লোহার শিকল দৃঢ়বন্ধন দিয়ে দুইবার মাহিষকে বাঁধা হয়েছে। সেই শিকল গর্তের গজালে আবদ্ধ।

ফুল্লরা দেখছে ভীত-কম্পিত বক্ষে। তার শহুরে ভয় দেখে শ্রেষ্ঠ শিকারীকে মাচায় এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। দূরের মাচায় মুভী ক্যামেরাপাণি তার জ্যাঠতুতো জামাইবাবু। মালিকের পুত্র। পাশে তাঁর ছোট ভাই। আরও কয়েকটি মাচায় নানা উৎসুক ব্যক্তি।

তরাইয়ের গহন বনের রূপ দেখেছ? ডালের কাঠে তীব্র বেগে কাঠঠোকরা ঘা দিয়ে চলেছে। বাবুই-এর সজ্জিত বাসা ঝুলছে সারি সারি। সবুজ গাঢ়বর্ণ পাতায়-ঢাকা বাসায় অলক্ষিতে কত ডিমের কারাগার থেকে নূতন পাখী-জন্ম দেখা দেয়। কত বাদামী পাতার শয্যায় দৃষ্টি-বিমোহন তরুণ সবুজ রং-এর বনটিয়ার পালক চিকমিক করে ওঠে। গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে বাঁদরের পাল লম্ফে লম্ফে যাতায়াত করছে। কোমর-সমান উঁচু ঝোপের পাশে, গাছের মাথা পেরিয়ে যায়—তারি বুকে পদক্ষেপ ফেলে সতর্ক দৃষ্টি চারপাশে মেলে এখনি আসবে সে—রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

নিষ্কম্প বুঝি গাছের পাতা, মানুষ প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে বসে আছে। একটু সামান্য শব্দও বাঘের কান এড়িয়ে যাবে না।

এমনি বহু প্রতীক্ষার দিন চলে যায়। দিনের বেলায় জঙ্গলের শ্রেষ্ঠ প্রাণীটিকে পাওয়া সহজ নয়। কয়েকটি মহিষ পর পর হত্যা করা হ'ল বাঘকে প্রলুব্ধ করার আশায়।

অনন্ত বনপরিধির মধ্যেও দুরন্ত বসন্ত আসে। বাদামী কাল সবুজের বর্ণবৈচিত্র্যে নয়নাভিরাম তরল হরিৎ দেখা দেয়। গুল্মের শীর্ষে শীর্ষে জাগে ব্যাকুল বর্ণসম্ভার। মাটির স্তরে স্তরে জীবনের স্পন্দন; বিটপীর যৌবন-সঙ্গমের চিহ্ন বর্ণবহুল কুসুম-স্তবকে। তারাও কি কলুষ-কুসুম?

হয়তো এমন দিনের পর দিনের সান্নিধ্যের বেড়ায় কখনও নির্জন কোন অর্কিড ফুটে ওঠে। সে সুবাসবিহীন, শুধু বর্ণগরীয়ান। বনের অসংখ্য পাতার সূচীশিল্প তাকে আবৃত করে রাখে। নিভৃত অপরাহ্ণে কোন যৌবন-বিহ্বল ঘনশ্বাস কোন তরুণীর শঙ্খ-শুভ্র গ্রীবায় স্পর্শ রাখে। কোন শিকারী-বাহুর দৃঢ় পেশী কারও কটাক্ষকে মোহিত করে। সেই মাচায় হঠাৎ জ্বলন্ত অগ্নির উত্তাপ অনুভূত হয় শ্যামল ছায়ার নীচে। ফুল্লরার কলিকাতার পাঠ্য-জীবন কোথায় হারিয়ে যায়।

ফুল্লরার বিস্মিত দৃষ্টি অবশেষে দেখল তাকে। রাজার মত মর্যাদায় অতিসুন্দর, বনদেবতার মত সুন্দর ব্যাঘ্রদেবতা। হলুদ-কালো ডোরাটানা নমনীয় শরীর, সমস্ত দেহ দিয়ে বিন্দু বিন্দু লাবণ্য ক্ষরিত হচ্ছে। প্রাণছন্দে সাবলীল বনের বাঘ। কাবুলী বিড়াল শুধু কণামাত্র সেই লাবণ্য ধার পেয়েছে। ভয়ঙ্কর তবু কি সুন্দর!

বাঘ সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাজকীয় গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে মাংসের লোভে অগ্রসর হ'ল। ইতিপূর্বে তার আগমনবার্তা বনের কন্দরে কন্দরে সূচিত করে দিয়েছিল বানর। নিস্তব্ধ-নির্জন ভয়ার্ত বনের শ্যাম কূলে সে উদয় হ'ল অভিসারে বুঝি।

মাখনে-গড়া শরীর ভেলভেটের থাবায় ভর করে চলেছে মৃত মহিষের কাছে। চারিদিক বার বার লক্ষ্য ক'রে ক'রে অবশেষে আহারে প্রবৃত্ত হ'ল সে।

তোমরা চিড়িয়াখানায় অর্ধাহারী বৃদ্ধ বাঘের হাড়গোড় দেখ শুধু। বনের মধ্যের তাজা বাঘের রূপ দেখেছ? জিম করবেটও যে কথা বলেন নি।

আমি বলছি : যাই কিছু সে করুক না কেন বাঘ কখনও কুশ্রী নয়। এই যে নিদারুণ হিংসামূলক কাজ সে করে যাচ্ছে, তবু বিতৃষ্ণা হয় না। থাবলে থাবলে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে সে, মনে হয় খেলা করছে। গলা জড়িয়ে ধরে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য চোখের সবুজ আগুনে তার হিংসা জলে। তাই চোখের দিকে চেও না।

এক-একটি আকর্ষণে শিকল বন্ধ মহিষের ভারী কালো দেহ যেন সোলার পুতুলের মত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। মাত্র তখনই বোঝা যায় বাঘের ওই নমনীয়, মাধুর্যময় দেহ কি অপরিসীম শক্তিধর। যাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, তখন তাকে দেখে ভয় হয়।

বাঘের ছবি তোলা হ'ল সিনেমার প্রথায়। দড়ির ফাঁদে দুইটি বাঘের ছানা ধরা হ'বার পরে বাঘকে শিকারের আয়োজন চলল। এবার মাচায় রাত্রি। কখনও কালো বাদুড়ের পাখায় ঢাকা রাত, কখনও বা রূপালী জরিমোড়া রাত। বাঘ আসবে।

একদিন বাঘ এল, ঝোপের আড়ালে দেহ ঢাকা, ল্যাজের ডগা পর্যন্ত নিথর। অন্য মাচায় শিকারীর বন্দুক গর্জন করে উঠল। ফুল্লরার মাচার শ্রেষ্ঠ শিকারীর অস্ত্র তখন বোবা।

হিমানী জারিত দুইটি স্রোত তখন ফুল্লরার তরুণ তনু গ্রাস করে ধরেছে। চিৎকার করা দূরের কথা, নিঃশ্বাসে তার কৃচ্ছ্র। ফুল্লরার কোমল অধর অন্য দুই অধরের কবলগত নিষ্ঠুর পীড়নের বেদনায়। কথা বলার পথ নেই তার। তার দেহের অধোভাগও শিলা-কঠোর জানুর প্রকোপত্রস্ত। ফুল্লরার জীবনের প্রথম দিন।

বাঘ পালিয়ে গেল। জামাইবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ভাড়া-করা পাহাড়ী-শিকারী জানাল যে, প্রথম বন্দুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'বে জেনে সে বৃথা বন্দুক ছোঁড়ে নি। আবার প্রতীক্ষার পালা।

ফুল্লরা তার পরে কেন নির্বাক রইল? তাম্রবর্ণ, দীর্ঘদেহী তরুণ শিকারী। জাত তার পার্বত্য। অনেকদিন সে বাঁশের মাচায় ফুল্লরাকে নীরব বন্দনা জানিয়েছে স্পর্শাতীত বিরহে। ফুল্লরার ভয় তার তৃষিত অধরে সকৌতুক হাসি এনেছে। এই অরণ্য তার মাতা, বিপদ তার কাছে বিলাস। ললিতদেহা নাগরিকার আদিম জীবনের সম্মুখে এত ভয় কেন?

আবার বাঘের আশায় শিকারীর সঙ্গে এক মাচায় বসেছিল ফুল্লরা।

টাটকা-চেরা বাঁশের গন্ধে, বনের ঘাস-পাতার গন্ধে তাম্রকূটকটু রুক্ষ অধর আবার কুমারীর নম্র মুখের বাক্‌শক্তি গ্রাস করে করে রইল নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের মাদকতায়—বাধা সেখানে যোজক, নিষেধ সেখানে সম্মতি

ঐশ্বর্যশালী পিতার কন্যা; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আধুনিকা ফুল্লরার ব্যক্তিত্ব কামার্ত আলিঙ্গনের পাকে পাকে ধৃত হ'ল। বাঘ দেখতে ভালবেসে সে বাঘের শিকারীকে ভালবেসেছে। না, বাঘকেই ভালবেসেছে সে।

শেষ দিনে দুই চোখের মধ্যের ললাটে শিকারীর গুলী নিয়ে মরল বাঘ। বহু শিকারীকে ব্যর্থ করলেও এই শিকারীর একটির বেশী গুলী প্রয়োজন হয় নি।

আদিম তরাই-এর জঙ্গলের আদিম অন্ধকার। সেখানে রক্ত হয় সৌরভ, মাংসের দেহ শৃঙ্গ-উপত্যকা সমন্বিত অরণ্য হয়ে যায়। চুলের শিবিরে মৃগনাভির গন্ধ ভাসে। সোনালী তরঙ্গ ওঠে, উত্তপ্ত দিকসীমায় বিহ্বল বাসনা উদ্দাম নীবিবন্ধ উন্মোচন করে আহ্বান জানায়। সেখানে পূর্বস্মৃতির পাখীরা ডানায় মুখ ঢেকে ঘুমোয়। সবুজ অন্ধকারে জ্বলে শুধু উজ্জ্বল ব্যাঘ্রশরীর—**burning bright.** জ্বলে ওঠে অশান্ত বাসনা, দেহের শিখরে শিখরে হীরা, মুক্তা, চুণী বিতরণ করে। দেহ হয় ঐশ্বর্যশালী। আদিম পাপের সঙ্গীত দ্বিতীয় বোদেলেয়ার রচনা করে যায়—

> **"Thou that hast seen in drakness**
> **and canst bring to light**
> **The gems a jealous God has hidden**
> **from our sight,**
> **Satan, have pity upon me in my**
> **deep distress!"**

ঈর্ষিত ঈশ্বর দৃষ্টির অগোচরে যে রত্ন গোপন রেখেছেন, তুমি অন্ধকারে দেখতে পাও এবং তাদের আলোকে আন। হে শয়তান, তুমি আমার গুরু প্রমাদে আমাদের দয়া করো।

তারপর? আর নেই। গল্প এখানেই শেষ। অবশ্য তুমি ছাড়বে না, বিদ্যা। সুতরাং এস শেষ করি।

ফুল্লরার কাছে এখনও সে পাহাড়ী শিকারী আছে—ফুল্লরার অনুচর হিসাবে। ফুল্লরার গাড়ী সেই চালায়। ফুল্লরা চিরকুমারী, কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়।

কুরুবকী চুপ করে গেলেন। বাইরে তখন নিবিড় অন্ধকার নিবিড়তর হয়েছে। দরজার বন্য গোলাপ পরাগ ঝরিয়ে গন্ধ বিলিয়ে যাচ্ছে।

রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, "আর একটু বলুন। ওরা কি সুখে আছে?"

"সুখের অর্থ কি এক? বোদেলেয়ার পড়া তোমার বৃথা হয়েছে, প্রেম অর্থেই হৃদয়-বিনিময় নয়। দেহও প্রেম দিতে জানে। ফুল্লরা অসুখী নয়। কিন্তু, শিকারী একটু দেশীয় মদ্যপান পছন্দ করে। মাত্রাতিরিক্ত হ'লে ফুল্লরা বাড়ী ছেড়ে একা চলে আসে। তবু ওই বাঘেরি মত বাঘের শিকারী কোন অবস্থায়ই অপ্রীতিকর নয়।"

কুরুবকী বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন।

প্রশ্ন করলাম, "বড়দা বাড়ী আছেন--ডাকবো?"

"না, ওঁকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই।"

আমি গাড়ী ডেকে দিলাম। আজ কুরুবকী মিত্র ট্যাক্সি করে এসেছেন, নিজের গাড়ীতে নয়। আজ তাঁর ড্রাইভার মাতাল হয়েছে, আমি জানি।

স্বীকারোক্তি না করেও নিজের গল্প বলে দেওয়া যায়। কুরুবকী মিত্রকে বিদায় দিয়ে আমার বাগানের বকুলঝরা পথে ঘরে ফিরে এলাম গভীর মেঘচ্ছায়ার রাত্রির অন্ধকারে। তরাইয়ের বনের রাত্রি এমন সিক্ত সুরভিত ছিল না, কিন্তু এমনি কি অন্ধকার ছিল? সেই অন্ধকার রাত্রি বুকে বেঁধে কুরুবকী প্রতি রাত্রে শিকারীর শিকার হ'ল। তরাইয়ের ব্যাঘ্রসত্তার নখদন্তের চিহ্নে প্রৌঢ় দেহ তাঁর বিক্ষত। আমার দাদাকে কুরুবকী মিত্রের প্রয়োজন নেই। সেই আদিম বনবেষ্টনীতে যে স্বাদ তিনি পেয়েছেন, কোন শিক্ষিত ভদ্র পুরুষ তাঁকে সেই স্বাদ দিতে পারবে না। কলুষ-কুসুম একবার যে ডালে ফুটেছে, সে ডাল দ্বিতীয় কুসুমপ্রসূ হয় না।

শুধু শ্রাবণ রাত্রের মেঘকালিমার মধ্যে ক্ষীণ চন্দ্রের পথ চেয়ে বললাম মনে মনে: যন্ত্রণা-স্পন্দিত-নির্বোধ অন্ধকারের শেষ প্রান্তে কি চন্দ্রোদয় লেখা নেই? আর কুরুবকী মিত্র বাঘকে ভালবেসে যে পশুজন্ম যাপন করে চলেছেন, সেই পশুজন্ম কি মানুষের ভালবাসায় কখনও প্রাণ পেয়ে ধন্য হয়ে উঠবে না?

তিরিশ দশকের এক গল্প

"বলো, বলো আরও বলো।" ভাঙা হলদে ইটের প্রাচীর পাশের ডোবার জলে স্যাঁৎসেতে। লম্বা-লম্বা ঘরগুলো বিজলির অভাবে অন্ধকার। কোণে উঁচু টুলে একটা বড় হাত-লণ্ঠন জ্বলছে। প্রাচীন আমলের ফুললতা-খোদা খাটের বুকে শীতলপাটি পাতা। সেখানে গল্পের আসর জমেছে। কাছে কাঠের এবড়ো-খেবড়ো টেবলে চায়ের অবসিত-পাত্র।

আমরা পাওলার পৈত্রিক বাগান-বাড়ীতে তারই আমন্ত্রণে দু'দিন কাটাতে এসেছিলাম। অকালবর্ষণে ঘরে আবদ্ধ হয়ে গল্পের ঠাকুরমায়ের ঝোলা খোলা ভিন্ন উপায় নেই। পাওলার বাবা বাঙালী। বিদেশ গমনের ফলে স্বদেশিনীকে বিবাহ ঘটেনি। পাওলার নামটি তার মা কোন আদরের আত্মীয়ের নামে রাখলেও পাওলা আদ্যন্ত বাঙালী।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর দলটির সঙ্গে দুই-চারজন বয়স্কা মহিলারাও এসেছেন। তাঁদের মধ্যে মধ্যবয়সী শুক্তি সেনকে আমরা তাঁর জীবনের কোন অকথিত কাহিনী বলতে অনুরোধ করলাম।

"আমার জীবনের অকথিত কাহিনী? তার মানে তোমরা শুনতে চাও কোন রোমান্টিক কাহিনী। কিন্তু, সে তো তিরিশ দশকের গল্প।"

"মানে?" চঞ্চলা সেহানবীশ ললাটে চক্ষু তুলে প্রশ্ন করল।

"মানে তিরিশ দশকে আমার যৌবন ছিল, আমার স্বপ্ন ছিল, আমার প্রেম ছিল।"

"শুক্তিদি, তখন তুমি বিদেশ চষে বেড়িয়েছ! তা'হলে তোমার প্রেম অথবা রোমান্টিক আখ্যান কন্টিনেণ্টাল, না?"

রগের পাশে পাকাচুল, গাত্র-চর্ম কুঞ্চিত, পেশী শিথিল, শাড়ীর রং বিলীয়মান—এমন যে শুক্তিদি, তিনি আজ মনের মুক্তা-পেটিকা খুললেন আমাদের অনুরোধে। পাওলা এক কোণে বসে কলকাতার এক বাক্স চকোলেট ধ্বংস করছিল। তারি দিকে চেয়ে তিনি বললেন—"পাওলা আমাকে অতীতের স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়। তাই এবার এলাম ওদের বাগানবাড়ীতে।"

বাইরে অশান্ত ঝিঁঝির ডাক, বাগানের অসংখ্য পুষ্প-সুবাস, পাতায় বৃষ্টির চুম্বনের শব্দ, ভিজে অন্ধকার মাটির নীচের গহ্বর উন্মোচিত করে আনল সহস্র দলে বিচ্ছুরিত জীবন-উৎপল। প্যাশানের শ্বাস-মলিন নয়, প্রেমের শতদল।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। পাগলার কেউ না কি? আমাদের কৌতূহল খণ্ডন করে শুক্তিদি বলে চললেন—

আজ কেন জানি না এখানে বসে মনে পড়ছে জার্মানীর কথা। তখন বিদেশে ছিলাম। কিন্তু ছুটির সময়ে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে আশেপাশের দেশগুলোয় বেড়াতে যেতাম, কখনও বা যখন খুসী যেতাম। প্রবাসিনী কন্যার জন্য মোটাদাগে পিতা অর্থ পাঠাতেন। পড়াশোনার জন্য ব্যস্ত ছিলাম না। সত্যিই গোটা কন্টিনেন্ট চষে বেড়িয়েছি। ব্যাভেরিয়ার পল্লী-অঞ্চলে এলাম কয়েক দিন থাকতে। দূরে তুষারময় আল্পস, উঁচু পাহাড়ের জমির বুকে ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। জুলাই মাসের সূর্য-তপ্ত নীল আল্পসের সানুদেশে পাইন বনের ছায়ায় মনে স্বপ্ন ভাসে। সে স্বপ্ন অধরার স্বপ্ন। ক্লোভারের গুচ্ছে গুচ্ছে দোলা খায় মন। সোনার রাই-শস্যের ক্ষেতে সোনালী স্বপ্ন বোনে। যবের চূর্ণে তৈরী হয় বিয়ার। লাল টালি মাথায় সাদা দেওয়াল ঘেরা ছোট-ছোট কুটীরে কত আনন্দ উৎসব। গ্রীষ্মে জার্মানীর পল্লী। হিটলারের নাৎসী-প্রপীড়িত জার্মানী নয়, তিরিশ দশকের জার্মানী, শক্তি ও সৌন্দর্যের উপাসক।

আমরা আশে-পাশের সহরগুলো দেখলাম। মিউনিকের কারখানার চিমনি, গথিক প্যাটার্ণের বাড়ীঘর দেখে ক্লান্ত চোখে পল্লী-অঞ্চলে একজন কৃষকের ঘরে অতিথি হলাম। আমরা দুই বন্ধু।

বৃদ্ধ চাষীর ক্ষেতখামারে প্রাচুর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দোতলায় একটি চমৎকার কাঠের ঘর পেলাম।

আমার বন্ধু নিবেদিতা চিত্রশিল্পী। স্কেচ-বই হাতে বেশীর ভাগ সময় বাইরে সে কাটাত। আমি বাড়ী বসে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতাম। সেই নিঃসঙ্গতা আমার আত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। জন্ম বা মৃত্যুর প্রারম্ভে মানবাত্মা এমন নিঃসঙ্গ থাকে। আমার জীবনের শেষ জাগরণ আমার জীবনের প্রথম মৃত্যু।

এক নির্জন সন্ধ্যা। চাষীর ছোট মেয়ের বিবাহ হয়নি। সে 'ফোলক্সগুলে'

আখ্যাত জার্মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ও অবকাশ সময়ে সঙ্গীত-চর্চা করে। কৃষক নিজেও বেহালা বাজায়।

বেহালার করুণ মধুর স্বরে আজও বসবার ঘর উদ্বেল হয়ে উঠেছে। একপাশের চেয়ারে বসে শুনছি, আমার মাথার উপরে ক্রুসবিদ্ধ যীশুর সৌম্য প্রসন্ন মূর্তি। প্রেমের দেবতা।

"সুর বোঝেন কিছু, ফ্রয়লাইন? শুনেছি ভারতবর্ষে বড় গানবাজনার আদর।"

"তোমাদের বিদেশী সুর তেমন বুঝি কি? তোমাদের দেশ তো সুরের রাণী। ভাগ্‌নারের অপেরায় গেছি—"

আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, হঠাৎ ছোট মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "ভাগ্‌নার আপনার ভাল লাগে? আমি তো পাগল। যত বিষয়ই হোক, আমার ভাল লাগে সব থেকে লোহেনগ্রিন। আঃ! পিয়ানোটা বড্ড বাজে, ভেঙেও গেছে। আমার ঠাকুমা চাষীর ঘরের ছিলেন না, একজন ডাক্তারের মেয়ে ছিলেন। ওঁরই পিয়ানো। মা তো পুরোপুরি গৃহস্থ, আমিই যা বাজাই এক-আধটু। বাবার বেহালার সঙ্গে। আপনাকে একটু শোনাতাম। আচ্ছা, একটু আভাস শুনুন"—

মেয়েটি ভাঙা পিয়ানোয় ঝঙ্কার তুলল। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘরের বৃহৎ জানালা দিয়ে ঘরে চলে এল—হংসরাজকুমার। জার্মানীর লোক-সাহিত্যের মনোহারী এক নায়ক লোহেনগ্রিন! ছদ্মবেশী প্রেমিক তার পত্নীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল সে কখনও রাজপুত্রের প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে না। তাহলেই কুমার অদৃশ্য হয়ে যাবে। নির্বোধ নারীর জীবনে ট্রাজেডি এসেছিল তার কৌতূহলে।

জানালার বাইরে জার্মানীর সমগ্র পল্লী-প্রকৃতি ভাঙা পিয়ানোর, কাঁচা হাতের সুরে টলমল করে কাঁপতে লাগল। সুরের যাদুকর ভাগ্‌নার! ভাগ্‌নার! জার্মানীর আকাশে বাতাসে যার সুর মাখানো। যার অপেরার মধ্যে ধরা দিয়েছে জার্মানীর প্রেম, ভালবাসা, শৌর্যবীর্য, মহত্ব, রূপক। রাইন-নদীর উন্মাদ জলকল্লোল, আল্পস শিখরের ধ্যান-স্তব্ধতা সমস্ত কিছু ভাগ্‌নারের অপেরা-সঙ্গীতে।

পাইন-বনের বাতাসে শিহরণ জেগে উঠল। পীচ-ফল অন্ধকারে দোলা খেল, আপেলের বুকে রস-সঞ্চার হল। আর আমার আবেশময় চোখের সম্মুখে

জেগে উঠল ক্ষিপ্র, উৎকর্ণ তুহিনশুভ্র দুইটি রাজহংস-টানা রথ। তার বুকে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মত দাঁড়িয়ে আছে জার্মান-লোকগাথার রাজকুমার লোহেনগ্রিন। নীল চোখে তার উন্মুখ আকাশের দাক্ষিণ্য, পাকা ধানের ঔজ্জ্বল্য তার চামড়ায়, সমগ্র দেহে তার আল্পস-শিখর মঁ ব্লাঁ-র দৃঢ়তা। সে আমারি সম্মুখে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে।

আমি চমকে উঠলাম, ভীত হ'লাম। আমার স্বপ্নের ছায়া কি মূর্ত ধরে এল, না সুর মূর্তি ধরেছে? জানালার প্রবেশ-পথে অস্পষ্ট ছায়ার মত, দাঁড়িয়ে আছে সে? ও কে?

আমার ভীত-কণ্ঠের অস্ফুট চিৎকারে পিয়ানো বন্ধ হল। নিনা লাফিয়ে উঠল, ওর বাবা এগিয়ে অভিবাদন করল, "এই যে হের ডক্টর কোথা থেকে?"

মূর্তিটি এগিয়ে এল, আজানু একটি প্যাণ্ট, সাস্‌পেণ্ডার সার্টে তোলা। পায়ে হাইকিং-এর উপযোগী মোটা জুতো-মোজা। পিঠে ভারী হ্যাভারস্যাক্।

"নেমে এলাম সেই উৎস্থগ স্পিটসে থেকে"—

"বলেন কি হের ডক্টর, ও যে আট হাজার ফুটের চেয়েও উঁচু।" কৃষক অটো এগিয়ে একখানা চেয়ার ছেড়ে দিল, "ডাক্তারী ছেড়ে দিলেন না কি, পর্বতশৃঙ্গে পর্যটক হবেন না কি?"

"আরে না, না। বার্লিন আমার জন্যে হাহাকার করছে। আমি ডাক্তারী ছাড়বো? এমন গ্রীষ্মটা একটু পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি মাত্র। টিরোল অঞ্চলে ঘুরছিলাম। কিন্তু, ওঁর সঙ্গে তো আলাপটা"—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি হচ্ছেন অতিথি। কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন। ওঁর নাম ফ্রাউলিন সেন।"

"সেন! —তবে কি উনি?"

"উনি ভারতবর্ষীয়া, বাঙালী।"

তরুণ আমার দিকে ফিরে হাসল, হাল্কা অন্ধকারে তার হাসি যেন মুক্তাবৃষ্টি। রাজা সোলেমনের উপমা মনে পড়ল, দাঁত যেন যুগল মেষশাবক। আমার দিকে ফিরে বলল, "অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি বাঙালীদের ভালবাসি।"

আনাড়ি জার্মান ভাষায় কি বলেছিলাম মনে নেই। শুক্তির বুকে তখন দুর্লভ মুক্তার সৃজন হয়েছে। আমার জীবনে আমার লোহেনগ্রিন এসে গেছে।

সেই উন্মাদনায় বসন্তের তুলনা নেই। নিবেদিতার নিষেধ সত্ত্বেও মনপ্রাণের বল্গা ছেড়ে দিলাম। দিগন্তব্যাপি সোনালী রাইক্ষেতে, নীলাভ হ্রদের ধারে জন্ম নিল প্রেম। বেসিল আর শুক্তি। নিবেদিতা ছবি আঁকত, আমাকে তিরস্কার করত, "শুক্তি, চল চলে যাই। আর না। মাথা খারাপ হয়েছে? একজন জার্মান ডাক্তার তোমাকে কি সত্যি ভালবাসবে? ওর এটা ছুটির দিনের আমোদ।"

"কিন্তু নিবেদিতা, ও ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে ভালবাসে। তোমার নাম শুনেই বলল, শুক্তি, তোমার বন্ধু কি আবার সিষ্টার নিবেদিতা হবেন? ও বাঙালী হতে চায়।"

"যদি চায়ও, ও হতে পারবে না। তাছাড়া ধরলাম ওর মনোভাব আন্তরিক, তাহলেই বা তুমি কি করবে, বিয়ে করে এখানে? বেসিল মার্কাসকে বিয়ে করে বার্লিনে গোটা জীবন কাটাবে? নতুন ডাক্তার। তুমি হবে ফ্রাউ ডক্‌টর মার্কাস। এঁদো রাস্তায় থাকবে। সকালে উঠে স্বামীর সার্জারি গুছিয়ে, টেলিফোনের খবর টুকে, রান্না করবে। মোটা মোটা জার্মান বাচ্চা মানুষ করবে, যাতে তারা বড় হয়ে ভারতবর্ষের টুঁটি চেপে ধরে।"

আমি শিউরে উঠলাম, "না, না।"

মনে পড়ে গেল বাবার কাছে প্রতিশ্রুতা আমি, বিদেশী বিবাহ করব না। তবেই বাবা এখানে আসতে দিয়েছেন।

নিষ্ঠুর গলায় নিবেদিতা বলে চলল, "গোটা জীবন ওই জার্মান বলতে হবে—শুক্তি, আমরা কি করে বিদেশিনী হতে পারি, বলো?"

পরিষ্কার কাঠের মেঝেতে সূর্যের আলো উপরি উপরি তিন সারি জানালা। উঁচু ছাদ, চারদিকে কাঠের বারান্দা। প্রাচীরে নানা ছবি, বিভিন্ন শিল্পীর, ধর্মচিত্র। তাকে দু' একটি প্রাচীন মূর্তি, বাসন সাজানো। জানালার ওপাশে সানুদেশ, মরকত মণির মত সবুজে উজ্জ্বল, সোনার মত হলুদে উজ্জ্বল। দূরে আল্পস্ পর্বতের নিষ্পাদপ চূড়া। সমগ্র পরিবেশে সম্পদ প্রাচুর্য-শক্তি। তিরিশ দশকের জার্মান পল্লী।

কিন্তু, আমার মন ফিরে চায় বাংলার পানা-পুকুর, আমার ধর্মপরায়ণা মাতা, যাঁর চোখের জল নিত্য আমার উদ্দেশে প্রবাহিত। কবে আমি ফিরে যাব? কবে সমাজের মধ্যে আবার নিরাপদ আশ্রয় নেব? প্রার্থনায় ঠাকুরের মাথায় রোজ তিনি তুলসী চাপাচ্ছেন, চরণে চন্দনপুষ্প নিবেদন করছেন।

বাংলার নাড়ীর যোগ আমার শিরায় শিরায়। ছিন্ন করতে গেলে আমার অস্তিত্ব ছিন্ন হয়ে যাবে।

বেসিল আমাকে অপরাহ্নে ডাকল, "শুকৃতি, একটু বেড়াতে এসো না। আজ বড় গরম, চলো বেড়িয়ে আসি। অনেক কিছুই তো দেখলে না। দিনরাত টাগোরের কবিতা নিয়ে বসে থাকো।"

আমি মনে মনে হাসলাম। বেসিল, তুমি বিদেশী কিন্তু তোমার প্রতি প্রেমই যে আমাকে আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বিদেশী ভাষায় কোথায় পাবো?

"ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে—"
"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো।"
"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে
ঝলকে দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
—সেথা পথ নাহি জানি
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।"

রবি ঠাকুরের কবিতা! পৃথিবীর মত প্রাচীন। বিদেশে আমার মনে মনে তারা মধু বিলোয়, মৃগনাভির মোহে প্রেমের কণ্টকবনে ছুটে বেড়াই। আমি তাকে ভালবেসেছি। ভাগ্‌নারের সুরে আমার দূরের মানুষ কাছে এসেছে। আমার রাজপুত্র।

রাস্তার মোড়ে জলাধার, কাছে জলদেবতার মূর্তি। সেখানে একটু থামল বেসিল। উষ্ণ সূর্যের ছোঁয়ায় তার গালের তুহিনে দুটি গোলাপ ফুটেছে। আরক্ত অধর পাইপের ধোঁয়ায় ম্লান। মনে হল আজ প্রথম ওর চোখের নীল তারায় যেন আমারি মতন কালোর ছায়া। ওর সোনালী চুলে যেন কৃষ্ণাভ বাদামী ছোঁয়া। ওর কোন অংশ যেন আমার।

গরু-ছাগলের গলার ঘণ্টায় মুখরিত খামারের পাশ দিয়ে ময়দানে নামলাম। সেখানে তারের যন্ত্রের সুরে, বেহালার গানে পুরুষ ও নারীর মিলিত জার্মানীর পাহাড়িয়া চাষী—নাচ শু-প্লাট্‌লার-এর আধিক্য। হাতে হাতে জড়িয়ে মিলনের নাচ। কিন্তু আমাদের ভারতীয় নৃত্য কত উন্নত।

আমার মুখের দিকে চেয়ে জার্মান ও ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় বেসিল

বলল, "শুকৃটি, আমার দেশ তোমার ভাল লাগে না, না? নিজেদের কাল্‌চার তুমি অনেক উপরে ভাবো, না?"

আমি অপ্রতিভ হলাম। আমার মনের কথা সে বুঝল কি করে?

বেসিল বলল, "আমি যে ডাক্তার শুকৃটি। দেহের ব্যাধির সঙ্গে মনের খবরও রাখি। কিন্তু ভুলো না, এই জুতো থাবড়ে শু-প্লাট্‌লার নাচ তোমাদের সাঁওতালি নাচের মত। তোমাদের যেমন ভারত নৃত্যম, কথক, মণিপুরী, কথাকলি নাচ আছে, উচ্চাঙ্গ গান আছে, এ দেশে তেমনি উচ্চ শিল্পের সন্ধান পাও না? ফ্রাউলিন লিনা বলে তুমি ভাগ্‌নারের অপেরা ভালবাসো।"

আমাদের পাশ দিয়ে গ্রীষ্মপোষাকে সজ্জিত অসংখ্য পুরুষ ও নারী সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। খামারের চাষীদের ঘোড়ায়-টানা শস্যের গাড়ী চলারও বিরাম নেই। চারিদিকে উৎসব, জনতা।

আমি ভাঙা জার্মান ও ইংরাজীতে বললাম, "তুমি এত আমার দেশের কথা জানলে কি করে, বেসিল?"

বেসিলের মুখে কিসের ছায়া ভেসে এল। সে উত্তর সোজাসুজি দিল না। শুধু বলল, "তুমি হিন্দু, তোমরা ধর্ম ছাড়া এক পা চলো না। চলো তোমাকে আমাদের একটা দেবস্থানে নিয়ে যাই। এখানে ভারী ভিড়। সেখানে ধর্মের নামে কিছু বলব।"

সারা পার্বত্য প্রকৃতি নিশ্চল হয়ে শুনতে লাগল। পেয়ার ফল গাছে দুলতে দুলতে বলল, আমি জানি। দূরের ত্রিকালদর্শী আল্পস্ গম্ভীর হয়ে গেল। হ্রদের নীল জলে হাঁস পাখ্‌না ঝাড়ল। আর ক্লোভর-গুচ্ছের প্রাচুর্যে উত্তপ্ত বাতাস বয়ে গেল।

ছোটোখাটো, পাহাড়ী শস্যক্ষেত, মাঠ ছাড়িয়ে পাহাড়ের সানুদেশে একটু উঠে গেলাম এদের 'কাপ্লেলে'। এবড়ো-খেবড়ো নীচু নীচু পাহাড়ের বুকে বেড়ায় ঘেরা কাঠের ক্রুশে আবদ্ধ যীশু।

কাঠের মূর্তিটির কাছে পৌঁছামাত্র ডান হাত কপালে, বক্ষে, বামে ও দক্ষিণে স্পর্শ করে ক্রশ চিহ্ন তৈরি করল বেসিল, মাথা নামাল।

হঠাৎ মনে হ'ল এ তো বিদেশী। এর সঙ্গে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? এর আকৃতি ভিন্ন, এর ধর্ম ভিন্ন। আমি আর এ কি করে এক হতে পারি?

আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে আমাকে বলল সে, "শুকৃটি, তোমাদেরও প্রেমের দেবতা আছেন, কিবৃষাণা। যীশুকে তারই সঙ্গে মিলিয়ে নাও না।"

আমার হাত সে ধরল, বর্বরের মত নয়, কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করবেষ্টনে আমার ক্ষীণ বাঙালী বাহু পীড়িত হয়ে উঠল। বসন্তের বাতাস যেমন আঙুরের ত্বকে সুখস্পর্শ আনে, তেমনি তার অবাধ্য চুল উড়ে আমার কপালে ছোঁয়া দিল। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।"

তৎক্ষণাৎ ধূসর-নীল আকাশে সপ্ত রংয়ে রামধনুর উদয় হল। আমার বিহ্বল মুখে তাকিয়ে সে বলল, "আমি জানি তুমিও আমাকে ভালবাস। জানো একটা কথা আজ তোমাকে বলে দেব। আমারও একটা বাঙালী নাম আছে—বসন্ত।"

আমি চমকিত হলাম, "বলো, বলো বেসিল, কে তোমাকে বসন্ত নামে ডেকেছে?"

অন্ধকার মুখে সে বলল, "মেয়েলি ঈর্ষা নিরসনের জন্যে বলছি, প্রিয়া নয়। সে কে আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আর জিজ্ঞাসা করো না আমার জীবনের কথা। আমি যা, তাই আমাকে তুলে নাও, শুকৃটি।"

আমার ভীত মুখের দিকে কোমল দৃষ্টি মেলে সে বলল, "জেনে রাখো, আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক। চোর ডাকাত বা খুনে নন। তিনি পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার। আমি তাঁর একই ছেলে। আমার সং বোন দু'টি। তিনি আমাকে বার্লিন শহরে ডাক্তারিতে বসিয়ে মারা গেছেন।"

আমি কিছু বলবার আগেই সে ব্যস্তভাবে কথা উল্টে দিল—"আমি অবশ্য বার্লিনের অখ্যাতনামা রাস্তায় থাকি। একদিন আমি বড়লোক হ'বো, বার্লিনের বসন্তে আপেল ফুলের গন্ধে পাগল হয়ে উষ্ণ বাতাস বয়। আমাকে একটি চুমো দাও।"

যেখানে যত ফুল ছিল, তারা ফুটে উঠল। আধোরেখায় চাঁদ জাগল। বেসিল আমার কুমারী জীবনের বসন্ত। শীষ দিয়ে ভাগ্‌নারের সুর সে আমাকে আবার শোনাল—লোহেনগ্রীন।

আমার রাজপুত্রও সুদূরের লোক, তারও জীবনে রহস্য আছে।

* * * *

কয়েকটি দিন পরে অটোর বাড়ী এসেছে কাপড় কাচতে। গৃহিনী

ব্যস্ত রুটী তৈরীর কাজে। শহরের কল থেকে অটো আটা পিষে এনেছে। লিনা বাড়ীর সজী-বাগানে স্যালাডের উপযোগী আনাজ তুলছে। রান্নাঘরেই খাবার টেবল। এক গ্লাস বিয়ার হাতে অটো সেখানে খোসগল্পে মগ্ন।

দুপুরের খাবার সাজাচ্ছে নিনা, শুকনো মাংস, রুটী, মাখন, কফি। বাবাকে প্রশ্ন করল, "অতিথিদের মধ্যে মহিলা দু'জন আছেন আজ উপস্থিত। হের ডক্টর কোথায়?"

নিবেদিতা খাবারালয়ে ঢুকেছিল। তার দিকে চেয়ে একটু হেসে অটো বলল, যুবককালে অমন নিত্য নূতন সঙ্গিনী নিয়ে ভ্রমণ করতে পেলে খাওয়া ভুলে যায় সবাই। ফ্রয়লাইন সেন, কিছু মনে করবেন না। হের ডক্টর চিরকালের ফূর্তিবাজ।"

খাওয়ার পরে নিবেদিতা আমাকে কালো মুখে বলল, "শুনলে তো অটোর কথা?"

"বিয়ারের নেশায় বুড়ো কি না বলছে।"

"মোটেই বিয়ারে ওদের নেশা হয় না। শুক্তি, আমি হাতযোড় করছি, জার্মানী ছেড়ে চল। বাঙালীর মেয়ে তুমি, ভেসে যেও না। তুমি ওর জীবনের কিছুই জানো না। বসন্তের প্রেমে শীত কাটে না।"

"নাই বা জানলাম। ও নিষেধ করেছে জিজ্ঞাসা করতে।"

"ও তো করবেই, নইলে যে কেচ্ছা বেরিয়ে যাবে। শুক্তি, তুমি এত বোকা? নিশ্চয় খোলাখুলি প্রশ্ন করবার তোমার অধিকার আছে। তুমি কি ওর হাতের খেলার পুতুল? শুক্তি, তোমার মা, তোমার বাবার কথাও কি ভুলে গেছ?"

সেদিন সন্ধ্যায় আবার পাহাড়ী 'কাম্পেলে'-তে গেলাম। এবার আমি তাকে ডেকে নিলাম।

সেদিনের সেই চাঁদ-ঝরানো, ফুল-ফোটানো সন্ধ্যা। আমি বললাম, "বেসিল, তোমার জীবনের কথা আমি জানতে চাই। তোমার আমাকে বলতে হবে।"

নীল হয়ে গেল তার মুখ, "কেন? তোমাকে তো বলেছিলাম"—

"জানি। কিন্তু এভাবে চলা যায় না। আমার যাবার দিন হয়ে এল। নিবেদিতা বড় বকাবকি করে।"

"কেন শুক্তি? ওর নামের পশ্চিমী মহিলা তো দেশ ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তোমাদের জন্য—ও কেন বাধা দেয়?"

"ও আমার ভালো চায়।"

আমার দৃঢ়তা দেখে বেসিল চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আর একটু যদি সময় পেতাম, যদি তুমি আমাকে আর একটু ভালবাসতে। আমার কথা শুনে আমাকে ঘৃণা করবে না তো শুকৃতি?"

"দেখা যাক।"

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমার সর্বদেহ বন্দনা করতে করতে বেসিল বলল, "তোমাদের বুঝি না তবু ভালবাসি। ইতালীয় শিল্পীর আঁকা ছবি যেন তুমি। কি সুন্দর! কিন্তু তোমাদের ভারতীয় সত্তা এক মুহূর্তে আমার কাছ থেকে সরে গেল। তুমি আমার গোপন কথা না শুনে নিরস্ত হবে না। শুকৃতি শোন, আমার জন্ম আইনসঙ্গত নয়। আমার মা বাবাকে বিয়ে করেননি।

এক বসন্তের জার্মানীতে একজন বাঙালী মহিলাকে আমার বাবা ভালবেসেছিলেন। তিনি বিবাহিতা ছিলেন। স্বামীকে ডিভোর্স করে বাবাকে বিয়ে করতে তিনি রাজী হলেন না। আমাকে 'বসন্ত' নামে একবার ডেকে তিনি জন্মের মত ছেড়ে চলে গেলেন। শুকৃতি, তোমরা বাঙালীরা কি নিষ্ঠুর।"

"নিষ্ঠুর?"

আমার চিরদিনের রক্ষণশীল, অভিজাত দুহিতার সত্তায় তখন প্রচণ্ড কোলাহল জেগেছে। বিদেশী তাই যথেষ্ট নয়, আবার কলঙ্কিত জন্ম! আর কেন? শুক্তি সেন পালাও।

"নিষ্ঠুর নও? ভাবপ্রবণতার মধ্যে তোমাদের সবলতা নেই। তোমরা ভালবাসো অথচ তার জন্য সমাজ ছাড়ো না।"

হঠাৎ রাগ হয়ে গেল, আমার সমগ্র জীবনে অশান্তি এনেছে যে বসন্ত, তাকে রুক্ষকণ্ঠে বললাম, "সমাজ ছেড়ে কোথায় আসবো আমরা? পাপের মধ্যে? তোমাদের তো কোন কিছুই ভদ্রতা সঙ্গত নয়।"

নীলচোখে বসন্তের এবার অগ্নিদাহ দেখা দিল, সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল, "আমাদের সম্পর্কে এত বড় কথা তুমি বললে? তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহারে অভদ্রতা কিছু পেয়েছ?"

তার ব্যবহারে যেন জার্মান জাতির সুপ্ত কোন বর্বরতা জেগে উঠল, আমার আধ্যাত্মিক ভারতীয় রক্ত বিদ্রোহ হয়ে উঠল। আমিও সমধিক রুক্ষতায় উত্তর দিলাম, "পাইনি, কিন্তু পেতে কতক্ষণ? যাতে না পেতে হয় তাই তোমাকে ছাড়লাম। বিদায়!"

তাকে সেখানেই ফেলে রেখে বিদ্যুতের মত ছুটে চলে এলাম। পরের দিন সকালেই বাভেরিয়া ছাড়লাম।

"বলো, আরও বলো।"

পাতায় পাতায় নুপুর-বাজানো বর্ষা। ঘরের দেওয়ালে অন্ধকার। ফিরে এলাম আমরা বাংলা দেশে।

শুক্তি সেন আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন, "আর নেই। নিবেদিতা কি লিখেছিল জানি না। এক-দুইমাসের মধ্যেই জোর করে বাবা ফিরিয়ে আনলেন আমাকে। জীবনে আর দেখা হয়নি।"

পাওলা চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ কেঁদে উঠল। উঠে দাঁড়াল সে সবেগে। "কি হল পাওলা?" আমরা বিস্মিত প্রশ্ন করলাম।

"তোমরা কি নিষ্ঠুর। আমি জার্ম্যানীতে ফিরে যাবো। আমার মায়ের দেশ।"

"সে কি? জার্মানীতে তো মাত্র তিন-চারবার গেছ! তুমি বাংলার মেয়ে।"

"না আমি বাংলার মেয়ে নই। তোমরা ভালবাস শুধু কাঁদতে।" দেখলাম পাওলার সমগ্র দেহে, মনে কোথাও বাঙালিত্ব নেই। নিজের বলে আমরা বন্ধুরা তাকে ভুল করেছিলাম।

"আর আমরা কাঁদি না?" উত্তেজিত স্বরে শুক্তিদি বলে উঠলেন, "আজও কেন বিয়ে করতে পারিনি? যখনি মনে হয়, কানের কাছে সে যেন এসে বলে যায়: আমাকে ভুলো না। ভাগ্‌নারের সুরে গড়া আমার রাজকুমার। আমার লোহেনগ্রিন। স্বপ্নের রাজহাঁসের পাখায় মনে ফিরে আসে সে রোজ রাত্রে।"

পাওলা একটু শান্ত হয়ে চোখ মুছে বলল, "একুশ পূর্ণ হলে আমি চলে যাব। আমার লোহেনগ্রিনকে খুঁজতে। অমন ভালবাসা এই নরম মাটিতে জন্মায় না।"

"কিন্তু পাওলা যদি লোহেনগ্রিন চলেই যায়, তবে লাভ কি?"

আমাদের নিস্তব্ধ করে দিয়ে পাওলা সেই চিরমধুর, চির-স্মরণীয় কবিতা আবৃত্তি করল—

> **"It is better to have love and lost**
> **Then never to have loved at all."**

প্রেমিক হারায় যদি হারাক, তবু হৃদয়ে যেন প্রেম জন্ম নেয়।

প্রহর হল শেষ

শ্রীমতী আজ দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে।

স্বামী কিছুক্ষণ পরে বল্লেন, "জানালাটা তুলে দেব? রোদ লাগছে?"

"না।"

একটু লক্ষ্য করে দেখে পাখার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন স্ত্রীর দিকে। তারপর শাশুড়ির দেওয়া টিফিনের বাক্স, জলের সোরাই আরও একটু পাশে সরিয়ে রাখলেন। শ্রীমতী পা মেলে বসতে পারবে।

খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। বাতাস আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠেছে। হাল্কা নীল গরদের জরিপাড় শাড়ী। ধূলোয় মলিন হ'বার সম্ভাবনা সত্বেও চড়া রং চলবে না শ্রীমতীর। পায়ের বাফ্ রংয়ের জুতোটি খোলা গদীর নীচে। ট্রাভেলিং ব্যাগ হাতের পাশে—স্ফীত কলেবরের মধ্যে চন্দনকাঠের হাতপাখা, আতরের শিশি, লঘু নভেল, ফেস্-টাওয়েল, কোল্ডক্রীম, প্যাষ্টিল্ সাজানো। প্রবাল রংয়ের সিল্কের জামার নীচু গলায় প্রবাল মুক্তা গাঁথা সোনার হার জ্বলছে। কানে চুণীর ফুল। এবার ট্যুর থেকে ফেরার পথে স্বামী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীমতী চুণী ভালবাসে।

ট্যুরের জীবন শেষ হয়ে গেছে স্বামীর। পদোন্নতি হয়েছে। এবার এক জায়গায় স্বামী বসে আয়েসের পালা। শ্রীমতী চলেছে স্বামীর সঙ্গে সংসার পাততে বিদেশে।

মন উন্মনা শ্রীমতীর। এবার স্বামীর ট্রেনিং ছিল কিছুদিন। পিত্রালয়ের আবাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীমতী। স্বামীর কর্মস্থলে তার কষ্ট হ'বে বলে স্বামী সযত্নে গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন শ্রীমতীকে পিত্রালয়ের তাকে। এখন সন্তর্পণে নিয়ে চলেছেন সংসারে পুতুল খেলতে।

গাড়ীর চাকা গড়িয়ে চলেছে, গানে গানে পথ ভরে উঠেছে। দিগন্তে সুদূরে চেয়ে আছে শ্রীমতী। গানের সুরে মন ভরে উঠেছে—

"ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,

মোর ডানা নাই তাই আছি একঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি।
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী"—

মনে পড়ে যাচ্ছে মণিবর্ধনবাবুর কাব্যগুঞ্জন। নীল আলোয় রজনীগন্ধার সামনে কবির স্তবগাথা। পিত্রালয়ের নিশ্চিন্ত সুখ শেষ হয়ে গেল। এর আগে স্বামীসহগমনে এত ভীতি ছিল না। এবার প্রতি পদক্ষেপে ভয়ের ভ্রূকুঞ্চন। সংসার বেঁধে বসতে হবে। একটি চিরস্থায়ী সংসার কঠিন দুর্গের মত। সেখানে শিল্পীসত্তা শ্রীমতীর বন্দী থাকবে অহর্নিশ। যার দুর্গ যত মজবুত পাথরে গড়া, সে তত নিপুণ সংসারী। রন্ধ্রপথে দক্ষিণা বাতাস বইলেই সর্বনাশ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিখানা মনে পড়ে গেল শ্রীমতীর—"পাখী, তুই বসন্তের গান থামা, পড় বসে এ, বি, সি, ডি।" এ, বি, সি, ডি পড়তেই চলেছে শ্রীমতী। এর আগে মনে হত, ভয়কি? সংসার তো চিরস্থায়ী নয় আবার পাঁচ ছয়.মাস পরেই খেলাভাঙার খেলা শুরু হবে। চলে আসবে শ্রীমতী। স্বামী ট্যুরে যাবেন। কখন ফিরে আসবেন ঠিক থাকবে না। বিরহিনীর ভূমিকায় শ্রীমতীকে মানায় ভাল।

তার চলে আসার সংবাদে ভক্তের দল ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। অনিরুদ্ধ রায় চিত্রতারকা সুলভ ভঙ্গিতে বলে দিয়েছিলেন অভিনেতার কণ্ঠে—

"হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"—

শ্রীমতীর অধর প্রান্তে ক্ষীণ একবিন্দু হাসি ভেসে এল।

সামনের বেঞ্চে বসে স্বামী বিমান দত্ত দেখছিলেন স্ত্রীকে একদৃষ্টে। লম্বা-চওড়া সুশ্রী ভদ্রলোক। শোভনবেশধারী। ও কি ভাবছে? বিমান দত্ত ভাবলেন ওর মনের কোণে কোণে লেগে আছে ফেলে রেখে আসা শহর। ওর জীবন কত উৎসবের সুর ধরে রেখেছে, আমি কি জানি?

আমি কি কোনদিন জানব? আমি স্বামী হয়ে ওর মনের নাগাল কোনদিন পাব কি?

ট্রেন ষ্টেশনে থামল। বিমান দত্ত সবিনয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চায়ের কথা বলে দিই?"

যেন আকাশের পাখী মাটির টানে নেমে এসে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

সকালে চা-ইত্যাদি খেয়ে গাড়ীতে উঠেছে শ্রীমতী। রাস্তায় আবার চা। এই গরমে চায়ের মত স্থূল বস্তু। শিউরে উঠে শ্রীমতী বলল, "না, না।"

"তাহলে লেমনেড নাও?"

কি রকম লেমনেড নিয়ে আসবে কে জানে? শ্রীমতী আবার অস্বীকার করল।

"লাঞ্চের অর্ডার দিতে হ'বে এখানে।"

উন্নত নাসিকা কুঞ্চিত করে শ্রীমতী জানাল, "আমার খাবার সঙ্গে আছে। তোমারও দিয়েছেন। তবে তোমার যা ইচ্ছা খাও।" কণ্ঠস্বরে তার বৈরাগ্য যেন সহযাত্রী ভিন্ন বিমান দত্ত শ্রীমতী দত্তের কেউ হয় না।

বিমান দত্ত নিঃশ্বাস ফেলে খাবারের অর্ডার দিলেন ডাইনিং-কারে। যদি শ্রীমতীর ভাগে কম পড়ে তার জন্য? চতুর্দিকের ব্যবস্থা সেরে বিমান দত্ত পত্নীর সম্মুখে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। সুদূর আকাশচারী বিহঙ্গমন শ্রীমতীর আবার উর্ধ্বে উঠে গেল।

সুখের দাম্পত্য জীবন সুরু হয়েছে।

পৃথক শয়নঘরে নিঃসঙ্গ তারার মত শ্রীমতী ফুটে থাকে। বিরহীচন্দ্র বিমান তাকে পান না সর্বদা! অথচ বিরাগিনী নন শ্রীমতী, অনুরাগহীনা

প্রকাণ্ড চাকুরি স্বামীর। সুখ নেই মনে শ্রীমতীর। চিরশূন্যতা পীড়ন করে ধরেছে তাকে। মন ছুটে যাচ্ছে পুরণো গৃহের নিরুপদ্রব সহজ দিনের বাহুতে। পূর্ণ হয়ে ওঠার উপাদান সেখানেই ফেলে এসেছে।

না, বিয়েটা আমার সহ্য হ'বে না। কেন করেছিলাম? মা-ববার পীড়াপীড়ি, অসার্থক প্রণয়ের ব্যথা—তাই উপযুক্ত পাত্রে মনোসংযোগ করে চেয়েছিলাম বিকসিত হয়ে উঠতে। হ'ল কই?

বত্রিশ বছর বয়স হ'ল। কিন্তু আজও অবলম্বন পেলাম না। জীবন মধুর কিন্তু শেষ তো খুঁজে পাই না। প্রহর যে শেষ হয়ে এল।

খট্‌খট্ শব্দে বিমান দত্ত অফিস থেকে ফিরে এলেন। গাড়ী থেকে ছুটে নামলেন। কিন্তু অন্দরের বারান্দায় পা দিয়েই পায়ের শব্দ কমে গেল। পা টিপে হাঁটবার ভঙ্গিতে এলেন বিমান দত্ত নিজের বাড়ী।

চায়ের টেবিল সাজানো। টেবিলের কোণা চেপে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমতী—ফিকে সবুজ শাড়ীজামা, হাতে দু'গাছা পান্নাগাঁথা চুড়ি।

পুরুষালী গম্ভীর কণ্ঠ মোলায়েম করে বিমান দত্ত মৃদুস্বরে বললেন, "পোষাক বদলে আসছি।"

শ্রীমতী টেবিলে বসে পড়ল। খানসামা চা ভিজিয়ে কোজি দিয়ে ঢেকে রাখল। এবার চিত্রিত পেয়ালায় ঢেলে দেবার কষ্টটুকু মাত্র শ্রীমতীর। খানসামা রেফ্রিজেটর খুলে সন্দেশের পাত্র, কয়েকটি ফল বার করল। স্বামী ছুরির সাহায্যে ইচ্ছামত ফল খাবেন। ফল কেটে রেকাবি সাজানো শ্রীমতীর পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। শ্রীমতীর মা পর্যন্ত চলেছে।

বিমান দত্ত পাত্‌লা ধুতি চাদরের সাজে বসলেন স্ত্রীর মুখোমুখি। দীর্ঘ রঞ্জিত আঙুল শ্রীমতীর অলসতায় টেবিলের চাদরে লগ্ন। লোভ হ'ল বিমানের আঙুলগুলো মুঠোয় তুলে নিতে। খাবার টেবিল ছেড়ে শয়নকক্ষে যেয়ে শ্রীমতীর নিস্পৃহ-রক্ত অধরে দীর্ঘ চুম্বনের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিতে।

আত্মসংবরণ করে বিমান দত্ত টুকরো-টুকরো খবর দিতে লাগলেন শ্রীমতীর উদাসীন শুক্তিশুভ্র কর্ণদ্বয়ের উদ্দেশে।

চা-খাওয়া শেষ হ'ল। বিমান দত্ত শ্রীমতীর অনুগমন করে বসবার ঘরে এলেন। সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। রেডিও খুলে উৎকর্ণ হয়ে বসল শ্রীমতী।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বোঝেন না বিমান দত্ত। সাধারণ ভদ্র-শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মত তাঁর দৌড় রবীন্দ্রসংগীত পর্যন্ত। গায়িকার সংগে বিবাহ হয়েছে তাঁর। বন্ধুজন সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষিত হয়েছে। সুন্দরী আবার শিল্পী। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে অভিনন্দন করেছিলেন বিমান দত্ত। কিন্তু, স্ত্রী শুধু সুন্দরী শিল্পী নন, শালীন আভিজাত্যে সুদূর। সারেঙের মত জল মেপে মেপে পথ চলা ভিন্ন গতি নেই।

হিন্দুস্থানী উচ্চাংগের সংগীতরসে ডুবে ক্লাবে যান। বন্ধুবৃন্দ পরিহাসে জর্জর করে তুলেছে স্ত্রৈণ আখ্যায়। শ্রীমতী ক্লাবে যেতে ভালবাসে না। তাকে ছেড়ে যাবার শক্তি বিমান দত্তের নেই।

গানটা শেষ হ'ল। বিমান দত্ত বাঁচলেন। শ্রীমতী অন্ততঃ দু'টো গল্প করবে। আর—একটা গান যদি শোনায়। শ্রীমতীর উচ্চাংগ সংগীত বোঝেন না তিনি। কিন্তু অপার্থিবতায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন। যদি রবীন্দ্রসংগীতে রাজী হয়, তবে তো কথাই নেই।

বিমান দত্ত বললেন, "শুনছো?"

অন্যমনস্ক শ্রীমতী উত্তর দিল, "বলুন।" পরক্ষণেই পাত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলল, "বল।"

"একটা গান শোনাবে?"

করুণ চক্ষে স্বামীর দিকে চেয়ে করুণতর কণ্ঠে শ্রীমতী বলল, "ইচ্ছা করছে না।"

সশব্যস্তে বিমান দত্ত উত্তর দিলেন, "তাহলে থাক, থাক।"

এই ইচ্ছা ও অনিচ্ছা নিয়ে—তৈরি শ্রীমতী। তার বাধা শারীরিক নয়, মানসিক। মনের বালাই নিয়েই মরল সে, অন্যকেও মারল। মন তার কাছে দৈবের অপেক্ষাও শক্তিধর। মুহূর্তের জন্য ভেবে নিলেন বিমান দত্ত, এতটা কি ভাল? মা-বাবা কেন মেয়েকে এত মনোবিলাসে বাধা দেননি?

আবার এক মুহূর্তে মনোস্থির করে বিমান দত্ত প্রশ্ন করলেন, "ক্লাবে যাবে কি একটু?"

"না।" পরমুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল সে, "তুমি যাও না। যাও তুমি, ক'দিন তো বার হওনি।"

"না, আমি তোমাকে একা রেখে যাব কি? ক্লাবের ভিড় যদি ভাল না লাগে তবে চল একটু লেকের ধারে?"

"না, না।" শ্রীমতী প্রার্থনার মত কণ্ঠে বলে চলল, "তুমি যাও না। আমি একটা নূতন বই আনিয়েছি। একা থাকব কেন?"

শ্রীমতী চায় আমি চলে যাই? কেন, কেন সহ্য করতে পারছে না ও আমাকে? কোন প্রেম—। না, না। বিমান দত্ত ভাবলেন, লক্ষ্য করে দেখেছেন তিনি শ্রীমতী সর্বদা উদাসীন। চিঠিপত্র যা এসেছে, কোনটাই প্রীতির নয়। যেখানে সেখানে ফেলে গেছে শ্রীমতী। আয়া তুলে রেখেছে। নিস্পৃহ সুদূর শ্রীমতী চিত্তে কোন পুরুষের ছায়া পড়েনি।

শ্রীমতীর কাছে আমি একটি উৎপাত। চলে যাই। যাবার জন্য উঠলেন বিমান। একটু ভেবে বললেন, "জলসার দিনে গান গাইবে তো? ওরা সবাই ধরেছে।"

"দেখি।" না, কোন অহঙ্কারের প্রকাশ ধরা যায় না, কেবল সেই ইচ্ছা বিলাস।

পরাজিত বিমান দত্ত নিঃশব্দে বার হয়ে গেলেন।

শ্রীমতী তার ঘরে এল। গায়ের কাপড় নামিয়ে একখানা ইজিচেয়ারে বসল। হাতের কাছে তাঁর প্রিয় লেখিকা পার্ল বাকের উপন্যাস।

কেন হঠাৎ আরাম লাগছে? মনে হচ্ছে নিশ্চিন্ত। স্বামী কি চান কিছু, যে তিনি চলে গেলে এমন সহজ লাগে! শূন্য বাড়ীর বুকে শূন্য মনের প্রহর কাটছে। বিবাহকে কবে আমার ভাল লাগবে?

আয়নার কাছে দাঁড়াল শ্রীমতী। একমনে নিজের মুখ দেখল। ডিমের মত স্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত দীর্ঘ গ্রীবার উপরে পদ্মের মত মুখখানা! একটুও মলিন হয়নি চার পাঁচ মাসের সংসার যাপনে। কিন্তু, আর যে ভাল লাগে না শ্রীমতীর।

চায় না কিছু যে, তার চাওয়া যে মাত্রা ছাড়িয়ে। সে বলে না, কিন্তু তার করপ্রসারণ অনন্তকাল। একটু অভিমান, একটু নিঃশ্বাস দিয়ে দিনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন স্বামী। 'দু'জনে মুখোমুখি' সত্যই কবি বর্ণিত গভীর দুঃখের হেতু হয়েছে! কি করা যায়?

চারপাশে প্রতিবেশীর অভাব নেই। কিন্তু, তারা আবার শ্রীমতীর দিনরাত্রে থাবা বসিয়ে সময় ছিনিয়ে নেবে। নিক না ক্ষতি কি? হয়তো তাদের মধ্য থেকেই পা ফেলে মনের দ্বারে কেউ চলে আসবে।

বইটা আলোর সামনে ধরে শ্রীমতী স্থির করে ফেলল, আর সে দূরে থাকবে না।

কাটতে লাগল দিন। সন্ধ্যার পরে বিমান দত্তের ড্রইংরুম ভরে ওঠে। তাঁকে ক্লাবে যেতে হয় না। মাঝে মাঝে শ্রীমতীর গানও শোনা যায়। প্রতিবেশীর বাড়ী চা-পান চলে। নিজের বাড়ীতে পার্টি। বিমান দত্ত আশ্বস্ত হলেন, তা হলে বিবাহিত জীবন ভাল লাগছে শ্রীমতীর। সংসারে সে আশ্রয় পেয়েছে।

কিন্তু কেবলমাত্র গভীর রাত্রে শয্যার নির্জনতায় ব্যাকুল আলিঙ্গনে আবদ্ধা শ্রীমতীর ঔদাস্য ধরা পড়ে। তারার দিকে চেয়ে সে নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীমতী।

হায়, কি আর করতে পারি আমি? অধরের নীচে যার অধর শক্ত হয়ে যায়, ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে, তাকে কি করে ভোলাব? বিমান দত্ত বন্ধুমহলে পরামর্শ করলেন।

নির্জন প্রহর রাত্রির।

আজ শ্রীমতীর ঘরে স্বামী। হাম্বা-মরালী দেহখানি কঠিন ভুজবেষ্টনে

বিনিদ্র। বাধ্য হয়ে শ্রীমতীর আত্মসমর্পণ। চোখে ঘুম, দেহে শান্তি, মনে ক্লৈব। কিন্তু, তবু নরম বিছানার আরাম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ভরণপোষণের মূল্য কি এতটাই দিতে হয়? একবোঝা দলিত ফুলের মত শ্রীমতী পড়ে আছে—সহ্য করে যাচ্ছে মাত্র।

দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে আবেগ জড়িত গলায় বিমান বললেন, "শ্রীমতী, একটা সন্তান থাকলে তোমার ভাল লাগত, না?"

বিস্মিত হল, শ্রীমতী। গতকাল পাশের বাড়ীর ডাঃ মিসেস মজুমদার একই কথা বলছিলেন তাকে। ভেবে দেখেনি সে আগে। বরঞ্চ তেত্রিশ বৎসরে যৌবন স্থায়ী থাকার জন্য সন্তানহীনতাকে আশীর্বাদ করে ছিল। ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট সহ্য করা কঠিন, ভারী কঠিন।

কিন্তু, তাহলে কি শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠবে? না হাল্কা পালকের মত শরীর শ্রীমতী কেঁপে উঠল। সে মৃদু গলায় বলল, "দেখা যাক।"

বাগানের মৌসুমী ফুলগুলো চমৎকার ফুটেছে। নীল গোলাপী হলুদ রং-এ আচ্ছন্ন বাগান। আকাশে মেঘ উড়ছে, আবার সূর্যের আলোয় দীপ্তি। দিন কেটে যায়।

আনমনা শ্রীমতীর ঘর আর ভাল লাগে না। একদিন যেন অনুভূত হ'ল তার বুকের নীচে দ্বিতীয় স্পন্দন। ডাক্তার মজুমদারের কাছে গেল শ্রীমতী। সন্তান বাঞ্ছিত না হলেও, সময়ক্ষেপের এমন বস্তু আর নেই। নিস্পৃহ মনের কোণে বাসনার পাড় লাগল।

মিসেস মজুমদার সযত্নে বরতনু পরীক্ষা করলেন। নানা প্রশ্ন করলেন। তারপর হাত ধুয়ে এসে গম্ভীর হয়ে টেবিলে বসলেন।

এবার নিশ্চয় ভাবী মাতার প্রতি উপদেশ বর্ষিত হবে। মেরুদণ্ড শক্ত করে শ্রীমতী অপেক্ষায় রইল।

মিসেস মজুমদার টেবিলে পেন্সিল ঠুকে একটুক্ষণ চুপ থাকার পরে বলে উঠলেন, "আপনাকে খোলাখুলি বলাই ভাল। যে সব লক্ষণ আপনি মাতৃত্বসূচক বলে মনে করেছেন, সেগুলো মিথ্যা! আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিসেস দত্ত,—সন্তান ধারণের ক্ষমতা আপনার নেই।"

সমস্ত ঘরের আবহাওয়া চমকে উঠল। ঘরের যন্ত্রপাতির টুং-টাং শব্দ যেন করুণ সুরে গেয়ে উঠল: যাকে চাওনি শ্রীমতী, সেই তোমার ঘরে এল না।

একটি কথাও বলল না শ্রীমতী। উঠে দাঁড়াল নীরবে। তৎক্ষণাৎ বাহির হয়ে এল।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলেন স্বামী। ব্যতিক্রম এটি। টেবিলে লঘু খাদ্য, কফি খানসামা সাজিয়ে দিল। শ্রীমতী এল না।

বিমান দত্ত পত্নীর ঘরে প্রবেশ করলেন—চোরের মত নয়, আজ সদর্পে। অন্যদিন পত্নী শায়িতা হলে তিনি কখনও তাকে বিরক্ত করতেন না।

সাদা বিছানায় সাদা ফুলের মালা। বিমান দত্ত খাটের ধারে বসলেন।

শ্রীমতীর চোখে ঘুম নেই—বিস্ফারিত দুইটি পদ্মকলি। নিঃশব্দে স্বামীর মুখে চোখ রাখল, "এত দেরী কেন? কোন কাজ ছিল?"

"হ্যাঁ।"

শ্রীমতী চুপ করে রইল। বিমান দত্ত বললেন, "তারপর?"

কি প্রশ্ন না বুঝে শ্রীমতী উত্তর দিতে পারল না। হাতের সিগারেটটি ছুঁড়ে স্বামী বললেন, "এখানে থাকব?" প্রাত্যহিক অনুনয় আজকের স্বরে নেই।

"তোমার ইচ্ছা।"

বিমান কালক্ষেপ করলেন না। জামা-কাপড় ছেড়েই এসেছিলেন। বিছানার নিবিড়তায় অন্তরঙ্গ হয়ে এলেন। কিন্তু, আজ তাঁর ব্যগ্রতা নেই। শান্ত প্রতীক্ষা দেহে লেখা। শ্রীমতী বিস্মিত হল।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন স্বামী, "তুমি আমাকে ভালবাসতে পারলে না?" কোনদিন এত কথার মধ্যেও এ কথাটি বলেননি তিনি। শ্রীমতী কি বলবে ভেবে পেল না।

স্বামী নিজের মনে বলে চল্লেন, "একদিন বলেছিলে, যদি শারীরিক ত্রুটি থাকে, তবে আমাকে ছেড়ে যাবে তুমি।

"এ কথা কেন?"

"আজ ক্লাবে মজুমদারেরা গিয়েছিলেন। ডাক্তার মিসেস মজুমদার আমাকে আড়ালে ডেকে বল্লেন।"

শ্রীমতীর লজ্জায় নীলা আলোকিত ঘরটি লাল হয়ে উঠল। স্বামী কি বলতে চান, বুঝতে না পেরে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। শ্রীমতী শুনেছিল যে, পুরুষ নাকি জনক হতে না পারলে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে। স্বামীও কি তাই বলতে চান?

বিমান দত্ত সাধারণতঃ প্রেম নিয়ে আলোচনা করেন না। নীরবেই থাকেন তিনি। আজ নীরব মুখর হয়েছে!

"সন্তান সত্যই প্রয়োজন। কিন্তু, স্বামীকে ভালবাসতে পারলে বন্ধ্যার জীবনে কষ্ট থাকে না।"

বন্ধ্যা? হায় শ্রীমতী, সন্তান তুমি চাওনি। কিন্তু, ক্ষমতা কেন থাকবে না তোমার? রূপ-গুণ-প্রতিভা সব নিয়েও চরম পরাজয় হল তোমার। নারীর কাছে এর চেয়ে লজ্জা আর কি?

এবার স্বামী কি করবেন? এতদিন কথা ছিল, শ্রীমতী কি করবে? আজ কথা, স্বামী কি করবেন? শিক্ষিত পুরুষও না কি এমন ক্ষেত্রে অন্য একটি স্ত্রী গ্রহণ করে। বিবাহের পরে নিঃসন্তান অবস্থা ছিল বলে একদিন পরিহাসচ্ছলে শ্রীমতী উচ্চকণ্ঠে বলেছিল, সে স্বামীকে মুক্তি দেবে বন্ধ্যা নারীর বন্ধন থেকে। তাই বুঝি স্বামী ইঙ্গিত করলেন।

ভালই তো। এমন উত্তপ্ত শয্যা ছেড়ে পিত্রালয়ের শীতল দক্ষিণখোলা ঘরটিতে ফিরে যাবে সে। শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠবে স্তাবকগুঞ্জন। আসবেন অনিরুদ্ধ রায়। পাশের বাড়ীর মুগ্ধ কিশোর জর্জি, বোধহয় এতদিনে বিদেশ থেকে ফিরেছে। ভক্ত মনোরমা আবার তাকে 'বারুণীধারা'র সঙ্গে তুলনা করবে। একঘেয়েমির হাত থেকে, সংসারের জোয়াল থেকে মুক্তি। দিনগুলো আবার পাখীর পাখায় উড়বে। দায়িত্বশূন্য, বন্ধনহীন জীবন। মুক্তির আনন্দ কল্পনায় চেয়ে চেয়ে দেখল সে।

কিন্তু, বিরহিনী শ্রীমতী তো নয় আর। পিত্রালয়ে অতিথি, যে তার ঘর আছে, যে তার লোক আছে। অন্যের সম্পত্তির মত লোভনীয় নয় এই নূতন শ্রীমতী। স্বামী পরিত্যক্তা চিরস্থায়ী বাসা গাড়বে পিত্রালয়ে কি? দুর্লভ ছিল যে, সুলভ হলে আর কি দাম পাবে? ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে পথ চলতে পারবে না শ্রীমতী। অন্যের কাছে প্রশংসা পাওয়া তার কাম্য। শ্রীমতী দীনবেশে পরাজয়ের কালি মেখে ফিরে কি সুখ পাবে?

স্বামী বললেন, "ছেলের অভাব স্বামীকে ভালবাসলেই মেটে। এতদিন বৃথা নষ্ট হল। অল্প বয়সে ভালভাবে চিকিৎসা করলে হয়তো আশা ছিল। এখন বয়স হয়ে গেছে।"

শ্রীমতীর চোখের সামনে লাল অক্ষরে ফুটে উঠল: তেত্রিশ, তেত্রিশ! তেত্রিশ! আর কি! শেষ হয়ে গেছে, সে কথা আজ শুনলে? কার

মুখে? না, তোমার অনুগত প্রেমিক স্বামীর মুখে। এখনও কি তুমি বেঁচে আছ?

এবার বিচার হবে। অক্ষমার বিচার পুরুষের দরবারে। বন্ধ্যা পত্নীকে পুরুষ বর্জন করতে পারে।

যে সন্তানকে কোনদিন আহ্বান করেনি শ্রীমতী, সেই অনাগত সন্তানের অভাবে সহসা বিরহবেদনা সে অনুভবে পেল।

স্বামী বলে চললেন, "এইবার অজুহাত আছে তোমার সংসার ছেড়ে যাবার।"

স্বামী আজ রুক্ষ। একদিনের মধ্যেই তার এত পরিবর্তন সম্ভব হল কি করে? এবার শ্রীমতীর নামার পালা।

শ্রীমতী নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

স্বামী বললেন, "স্বামী মানে কি ভেবে দেখেছ? পুত্রের প্রথম জন্ম স্বামীর মধ্যে। দৈহিক মানসিক ভাবে স্বামী মেয়েদের পুত্রকামনা পরিতৃপ্ত করতে পারে। খেলা করে সময় কাটিয়েছ। শ্রীমতী দায়িত্ব নিয়ে বুঝতে চাওনি। বিবাহ কি খেলা?"

এখনই স্বামীর মনোভাব বোঝা যাবে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শ্রীমতী প্রতীক্ষা করছে। তার চরম লজ্জা, পরম পরাজয়ের সূচনা হয়েছে। শেষ আর শ্রীমতীর হাতে নয়—স্বামীর হাতে।

ক্ষীণদীপ্ত ঘরে স্বামীর স্বর বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, "দুঃখ করো না, শ্রীমতী। আমার দুঃখ নেই।"

চমকে উঠল শ্রীমতী। শুধু পত্নীত্বের দাবীতে কত নিয়েছে সে এই পুরুষটির কাছ থেকে? কৃপা শ্রীমতীই এতদিন করে এসেছে। আজ?

"তুমি আমাকে যা দিয়েছ, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, শ্রীমতী। বেশী আমি চাই না। সেইটুকুই আমাকে দিও।" বিমান দত্ত আলিঙ্গনের মধ্যে শ্রীমতীকে জড়িত করলেন।

আর, রাজেন্দ্রানী শ্রীমতী হাত পেতে ভিখারীর মত গ্রহণ করল সেই দান। তার দেবার দিন যে শেষ হয়ে গেছে।

জীবনাতীত

চারিদিকে কোলাহলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন-সঙ্গ আমি একটি দ্বীপে বাস করি। কিন্তু সে দ্বীপ চিরহরিৎ নয়।

নৌসিকার স্বপ্নঘেরা শ্যামল কোন দ্বীপের মধ্যে আমার সমুদ্রগামী আত্মা আশ্রয় পায় না।

আমার আত্মা তো দূরভিসারী নয়, সে গৃহতীর্থের পথিক। গৃহকে ভালবাসি, আমি গৃহস্থ।

আমার টেবিলে চীনামাটির পাত্রে ভিজে রুমালে বেলফুল শুকোয়! কোন সজলঘন বাদলবর্ষণ তাকে উজ্জীবিত করে না। কারণ তারই পাশে একগোছা খাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটি আমি।

আমি শিক্ষয়িত্রী। কলেজে পড়ানোর গৌরবে যাদের অধ্যাপিকা বলা হয়।

টেবিলের পরিধি ছেড়ে দৃষ্টি তোলা কঠিন। পরীক্ষার খাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেবার শেষ দিন এসে যাচ্ছে। চারদিকে আমার শুধু খাতা আর খাতা, আর রোল নাম্বারের পাহাড়!

বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা হারানো নিয়ে নানা কেলেঙ্কারি ঘটে প্রতিবার। অতএব আমি সাবধান। টেবিলে বসে খাতা গুণি, মেলাই, খাতা দেখি। তার পরে খাটের নীচে অতিকায় ট্রাঙ্কে বন্ধ করে রাখি চাবির শাসনে। বাড়ি থেকে বার হওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছি! যখন খাতা দেখে শিরদাঁড়া টনটন করে ওঠে, তখন বারান্দায় একটু পায়চারি করি। কখনও বা রেলিং-এ গলা ঝুলিয়ে মিন্‌মিনে প্রৌঢ় গলায় এক কাপ চায়ের ফরমাশ দেই।

এইতো আমার জীবন। সম্প্রতি খাতার দ্বীপে আমি বাস করি। সাদা-শুকনো কাপড় ওড়ে। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' মনে পড়ে। গলার মধ্যে কবে না শুষ্ক কাগজ ঠেকে মারা যাই। মনে পড়ে গগন ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র "পাখী, তোর বসন্তের গান থামা, পড় বসে এ. বি. সি.।"

ঠাকুরবাড়ির কথা মনে পড়ে বুক ভেঙে' দীর্ঘশ্বাস বয়। আমার বাড়ি জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দা হল না কেন? আমি কেন লেখিকা হতে পারলাম না।

তা হলে ? তা হলে চিকন-পাটী পেতে হাল্কা চলনের বাতাসে আমি কবিতা লিখতাম ! জুঁইফুলের গোড়ে থাকত চুলে বাঁধা। আমার কবিতা পড়ে কত লোক আমার প্রেমে পাগল হত। অধ্যাপনার নীরস জীবন আমার জন্তে সাজানো থাকতো না।

পিতৃবিয়োগের পরে শুনলাম গুঞ্জরণ, "কি করে চলবে ? বাবা কিছু রেখে যান নি।" অগত্যা চটির ধুলো উড়িয়ে নিষ্করুণ শহরের বুকে বহু দিন চেষ্টা করে খুঁজে নিলাম কলেজের কাজ। আমাকে গুণ্ঠনবতা করতে কেউ উদ্যোগী হল না।

অনেকদিন থেকে এই জীবনটা সহ্য হয়ে গেছে। এখন দক্ষিণের বারান্দা আমার জীবনে ফিরে আসে।

কলেজের অধ্যাপনার অবকাশ কাটে চাঁদাসংগ্রহে ? যত বুড়ো আধবুড়ো লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার সময়ের উপর, যেখানে যত কমিটি আছে, নিষ্কর্মা-বৃন্দের দলে, তাঁরা আমার স্বাস্থ্য ও বিদ্যা দেখে তাঁদের কাজের জোয়ালে আমাকে জুতে দিলেন। আর আমার বিবাহের চিন্তা রইল না। তাঁদের এড়ানো অসম্ভব। অনেকের ছাত্রী ছিলাম আমি, অতএব ক্লাস নেওয়ার অন্তে ছুটে যেতে হয় তাঁদের কাজে। আর খাতা, আর বই।

শেলী লিখেছিলেন—

> "Many a green isle need must be
> In the deep sea of mysery"

আমার সমুদ্রে সবুজ দ্বীপ কোথায় ?

জীবনানন্দ দাসের অমর কবিতা কানের কাছে বাজে—

> "—হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা,
> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর'।

আমি হালভাঙা নাবিক। পিতৃবিয়োগ না হলে হয়তো দিশা পেতাম। কিন্তু আজ আমার চোখে দারুচিনি দ্বীপ কোথায় ?

আমার মত অনেক আছে, তাদের কথা কেউ ভাবে না। তাই নিজের কথা বলতে এলাম।

শুধুই শুকনো বেলফুলের খরিদ মালা আর খাতা। বারান্দায় চলে এলাম। হঠাৎ মনে হল ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু খাবার সময় তো হয় নি। অসময়ে প্রায়-প্রৌঢ়া অধ্যাপিকাকে গব্‌গব্ করে খেতে দেখলে সংসার কি ভাববে ?

দূর থেকে দেখলাম একটা তোয়ালে-জড়ানো পোঁটলা হাতে দুই মহিলা আসছেন। এই দিকেই। হ্যাঁ, বোধহয় এই বাড়ীতে। ভালই, খাতা-দেখা ক্লান্ত চোখ দুটি এই কনিষ্ঠা রূপ দেখে জুড়াবে। হয়তো বা আমারই কাছে আসছে। কত লোক তো আসে। দেখি না, ছাত্র ছাত্রীর মাতা কি না। কি জানি ঘরের তৈরী কোন খাদ্য আমার উদ্দেশে আনছে নাকি। বাঁচি তা হলে খেয়ে।

হাসি পেল! বাইরে আমি গম্ভীর-মূর্তি অধ্যাপিকা, মন কিন্তু এখনও তারুণ্যের আলোকদীপ্ত।

ঘরে ঢুকলো তারা—আমারই ঘরে। সহপাঠিনী তরু ও তার মেয়ে বনানী।

"এসো বনানী-তরু! আমার অরণ্য আলো করে বসো!"

তরু পথশ্রমে হাঁফাতে হাঁফাতে স্থূল দেহ টেনে বিছানায় বসল। লক্ষ্য করে দেখেছি বিছানা পেলে অন্য কোথাও বসে না। যেন উনুনের আরামপ্রয়াসী মোটা-সোটা সাদা বেড়াল।

একহাত মিনের চুড়ি ঝাঁকিয়ে তরু বলল, "তোমার আর কি বল? লেখাপড়া নিয়ে বেশ আছ। সংসারের জ্বালা তো বুঝলে না।"

এই কথাটা প্রায়শঃ আমাকে শোনায় তরু! আমার কৌমার্যে প্রকৃতই সে সুখী কি দুঃখী বোঝা যায় না। অতএব চুপ করে লুব্ধ দৃষ্টি মেলে ওর হাতের পোঁটলাটা দেখতে লাগলাম। যদি সত্যই খাবার থাকে, বিস্কিট আর চা মিশিয়ে ওর খাবারই ওকে খাইয়ে সারব আতিথ্যের দায়। নইলে জলখাবারে কতকগুলো বাজে খরচ হয়ে যাবে।

তরু বলে চলল, "মেয়েটার জন্যে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি। আমার বেজায় ব্লাড-প্রেসার হয়েছে। চোখ মুদলে কর্তা তো ফের টোপর পরবেন জানি। মেয়েটার কি হবে?"

ওর বাহান্ন বছরের পাকাচুলো কর্তা এ বয়সে টোপর পরলে কেমন দেখাবে ভেবে হাসি পেল। হাসি চাপবার জন্যে বললাম, "ওটা কি?"

তরু পোঁটলা খুলে একখানা হাতে কাজকরা টেবিলের ঢাকনি বার করল। তরুর টেবিল ক্লথ বিখ্যাত। যাকে দিয়ে ওর কাজের দরকার তাকেই একটা একটা করে দেয়। বুঝলাম এবার আমার অনেকটা শ্রম না নিয়ে তরু ছাড়বে না।

উঠে গিয়ে চা জলখাবারের অর্ডার দিলাম। ভালই দিতে হল। খালি হাতে তো তরু আসে নি।

ফিরে এসে বল্লাম, "তার পর বনানীর কি হল? মরে যাচ্ছ কেন?"

"ভাই, একটা পাত্র দেখে দাও। বি. এ. দিল মেয়ে। আর কবে বিয়ে হবে? বড় আশা করে তোমার কাছে এসেছি।',

"আমি তো মেয়ে কলেজে পড়াই। পাত্র পাব কোথায়?"

"ভাই, তোমার কত জায়গায় যাওয়া আসা। অমন বোনপো রয়েছে, তার বন্ধুরাও তো আছে।"

আমার দিদির ছেলে নন্দন এখানে পড়াশোনা করে। আমিই তার দেখাশোনার ভার পেয়েছি। পাশ করে ব'র হয়ে সে কাজকর্ম খোঁজাখুঁজি করছে। ভাল কলেজে পড়ত। বহু বন্ধুবান্ধব তার। কিন্তু তার মধ্য থেকে অনূঢ়া মাসী কি করে রত্ন আহরণ করবে? সমস্ত কাজ ছেড়ে বন্ধুর মেয়ের বিয়ের ঘটকালি নিয়ে পড়ব নাকি প্রৌঢ় বয়সে?

অতএব বললাম, "ভাই, আমার বাড়ি বিয়ের পাট নেই। পাত্র দেখার ভাল লোক ধরেছ!"

তরু নিভে গেল। সুমধুর আতিথ্য ঝি এনে দিয়ে গেলে সেদিকে তাকাল না সে। মিন্‌মিনে গলায় বলে চলল, "বড় আশা করে যে তোমার কাছে এলাম। মেয়ে তো আমার ফেল্‌না নয়।"

ফিরে তাকালাম বনানীর দিকে। সলজ্জ মুখ নামিয়ে সোনালী শাড়ির আঁচল খুঁটছে। সোনায় গড়া মেয়ে। আহা, গলায় একছড়া জুঁইফুলের মালা পরলে কি সুন্দর মানাবে!

মনের কোণে দক্ষিণ বাতাস বয়ে গেল। সুপ্ত কোন অনুভূতি যেন সাড়া দিল। আমার যৌবনকে যেন ওরই মধ্যে পেলাম।

দরজার পথে বাধা পেলাম। হেড-এগ্‌জামিনারের কাছে যাচ্ছি। পথে সন্ধ্যার আলোয় একটি মূর্তি আমাদের ফটকে। সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টিশেষে দূর আকাশের রামধনু আঁকা কি ওরই ললাটে? দীর্ঘ দেহচ্ছন্দ, বলার জন্য বলছি না, সত্যই দেহ ওর ছন্দ। ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণী। অথচ ধ্রুপদের বলিষ্ঠতা।

ও গান হয়ে মনে অনুপ্রবিষ্ট হল। চেয়ে চেয়ে দেখে প্রশ্ন করলাম, "কাকে চাই?"

"আমি নন্দনের বন্ধু মোহন।"

অন্ধকার থেকে সরে আলোর দিকে এগিয়ে এল সে। মোহনকে নন্দনের কাছে দেখেছি আগে। লক্ষ্য করিনি। আজ দেখলাম প্রথম যৌবনের দূর আলো ওকে স্পর্শ করেছে। এই পড়ন্ত সন্ধ্যার আলোয় কী সুন্দর ওকে দেখলাম! আমার সমস্ত মনে বহু বিস্মৃত, অর্ধমৃত কোন অনুভূতি জেগে উঠল। মৃত স্বপ্নেরা যেন গোপন হৃদয়ের গুহাশায়ী অবস্থা থেকে উত্থিত হল।

মোহন একটু হাসল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"যাচ্ছি পরীক্ষকের বাড়ি। তুমি ভেতরে যাও, নন্দন বাড়ি আছে।"

পরের দিন তরুকে ফোন করলাম। পাত্রের সন্ধান পেয়েছি।

কয়েক দিন পর নন্দন আমাকে খবর দিল, "জান পিসীমা, তুমি বনানীর সঙ্গে মোহনের বিয়ের সম্বন্ধ দিয়েছ শুনে মোহন খুব হেসেছে।

"কেন, হাসির কি আছে? একই কলেজে তোমরা পড়াশোনা করতে। বনানীর সঙ্গে চেনা জানা আছে। সুন্দরী মেয়ে। মোহনও ভাল কাজকর্ম করছে।"

"কি জানি, কেন হেসেছে জানি না। প্রচুর হেসেছে।"

বিরক্ত হলাম। বর্তমানের তরুণেরা কোন কথা খুলে বলে না। সামান্য একটা হাসির কথা, অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বলছে যেন কতই অর্থ লুকানো আছে। জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি ও কিছুই খুলে বলবে না।

অপ্রতিভ হলাম। বেচারী তরু নিশ্চয় স্বামী ও দেওরদের দ্বারা প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়ে আমার মুণ্ডপাত করছে। মোহনের হাসির মানে না বুঝলেও বুঝেছি, বিয়ে হবে না।

এসব নিয়ে কালক্ষেপের কাল আমার সম্প্রতি নেই। পরীক্ষার খাতা জমা দেওয়ার শেষদিন প্রায় এসে যাচ্ছে। আমি জীবনসমুদ্র থেকে আবার খাতার দ্বীপে ভেসে গেলাম।

চোখ কান বন্ধ করে কোনমতে দুই-তিন মাসের মধ্যে খাতার পাহাড় শেষ করে ফেললাম। এবার আমার মুক্তি। আবার বেলফুলের মালা কিনে টেবিলে বসাবার দিন এসেছে।

আজও কিন্তু দেখা হল তারই সঙ্গে আবার দরজার মুখে। মোহন!

কি আশ্চর্য, গোধূলিবেলা ছাড়া বন্ধুর বাড়ি আসবার ও সময় পায় না নাকি? কনে-দেখা-আলোয় সবাইকে যে সুন্দর দেখায়। বিশেষতঃ সুন্দরকে যে কত সুন্দর দেখায় নিশ্চয় ও জানে। আমার পুত্রপ্রতিম হলে কি হয়? ও তো পুরুষ। রূপবান পুরুষ বড় আত্মসচেতন হয়।

বললাম, "কি বন্ধুর খোঁজে নাকি?"

হঠাৎ নিজের গলার স্বরে যেন হাল্কা কোমল রসের ছোঁয়া স্পষ্ট শুনতে পেলাম। হঠাৎ একটা বাতাসের স্রোতে দিশেহারা হয়ে গেলাম। দক্ষিণের বাতাস।

সে হাসল, দাঁতগুলির ঔজ্জ্বল্য যেন অন্ধকারে মুক্তাঝলক। আমার দিকে চেয়ে চুপ করে দরজার পাশে আধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের দৃষ্টি যেন অনেক অর্থের ভারে জটিল!

কেমন কৌতূহল হল। আমি ওর বিয়ে দিতে চাই শুনে ও হাসল কেন? বাড়িতে কত দিন ও আমার বোনপোর বন্ধুরূপে এসেছে, আমার সঙ্গে মিশেছে। ওর একজন মনোনীতা পাত্রী জুটিয়ে দেবার চেষ্টা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে ও হাসল কেন?

প্রশ্ন করে বললাম, "আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছি জেনে তুমি হেসেছ কেন অত?"

আমার চোখের দিকে সোজা তাকাল মোহন। দীর্ঘ-নিষ্কম্প চোখের পল্লব, চোখের তারায় উষ্ণ উত্তাপ। কি সে আমাকে বলতে চায়? কেন?

আমার অভিসারিকা আত্মা বনানীর দেহ কি মাধ্যম প্রার্থনা করেছিল?

মোহন কি বলতে চেয়ে বলল না, কথা তার ঠোঁটের উপর অদৃশ্য কম্পনে কাঁপতে লাগল। কবে তার আমাকে বলবার মত কথা সংগৃহীত হল আমি জানি না।

কি বলতে যেয়ে মোহন বলতে পারল না। বঙ্কিম হাসির সঙ্গে উত্তর দিল, "হেসেছিলাম—? এমনি।"

আমি মুহূর্তে সংবৃত-সত্তা হয়ে স্থির, অভ্যস্ত প্রৌঢ়কণ্ঠে বললাম, "আমরা মাসীপিসীর দল, যোগ্য ছেলের বিয়ে তো খুঁজবই।"

আমার রাগরক্তিম লাল-ফুল দিনটি এক মুহূর্তে একটা মরা মাকড়সা হয়ে গেল। আমার জীবনাতীত জীবন আমার জীবন থেকে অদৃশ্য হল।

অনন্তযৌবনা

তবু সে চলে গেল !

অচঞ্চল যৌবনশিখায় উত্তপ্ত হলনা, বন্ধন নিলনা যে, তার জন্য পথ চেয়ে লাভ কি ?

মাতাপিতা কন্যাকে উপদেশ দিলেন, দৃষ্টান্ত দেখালেন। সংসারতরণীর নাবিকপদের যোগ্য লোকেরও সন্ধান দিলেন, তবু বারুণী অটল।

সুন্দর মুখের রেখাগুলো একটু কঠিন হয়ে গেল মাত্র। কটির পরিধি, দেহবিস্তৃতি পুরুষস্পর্শবিহীন অসৌকুমার্য্য পেল। বাইরে বারুণী যেমন ছিল, তেমনি প্রবাহিত হতে লাগল। কিন্তু কোন বরুণ তাকে ধন্য করে দিতে এলনা।

মাতা সাহিত্যানুরাগিণী। তিনি একদা 'মেঘনাদবধ' কাব্যে পড়েছিলেন—

"—প্রবাল আসনে
বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিল—"

মেয়েকে তখন 'খুকু' নামে ডাকা হত, অপূর্ব্ব রূপ তার। মাতার মনে উদয় হল, কন্যা জলনৃপতির মহিষী অধিক মনোজ্ঞা। তার নাম হল তাই বারুণী।

তারপর এইখানে আমি একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে কতকগুলি পাতা ভরাতে পারতাম কোন কোন কথাশিল্পীর প্রথায়। কি ভাবে কন্যকাকে আকাশের চাঁদ দেখানো হত, কি ভাবে তার দীর্ঘ চোখের পল্লবগুলো কচি ত্বকের উপর ছায়া ফেলত। কি ভাবে চিক্‌চিকে রংয়ে একটি কালপাড় শাদা শাড়ী পরে জানলার ধারে বসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলত সে। কি ভাবে তার জীবনের প্রথম বসন্তে অকারণে গভীর রাত্রে আকুল হয়ে কেঁদে উঠত সে। তারপর, সভার আলো ম্লান করে সে জ্বলত ; আধুনিকী হওয়া সত্বেও ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টীক্, কপোলে প্যানকেক্ প্রসাধনীর ছোঁয়া লাগাত না। ঈশ্বর তাকে যেমন পাঠিয়েছিলেন, তেমনি ভাবে সে শুধু হৃদয়-হরণ-করা বিচরণে কালক্ষেপ করতে লাগল।

আলতা, কাজল, কুঙ্কুম, ট্যাসেল বর্দ্ধিত কবরীসজ্জা ফুল, বাইজীঢং এ লাল

অধোবাসের সুস্পষ্ট আভাস, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সোনার বিজ্ঞাপন—সব-কিছুই কারুর কারুর মতে রুচির প্রকৃষ্ট পরিচয়, কোন দোষ নেই। মিঠে পান ঘষে ঠোঁট লাল কর, আধো-আধো সুরে কথা বল, তাহলে তোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবিসংবাদী সত্য থাকবে। কিন্তু, আর যা কর, আধুনিক পোষাক কোরনা, কোরনা। বাঙালী কথাশিল্পী তোমাকে নাম্বার দেবেন না পাশের।

কিন্তু বারুণী আধুনিক ছিল মনে-প্রাণে।

শৈশব থেকেই প্রসাধন-প্রিয়া হয়ে সে উঠল। মা-এর উৎসাহ, পিতার অর্থব্যয় এবং নিজের আগ্রহে বারুণী প্রসাধনের অনুশীলন আরম্ভ করল। দেশী, বিদেশী সর্বপ্রকার বস্তু তার তালিকাভুক্ত হল।

স্কুলের গণ্ডি পার হ'বার পরে আর্টকলেজে গেল সে—কমার্শিয়াল নয় ইণ্ডিয়ান আর্ট। দিনের পর দিন কলাচাতুর্য্য শিক্ষা করল সে শুধু ছবি আঁকার জন্য নয়, নিজেকে ছবির মত আঁকবার জন্যও।

একে সুন্দরী, তায় সজ্জানিপুণা, বারুণীর যৌবন মাথা তুলে দাঁড়াল। বয়স পশ্চিমের দিকে পা বাড়ালেও রূপে মালিন্য দেখা গেল না। সে হয়ে রইল অনন্তযৌবনা।

অনন্তযৌবনা উর্ব্বশীর পুরুরবা পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠল। অবশ্য সুন্দরীর পাণিপ্রার্থী খুঁজে আনতে হতনা। আপনা থেকেই আসত তারা—হতাশ হয়ে ফিরে যেত। জলরাজমহিষীর দৃষ্টি নিম্নগামী হয়নি কখনও।

মাতা এতদিনে চিন্তিতা হলেন। আর্ট-কলেজ থেকে পাশ করে মেয়ে বা'র হয়েছে বহুদিন। শিল্পীর ষ্টুডিওতে ছবি আঁকা শিখতে যায় নিয়মিত। চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবি পাঠায়, কখনও একটা-দু'টো ছবি বিক্রিও হয়। সেই টাকায় আসে অ্যাস্‌টিনজেণ্ট, অ্যাণ্টি-রিঙ্কল্ ক্রীম, চন্দনচূর্ণ, হেয়ার-টনিক ইত্যাদি।

ছবি আঁকে অবশ্য প্রত্যহ বারুণী, নিজেকে চিত্রিত করে তোলে নানা রংএ। তারপর বসন-ভূষণ ধারণ করে সামঞ্জস্য রেখে। সন্ধ্যার প্রসাধন প্রত্যহ চাই তার, পৃথিবী ভারসাম্য হারালেও। লোকলোচনে লোভনীয়া হ'বার সাধনা সেই অনন্তযৌবনার।

কথিত আছে বন্ধুমহলে, একদা কোন ভূমিকম্পনব্যথিত নিশীথে মাতার ব্যাকুল আহ্বানে জেগে উঠল সে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রাণরক্ষার্থে ঘরের বাইরে এলনা। মাতার ভয়ার্ত্ত চীৎকারকে প্রশমিত করল তার বিরক্তি লাঞ্ছিত

স্বর—"আহা, কেন অনর্থক চেঁচামেচি করছ ? চুলটা আঁচড়ে মুখে পাউডারের তুলি বুলিয়ে তবে বা'র হব তো ? রাজ্যের লোক সকলেই তো রাস্তায় জমা হয়েছে।"

মাতা নাকি ভূমিকম্পের আতঙ্ক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গালে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর নামকরণ সার্থক করেছে কন্যা।

এমন যে তরুণী, তার বয়সে ভাঁটি ধরে এল, কিন্তু দেহের একটি রেখাও শিথিল হল না, মুখের চামড়ায় ঈষৎ কুঞ্চন জাগল না। রূপসাধনা তাকে বর দিল।

ত্রস্তা জননী কন্যাকে একদিন জেরা করলেন, "এবারে একটা বিয়ে না করলে পরে পস্তাবি, বারু"।

নখে ফাইল্ ঘষতে ঘষতে বারুণী বলল,"বুঝলুম তো। কাকে করব, শুনি" ?

মা খাটে বসলেন, "কেন, বীরভদ্র ?

"ওরে বাবা, অমন হোঁৎকা চেহারা আমার চলবে না। টাকা ধুয়ে কি জল খাবো ?" বারুণী ফাইল্ রেখে সন্তর্পণে সূচ্যগ্র নখরে গোলাপী বর্ণ রঞ্জিত করতে বসল।

"তাহলে হৃদয়সুন্দর ?"

"মাগো, বড্ড ন্যাকা।"

"তোর বাপু, বাছাবাছি অতিরিক্ত। আচ্ছা, দিবাকরকে আর অপছন্দ করা চলবে না। চমৎকার চেহারা, পণ্ডিত ছেলে। মন স্থির করে ওকেই বিয়ে করে ফেল।"

"হাঁড়ি ঠেলতে পারব না গরীব বিয়ে করে, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।" তুলি দিয়ে আয়নার সামনে ভ্রূ চিত্রিত করতে করতে মন্তব্য প্রকাশ করল।

মা চটে উঠলেন, "বাড়াবাড়ির সীমা আছে, বারু ! এই বললি টাকা চাসনি, এখন আবার গরীবে আপত্তি ? তোর মতলবটা কি ? সারাজীবন প্রজাপতি সেজে কাটিয়ে দেওয়া ? প্রজাপতিও মরে যায় যথাকালে ! তোর নতুন বয়স উঠছে, না ? বাইরের লোক টের না পেলেও আমি জানি।"

বারুণী পাংশুমুখে বলল, "চুপ করো, মা।"

"চুপ কেন করব ? রূপ ! রূপের গুমোরে গেলেন মেয়ে। রূপ চিরদিন থাকে না।"

হাতের তুলি ছুঁড়ে ফেলে অনন্তযৌবনা ফিরে দাঁড়াল, উগ্রস্বরে বলল, "চুপ

তাহলে কোর না। চেঁচিয়ে বলে দাও সকলকে আমার বয়স। কেন ওই পাত্রদের বিয়ে আমি করতে পারি না, তুমি জান ভাল করে। তবু এমন ভাণ করছ কেন?"

মা যেন হঠাৎ নিভে গেলেন, মিন্‌মিন্‌ করে বল্লেন, "এখন এসব কেউ মানে নাকি?"

"তুমি না মানতে পার, আমি মানি। আমি সেকেলে লোক।"

বিদ্রূপের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল বারুণী, "হৃদয়সুন্দর আমার চেয়ে পুরো পাঁচ বছরের ছোট, দিবাকর তুই বছরের, বীরভদ্র একবছর দশমাসের ছোট। আমি বয়সে বড় না হলে স্বামী বলতে পারব না।"

মা যেন আলো দেখতে পেলেন, "তবে নিলাঞ্জনকেই ঠিক কর। এতক্ষণ কেন যে ওর কথা মনে হয়নি। বড় গম্ভীর, কিনা। সব দিকে এমন কৃতী ছেলে দেখা যায় না।"

বারুণী মুখ ফিরিয়ে ব্যাহত প্রসাধনে মন দিল। মা দেখলেন শুক্তির মত সুশুভ্র কর্ণমূল তার আরক্ত। একটু পরে গানের মৃদু গলায় পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে বারুণী নিজের মনে বলল, "আমার চেয়ে তিন বছরের বড়!"

মা তীক্ষ্ণ নয়নে লক্ষ্য করতে লাগলেন। বারুণী বয়োকনিষ্ঠের ভিড়ে বিব্রত হয়ে উঠেছিল। আর বাহিরের রূপ দেখে তাকে ঘিরে ধরত বয়সে বহু কনিষ্ঠ তরুণের দল, তারা তাকে সমবয়স্কা মনে করত। কিন্তু বারুণী প্রবীণ মনের আশ্রয় পেত না ওদের কাছ থেকে। ক্রমাগত একই বয়সের প্রার্থী দেখে দেখে সে উত্ত্যক্ত বোধ করত। রূপাভিমানিনী হলে সে শিল্পী, গম্ভীরতাধর্মী। কনিষ্ঠদের স্বাভাবিক ভাবেই হাল্কা মনে হত তার। নীলাঞ্জন নূতন জগতের স্বাদ এনে দিলেন।

অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পরে নীলাঞ্জন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং। স্বয়ং কলিকাতা-সমাজে আসন গ্রহণ করেছেন ধনী এবং মানীরূপে। সবল-দীর্ঘ দেহে পৌরুষ সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি রূপসাধনা করেন নি। তাই তিনি প্রৌঢ়ত্বের ছায়াগ্রস্ত।

কেশে শমনের থাবা, অক্ষিতলে বায়সপদচিহ্ন, গম্ভীর-নিস্পৃহ ব্যক্তিকে যে বারুণী মন দিয়েছে, বুঝতে পারলেন মা। বললেন, "বেশ তো। বয়সে বড় না হলে চলবে না তোর। নীলাঞ্জনের কাছেই কথাটা পাড়ি?"

"না, না।" বারুণী সবেগে বাধা দিল।

"কেন ?"

"কি জানি, ওঁর মন জানি না ঠিক।"

মা বললেন, "উনি যে এখানে এত আসেন তাতেই তো বোঝা যায় ওঁর মন আছে। উনি তো ছেলে-ছোকরার মত ছ্যাবলা নন। অযথা, দেরী করে লাভ কি ?"

"না আমি একটু দেখি।"

মা হাল ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বা'র হয়ে গেলেন। শুনতে পেলেন গুঞ্জরণ বারুণীর—

"জয় করে তোর ভয় কেন হয়
হায় ভীরু প্রেম, হায়রে—
* * যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয় ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে"—

কিন্তু সংশয়ঘনছায়া সম্পূর্ণ বিদূরিত হবা'র পূর্ব্বেই নীলাঞ্জন একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল দূরদেশে। বারুণীর বাধা মানল না। তার পরের অবস্থা পূর্ব্বেই বলেছি।

কেটে গেল একবছর—দীর্ঘ একটি বৎসর। ব্যর্থ প্রেম ও বিরহে বারুণী শিল্পে উৎকর্ষ লাভ করল। কয়েকটি ভাল ছবি আঁকা হল।

স্তাবকদলের মধ্যে নিরাসক্ত বিচরণে ফিরতে লাগল সুন্দরী। বয়োকনিষ্ঠারা আলোচনা করতে লাগল জনান্তিকে: "ভাই, দেখছ বারুণীদি যেন অত সুন্দর আর নেই।"

"হ'বেনা, যা বয়স ওঁর শুনেছি, বাপস্! ও বয়সে আমরা বাঁচবই না।" অষ্টাদশী একজন বললেন।

কিন্তু ভগ্ন হৃদয় রূপের বাহ্যপ্রকাশে ফাটল ধরাতে সক্ষম হলনা। বারুণী অনন্তযৌবনা।

অবশেষে! কলিকাতার ঠিকানা থেকে একখণ্ড চিঠি—"তোমার স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত ছবিখানা দেখলাম। অভিনন্দন, বারুণী।"

—নীলাঞ্জন।

সেইদিনই উত্তর গেল—

"একবার আসুন না। আগামী বুধবার সন্ধ্যায়। রোজ আসতে বলব না।"

—বারুণী।

উত্তর এল—একটি কথা,

"তথাস্তু"

—নীলাঞ্জন।

স্মরণীয়তব্য সন্ধ্যা। অপরাহ্ণ থেকে ড্রেসিং টেবলের ধারে বারুণী। দুইদিন ধরে বেশভূষা মনোনয়ন করেছে সে। এখন সমস্ত নিপুণতা দিয়ে একখানি ছবি আঁকছে সে—নিজের মুখ।

দ্রুত হস্তে সারা মুখে ক্রীম মাখাচ্ছে সে, তার পরে সেই ক্রীম তুলো দিয়ে ঘষে তুলল। পরিষ্কার মুখে এখন চামড়ার টনিক, কমপ্লেক্সন্ মিল্ক দেওয়া হল। রুজ, চোখের পাতায় রং, মাস্কারা, পাউডার, লিপ্‌ষ্টীক একের পর এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। অতি যত্ন সহকারে নীচের ঠোঁটে গাঢ়তর বর্ণলেপ করল বারুণী, চোখের কোণ টেনে দিল।

এখন হাল্কা মেঘের মত পাতলা নীল শাড়ী, তাকে অতি মনোহারিণী দেখায়।

নীলাঞ্জন দেখুক, বারুণীর পরিবর্তন হয়নি, অনন্যা সে আছে এখনও। অচঞ্চল রূপের মোহপাশে মায়ামৃগ কি আজ আবদ্ধ হ'বে না! বারুণী সর্ব্বশক্তি প্রসাধনে নিয়োগ করল। খোঁপায় জুঁইফুলের সুরভিত গোড়ে, হাতে-গলায়-কানে শুভ্র-শীতল মুক্তাগুচ্ছ। পায়ে চক্‌চকে প্রস্তরখণ্ড খচিত দিল্লীর চটী।

মনে হল, পৌরাণিক এবং আধুনিক সৌন্দর্য্যের স্বাক্ষর নিয়ে একজন সপ্তদশী প্রিয়মিলন-প্রতীক্ষায় আছে।

প্রিয় আসবার পূর্বেই এল বীরভদ্র, হৃদয়রঞ্জন ও দিবাকর। বারুণীর চিরস্থায়ী ভক্ত তিনজন। টেলিফোনে তাদের আমন্ত্রণ করেছে বারুণী, বহুদিন পরে নীলাঞ্জনের সঙ্গে মিলবার উপলক্ষ্যে।

কিন্তু নির্জন সন্ধ্যা কি আরও অনুকূল হত না! দক্ষিণের বারান্দায় বেলফুলের, জুঁইফুলের উদ্যান রচনা করেছেন মাতা। সেখানে গালিচা পাতা, কয়েকটি তাকিয়ার আরামে বিশুদ্ধ বঙ্গদেশীয় সুখাসন। রূপার থালায়

তাম্বূলাদি, ধূপদানীতে বহ্নিমান ধূপ। সেখানে দুটি প্রাণী যদি বসে, নিবিড়তা নেমে আসে।

বীরভদ্র, হৃদয়রঞ্জন, দিবাকর আগেই এসে গেল। দেখুক নীলাঞ্জন, বারুণীকে যেমন রেখে সে গিয়েছিল, তার চেয়ে ন্যূন হয়নি বারুণী। নীলাঞ্জনের জন্য হৃদয় বিদীর্ণ করে নিঃসঙ্গ প্রহর যাপন করছে না বারুণী। তার ভক্ত আছে। তার যৌবন আছে। হ্যাংলার মত নীলাঞ্জনকে একা পাবার জন্য ব্যাকুল নয় বারুণী, পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে ডাকা মাত্র।

ভক্তপরিবৃত অবস্থায় সুন্দরী লীলাখেলায় মত্ত—এ হেন পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থিত হল নীলাঞ্জন। তাকে দেখে স্তম্ভিত হল সকলে। সেই গম্ভীর উপস্থিতির সম্মুখে লঘু হাস্যকাকলি নির্বাক হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

এক বছরে আর একটু গম্ভীর হয়েছেন নীলাঞ্জন। দীর্ঘ দেহ শীর্ণ, মুখ অতৃপ্তি-লাঞ্ছিত। অন্তর্নিহিত কোন অগ্নিতে যেন অবিরত দগ্ধ হচ্ছেন তিনি এমন জ্বালাভরা মূর্তি। বারুণীর তরুণ লাবণ্যের কি এই পটভূমিকা?

মাতা নীলাঞ্জনকে অভ্যর্থনা করতে আসরে উপস্থিত ছিলেন। নীলাঞ্জনের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে বিরস মুখে আহার্যের তত্ত্বাবধানে গেলেন।

হাসি-কটাক্ষ-ভঙ্গি, লীলা-বিভ্রমের যতগুলি অস্ত্র ছিল, প্রয়োগ-পরায়ণা হল বারুণী। ফেলে রেখে গিয়েছিলে, এখন দেখি এড়াও কি করে? যদি আগে তুমি আহত নাও হয়ে থাক, এবারে তোমার নিশ্চিত মৃত্যু। যৌবনবনের মৃগয়ায় বারুণী তোমাকে কৃপা করবে না। সে মন দিয়েছে, তোমাকেও আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আকাশে চাঁদ—খণ্ড মেঘের দোলনায় বিহ্বল চাঁদ আস্তে আস্তে মধ্যগগনে স'রল। বাতাসে বেলীগন্ধ আরও একটু উচ্ছৃঙ্খল হ'ল। চুলের যূথীমাল্য উতলা করে তুলল দক্ষিণের বারান্দাকে। কিন্তু মধুলগ্ন ফিরে এল না।

গম্ভীর নিরাসক্ত নীলাঞ্জন নিঃশব্দে কয়েকটি সিগার ধ্বংস করলেন। কথার উত্তর পেল বারুণী, কিন্তু নীলাঞ্জন স্বতঃপ্রবৃত্ত বাক্যাপ্রবৃত্ত হলেন না। মনের সুখের গোলাপের পাশে পাশে অসংখ্য কাঁটা জেগে উঠল বারুণীর, গোলাপকে ক্রমে ক্রমে ঢেকে ফেলল তারা।

কি হবে সজ্জায়? কি হ'বে রূপে? নীলাঞ্জন বিমুখী। কোন অস্ত্র সফল হল না বারুণীর; উপেক্ষার বর্মে লেগে ফিরে এল তারা।

এক সময়ে হাসি-আনন্দের মধ্য থেকে উঠলেন নীলাঞ্জন, বিদায় নিয়ে গেলেন তিনি। ভবিষ্যৎ সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন না।

ভক্ত তিন জনকে বিদায় করে কোনমতে পাঁচমিনিটের মধ্যে নিজের ঘরে ফিরে এল বারুণী।

আয়নার সামনে দাঁড়াল জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে। যে সজ্জা এত শোভন মনে হয়েছিল, সে সজ্জা ভস্ম মাত্র, স্ফুলিঙ্গ নয়। পুরুষ চিত্তে দাবানল জ্বালাতে পারল না যে রূপ, নিস্পৃহতার বেড়া ভাঙতে পারল না, সে রূপ রেখে কাজ কি?

এত লোকের হৃদয় পদক্ষেপ-দলিত করে যার কাছে গেল বারুণী, তার এত বড় ভুল হয়েছিল? নিরাসক্ত বলেই তাহলে নীলাঞ্জন দূরে গিয়েছিল। অনন্তযৌবনাকে প্রয়োজন নেই তার।

ব্যর্থতার লজ্জা কি দিয়ে ঢাকা চলে?

নিজের রূপের উপর আর বিশ্বাস নেই বারুণীর। আয়না কি তাকে ভুল বলে দেয়, সে এখনও পরম লোভনীয়া নয়? এই রূপে, এই যৌবনে লাভ কি?

দৃঢ় হস্তে তুলে নিল বারুণী—না বিষ নয়, একটি 'ক্লিন্‌জিং ক্রীম' বা মুখ-পরিষ্কারের প্রসাধন। তুলো দিয়ে নিঃশেষে ছবি মুছে দিল, যা সে এঁকেছিল এতক্ষণ ধরে।

নীল শাড়ী আর স্বপ্নসাথী নয়, পাত্‌লা একটা কাপড়ের টুকরো। মোটা শাদা শাড়ী জড়াল গায়ে বারুণী, তার বয়স্কা মহিলার এই সাজই উপযুক্ত। খোঁপার যুঁথীর গোড়ে টেনে ছিঁড়ে চুল এলিয়ে দিল। সারা জীবনের সাধনায় নিজের যে রূপ সে এখনও লোকচক্ষের সম্মুখে ধরতে পারে, সেই রূপের অবসান হোক।

ঘৃণায় তাকিয়ে দেখল বারুণী, তুলিকৃত ভ্রূ, অধরের বর্ণরাগ কপোলের বসরা-সমরখন্দবিজয়ী তিল, চোখের ছায়াবর্ণলেপ সব এক তাল তুলোর গায়ে একাকার—যে মুখকে সে এত যত্নের শিল্পে নির্মাণ করেছিল, সে মুখ গেল। প্রেতের মত বিবর্ণ মূর্তি নিয়ে বারুণী দরজার দিকে চেয়ে প্রেত দেখে চমকে গেল।

নীলাঞ্জন! দরজার পরদা ধরে চেয়ে আছেন—তৃষিত দৃষ্টি তাঁর।

"আপনি?"

"আমার ডাইরিখানা ফেলে গেছি—দরকারী ঠিকানা টোকা আছে। তাই ফিরে এলাম। তোমার মা বল্লেন, হয়তো তুমি জান।"

মা ভেবেছেন অনন্তযৌবনা এখনও রূপময়ী আছে, তাই সুযোগ দিতে পাঠিয়েছিলেন সোজা এখানে।

ভাল হ'ল। দেখে গেলেন নীলাঞ্জন। যে ভালবাসে না, সে মোহমুক্ত হোক, কিছুই আসে যায় না বারুণীর।

এগিয়ে এল বারুণী, যা'তে আলো তার সারা মুখে নির্মল হয়ে পড়ে।

"ডাইরি আমি দেখিনি। হয়তো ওখানেই পড়ে আছে। খুঁজে দিচ্ছি, চলুন।" উদ্ধতভাবে বারুণী বলল, গ্রাহ্য করে না আর।

নীলাঞ্জন কিন্তু এক পা-ও অগ্রসর হতে পারলেন না। দৃষ্টি তাঁর বারুণীর মুখে।

কি দেখছেন তিনি জানে বারুণী। একটু আগেই সে নিজেই দেখে রেখেছে।

কর্‌সেট-বিহীন শিথিল তনু আটপৌরে শাদা শাড়ীঘেরা প্রৌঢ়ত্বের সহজ বেশ।

নকল চুলের বেণী মুক্ত স্বল্প কেশগুচ্ছ, কোথাও বা পাত্‌লা হয়ে টাকের আভাস দেখা দিয়েছে।

রোম-ওঠা একজোড়া ভ্রূ, কাল-শীর্ণ অধর। আর, চোখের নীচে ঠোঁটের পাশে নাকের ধারে, কপালে অসংখ্য রেখা, ভাঙন। বিবর্ণ বর্ণরিক্ত ত্বক কুঞ্চন লেখায় চিহ্নিত। অনন্তযৌবনার যৌবন শুধু সার্থক শিল্পসাধনাই ছিল।

এমন বেশে নীলাঞ্জন দেখে ফেললেন তাকে?

নিস্পৃহ স্বরে বারুণী বলল, "চলুন, খুঁজে দিই।"

"চল।" কিন্তু তখনও ইতস্তত করছেন নীলাঞ্জন, "তোমার অনুরাগীর দল কোথায়?"

তীক্ষ্ণ প্রৌঢ় একটা 'হি-হি' আওয়াজে হেসে বলল বারুণী, "অনুরাগী? হায়, হায়, আমার বয়সে ওই সব ছোকরার দল আবার অনুরাগী থাকে না কি? যুদ্ধসাজ তো ছেড়েছি, এখন মুখখানা দেখুন তো।"

"দেখছি।" গাঢ় নিম্নস্বর নীলাঞ্জনের "প্রবাসে রোজই দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি, জেগে থেকেও দেখেছি।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে অক্ষম হয়ে বারুণী চুপ করে রইল।

কাছে এগিয়ে এলেন নীলাঞ্জন, উত্তপ্ত নিঃশ্বাস তাঁর এতক্ষণে। দ্রুত-ব্যগ্র কণ্ঠে বলে চললেন, "পালিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি ছেলেমানুষ। আমি বিগতযৌবন হয়েছি, আমাকে তোমার ভাল লাগতে পারে না। আমি অন্যায় করে তোমাকে চাইবো। আগে তোমাকে তো এইভাবে দেখিনি।"

চরম লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে গেল বারুণীর। ভালবাসা পেয়েও সে পেল না। নিজেকে সংবরণ করবার চেষ্টায় কণ্ঠে বিদ্রূপ টেনে আনল বারুণী, "এখন দেখেই বা কি লাভ হ'ল?"

"লাভ হ'ল আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম, আমি বেঁচে গেলাম। আমাকে আর পালাতে হবে না। তুমি আমারি যুগের লোক। তোমার রূপ-যৌবনের বাধা ভেঙে এবার তুমি আমাকে ধরা দাও, বারুণী।"

———

সে অভিনেতা

গাড়ী মফঃস্বল ষ্টেশনের শানবাঁধা নীচু প্ল্যাটফর্ম ছুঁতে না ছুঁতে কানে কানে বেজে উঠছে: সাবধান, সাবধান!

কেন সাবধান? কিসের থেকে সাবধান? কাকে, কাকে ভয় করব আমি? কেন, বল কেন?

ম্লান দিগন্ত শাল-তমালে। আকাশের চোখের নীচে ঘন কাজল শ্যাম বনসম্পদ। চাঁদের আলোর দুধসাগরে ধানের ক্ষেতের ওঠানামা। বিহার-ভূমির রুক্ষতা সেরিসের আশীর্বাদে শ্যামল। চাঁদের আলোর দেশে গভীর রাত্রে একা যাত্রী আমার ট্রেণ।

অমিত সেন, তুমি সাবধান। অস্পষ্ট জলা-ভূমিজাত কুয়াশা চক্রবালে শুভ্র অঙ্গুলি প্রসারিত করে লিখে দিয়ে যাচ্ছে—সাবধান, অমিত সেন। যৌবন কাটাও রূপার ধ্যানে, বাস্তবের বাহিরের জগৎ চেনো তুমি। তোমার অবকাশ যাপন হয় রূপসীর স্বপ্নে নয়, রূপার চিন্তায়। পূজার ছুটি তুমি যাপন করতে যাচ্ছ বন্ধু সমাগমে নয়, ঠিকেদারীর সন্ধানে। তুমি সাবধান।

পচা-পাতা পায়ের নীচে মচ্‌মচ শব্দ করে। বিগত বসন্তের স্মৃতি। কুর্চি ফুলের ঝোপে জোনাকীর ফুলঝুরি। আঁকা-বাঁকা পথ সর্পিল। ওই দূর ফণী-মনসার পাশে চিত্র-বিচিত্র একখানি ফণার দর্শন পাওয়া বিচিত্র নয়। একা অন্ধকার রাত্রে পথ চলছি টর্চ হাতে। শুক্লাচন্দ্র মেঘের আড়ালে অদৃশ্য। ট্রেন আমাকে জনহীন মাঠের মধ্যে ফেলে চলে গেছে। নাগরিক আমি। নগর-সুলভ ভীরু পদক্ষেপ করছি।

তবু কুয়াশার অঙ্গুলি লিখে যায় লেখন অস্তমিত তারার পাশে পাশে। নীল আকাশ-প্রান্তে ছায়াপথের ইঙ্গিত, জাগে, শিহরিত হয় শাল-তমাল। যা দেখনি অমিত সেন তাই কি দেখতে যাচ্ছ?

ডাকবাংলোর খানসামা ব্যস্ত, অথচ বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর রাত্রে কি খানার যোগাড় করব?"

লোকটি সাঁওতাল জাতীয়, ভাঙা বাংলায় কথা বলিয়া আরাম পায়।

চাল ও মুর্গি ভিন্ন কিছু সংগ্রহ নাই তার। অগত্যা রাইস ও ফাউল-কারিতে তৃপ্ত থাকিবার আশ্বাস দিলাম।

পেটুকের আশা, রোগীর ভরসা, রাইস ও কারি। যেখানে কোন খাদ্য পাওয়া যায়না সেখানেও পাই। যে ভোজনালয় মেনুর ধার ধারেনা, সেখানেও মিলিতে পারে। দেহাতী গ্রামে চা না পাও ফাউলকারি পাইবে। মোটা লাল চালের ভাত কানা উঁচু শানকীতে ঢালিয়া, গৃহপালিত পক্ষীর গলায় ছুরি বসাইয়া রাতারাতি এলেমদার পথিককে সন্তুষ্ট করে স্বয়ং নিয়োজিত বাবুর্চিকুল। রন্ধন খারাপ ভাল প্রশ্ন ওঠেনা। রাইস ও কারি অগতির গতি। গৃহিণী-শাসিত ধর্মাত্মা বাঙালী ছোটে নিষিদ্ধ পক্ষীমাংসের লোভে মধুপুরে, গিরিডি, ঝাড়গ্রাম। সুতরাং আমি প্রীত হইলাম। তাহার পূর্বে এক পেয়ালা চা? যদিও রাত্রি নয়টা, তবুও ভ্রমণ-ক্লান্ত দেহ তো। খানসামা যেন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া চায়ের নির্মাণে গেল। যেন, তার মস্তবড় কাজ আছে। সামান্য চা তৈরি সাজেনা।

চায়ের দেরী হইতেছে। আমি ডাকবাংলোটি একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে উঠিলাম। এল-ধাঁচের বাড়ীটি। এধারে ঘরটি সম্পূর্ণ পৃথক। ভিতরের বারান্দায় আসিলাম। দূরে বাবুর্চিখানায় টিপিটিপি তেলবাতি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে ডাকবাংলোর হাতা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত। ওধারের কক্ষ দুইটি হইতে উজ্জ্বল বাতির আলোক দেখা যায়, কিন্তু জনসন্দর্শন ঘটেনা। আরো একটু অগ্রসর হইয়া আসিলাম।

দেখিলাম ডাকবাংলোর খানসামা ট্রে হাতে ওধারের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। শূন্য ডিকাণ্টার ও ওয়াইন গ্লাস দেখিয়া পানীয় সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট রহিল না। রেস্তদার লোক নিশ্চয়, তাই আমার চা ফেলিয়া উহাদের সুরা যোগাইতে খানসামার এত তৎপরতা?

মনে মনে বিরক্ত হইতেই হঠাৎ একটি তীব্র—মধুর হাসির শব্দে চমাকত হইলাম। বিহারের অখ্যাতনামা পল্লী-নগরের নিশীথের যামে ও হাসি আকস্মিক বিস্ময়। ধাতব ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। নিশীথিনীর কালবক্ষে ইস্পাতের ছুরি। কাটিয়া তুলিয়া লইল হৃৎপিণ্ড রাত্রির। আবার শ্রাবণ বর্ষণের মাদকভরা রিমঝিম স্বরে সান্ত্বনার ঔষধি বুলাইয়া দিল। সুরা ও নারী। অজ্ঞাত সহবাসীর চরিত্র মধুর, সন্দেহ নাই।

খানসামার সহকারী মশালচী ট্রেতে একটা ভাঙা গোছের টী-পট ও পেয়ালা-পিরীচ ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ করিল। দুইটি ডিমের পোচও আছে।

ঘরের টেবিলে ট্রে রাখিতেই ভাঙা টীপয় ও লোকটির অর্ধমলিন পায়জামা চোখে পড়িয়া মন বিরস হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে খোদ খানসামার হস্তে ক্ষণপূর্বদৃষ্ট ঝক্‌ঝকে গ্লাসের কথা মনে পড়িয়া সূচীসূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘ বিদ্বেষ রেখা অনুভব করিলাম। আমি যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত নই—তাই খানসামার সহকারী আমার জন্য ভাঙা পাত্রে চা আনিয়াছে। উহারা বিশিষ্ট অতিথি ডাক-বাংলোর। খানসামার নামে রিপোর্ট করিবার বাসনা জাগিতে লাগিল। তাহার পূর্বে শুনিয়া লইব ও ঘরের বাসিন্দা কারা :

সহকারী আমার প্রশ্নের ভাসা-ভাসা উত্তর দিতে লাগিল। একজন ধনী ভদ্রলোক এই খোট্টাই দেশে জমিদারী কিনিতে আসিয়াছেন। তিনি গত দুইদিন হইতে ডাকবাংলোর অতিথি। স্থানীয় রাজার ম্যানেজার তাঁহাকে গেষ্ট-হাউসে ওঠার নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিনি যান নাই।

কেন ?

ঢোঁক গিলিয়া লোকটি বলিল যে, কারণ রাণীসাহেবা এখানে আছেন, তাই।

রাণীসাহেবা! কোথাকার রাণী ? তাঁহার সহিত ভদ্রলোকের কি সম্পর্ক ?

সহকারী বলিল, সে তাহা জানে না, হয়তো খানসামা জানিতে পারে।

চা-খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র টর্চ হাতে আবার বাহির হইলাম। কি জানি, এক মুহূর্ত ডাকবাংলোতে থাকা সহ্য হইতেছিল না। বিদ্বেষে আমি অভিভূত। আমার অপেক্ষা অধিক আদর যাহাদের, তাহারাই থাকুক। কল্যই এখানকার কাজ মিটাইয়া যাত্রা করিব স্থির করিলাম।

ফণী-মনসার ঝোপের পাশে খস্ খস্ শব্দ। চাঁদের আলো আবার মেঘের জাল কেটে বহির্গত। আবার মনের কোণে কোণে অস্বস্তি। জমিদার, রাণীসাহেবা ? এর মধ্যে, তুমি অমিত সেন ঠিকাদার, কতটা বেমানান ? তোমার সোলার হ্যাট আর হাঁটু খোলা সর্ট। কিন্তু অর্থই মূল। সেই অর্থ উপার্জনের পথে চলেছি আমি। ভুবন ভুলে আছি লোহা কাঠ নিয়ে। বিদিশা বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে শয্যায়। আমি চলে এলাম দেশীয় গ্রাম্য-রাজার স্কুল-বাড়ীর ঠিকেদারীর আশায়।

নিঃশ্বাস দীর্ঘ হ'ল কামনা-খিন্ন বুক খালি করে উঠে এল বাসনায় তপ্তশ্বাস। শয্যার বুকে বিদিশার নবনীত তনু! আহা!

টর্চের আলো ফেলে পথ দেখে চলেছি। দূর চক্রবালে কুয়াশা আর নেই। চাঁদের আলোর বন্যায় ঝল্‌মল্‌ করে করে উঠেছে ছোট ছোট পাহাড়, বড় বড় মাঠ।

রাণীসাহেবা ও জমিদার! অমন হাসি কার? অন্ধকার রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ শিউরে উঠলাম। ওরা মানুষতো? এই জনবিরল ডাকবাংলোতে প্রেত-অধিবেশন হচ্ছে না তো? খানসামার কথা মনে হ'ল। না না। আমি পাগল হয়েছি নাকি? কিন্তু অস্বস্তি কেন?

কি রহস্য দুটি নরনারীকে কেন্দ্র করে আছে। দূর থেকে কতটুকু বোঝা যায়? রাণীসাহেবা ও জমিদারজী। দু'জনের মধ্যে মিল কোথায়? তবু সুরা, তবু হাসি!

ফণী-মনসার ঝোপের পাশে আবার মৃদু শব্দ। বুকে চলে যে প্রাণী, সেই যেন নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে মাটিতে ঘষে ঘষে লম্বা সুতোর মত শরীর নিয়ে। পালাও, অমিত সেন। এতক্ষণে তোমার রাইস্‌ ও ফাউলকারি প্রস্তুত হয়েছে। ডাকবাংলোয় যাও। অজানা রহস্য ও আলোকে শ্রেয়তর অন্ধকারের বিভীষিকা থেকে।

খানা-কামরায় যাওয়ার অনিচ্ছা জানাইয়া নিজের ঘরে আহারাদি শেষ করিলাম। আমার গুরুগাম্ভীর্য ও বিরস বদনে কাজ হইল। খানসামা বাধ্য হইয়া আমাকে যত্ন করিতে লাগিল।

আহারাদির পরে আরাম-চেয়ারে লম্বমান হইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। ওধারের কক্ষ দুইটি নীরব হইয়া গেছে। রাত্রি এগারোটা বাজে। পাঙ্খা-কুলী উহাদের ঘরে টানা-পাখায় দড়ি টানিতেছে। আমি পাঙ্খা-কুলীর ব্যবস্থা করি নাই।

কতকগুলি টাকা-কড়ির হিসাব মিটাইবার ছিল; সুতরাং অপরের চিন্তা রাখিয়া উঠিলাম। দেওয়ালে ঝোলানো ল্যাম্পের আলোয় শুষ্ক হিসাব-নিকাশ মিটাইতে মিটাইতে কেন জানি না মনে হইল; আমার রসহীন জীবনে বোধ হয় অকস্মাৎ অজানা উৎস হইতে রসের প্লাবন বহিবে। না, সম্ভব নয়। জীবনের মাধুর্যের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়াছি বহুদিন। অথচ, কলেজ-জীবনে আমি কবিতা লিখিতাম, কলেজ-ম্যাগাজিনের আমি ছিলাম সম্পাদক! পিতা

বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন কিশোরী বালিকার সহিত, পিতা নিজ ব্যবসায়ে বসাইয়া দিয়াছিলেন। বিরাট ব্যবসায় আজিও বজায় রাখিয়াছি মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে। স্বভাব-মাধুর্যের প্রশংসা আছে আমার কলিকাতা মহানগরীতে। ধনীর পুত্র ধনী আমি। আমার হাতে এ পর্যন্ত হীরকাঙ্গুরীয় ওঠে নাই। আমি পদস্থ। কিন্তু আমার ট্রামেবাসে আপত্তি নাই। আমি তরুণ-সুদর্শন। কিন্তু বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন প্রেমপাত্রী আমার নাই।

তবু, ব্যবসায়ীর পুত্র, আজন্ম ব্যবসায়ী। মক্ষিকার উদর হইতে মিষ্ট সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি বংশগত। ভোগ করিতে শিখি নাই; সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছি। এক পয়সা খরচ করিবার পূর্বে একশোবার ভাবা পিতার নির্দেশ। ধনী আমি। তবু জমিদার; 'রাণীসাহেবা' শুনিয়া মনটা দমিয়া যায়। উহারা জন্মগত অভিজাত, আমি "nouva riche."

আমার হিসাবপত্র ব্যাহত হইল উচ্চ পুরুষ কণ্ঠের আবৃত্তিতে—

"আমি পার্থ, দেবী,

তোমার হৃদয়-দ্বারে প্রেমার্ত অতিথি "

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। উচ্চারণের বিশুদ্ধতায়, ভাবের অপূর্ব প্রকাশে, ব্যঞ্জনায় দুর্লভ কণ্ঠ। বিহারের পল্লীতে শুনিবার আশা করি নাই, স্বর অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে আমারি গৃহদ্বারে ভারী পায়ের শব্দ নামিল। চকিত হইয়া শুনিলাম ভাষায় কে যেন প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছে।

বিরাট মূর্তি—প্রৌঢ় রূপবান পুরুষ। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে বিশালকায়। বড় বড় চোখ ঈষৎ রক্তিম—দ্রাক্ষাসুন্দরীর দাক্ষিণ্যে বোধ হয়। লাল অধর স্ফীত। মোটা আঙ্গুলে চুরোট ধরা। পরিধানে পায়জামা ও গরদের পাঞ্জাবি। বিশেষ ভঙ্গিতে বুকে হাত রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

"আসতে পারি কি?"

"আসুন, আসুন।" অনুমানে বুঝিলাম স্বয়ং জমিদার মহাশয় মোলাকাতে আসিয়াছেন। একদা যে অপরূপ রূপ তাঁহার দেহতটে বাসা বাঁধিয়াছিল, সে রূপের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি মনোহর। কিন্তু, বড়লোকের সবই বিচিত্র। মনে হইল স্ফীত ওষ্ঠের সবটুকু রক্তিমা প্রকৃতিদত্ত নহে। ভুরুর টানে, চোখের প্রান্তে কাজল-তুলির কলাচাতুর্য আছে। হাতের নখ দীর্ঘ সূচীর মত। কেমন বিতৃষ্ণা হইল পুরুষের এমন মহিলা-জনোচিত প্রসাধন দেখিয়া।

আসন পরিগ্রহ করিয়া জমিদার মহাশয় বলিলেন, "ক্ষমা করতে হবে। এত রাত্রে বিরক্ত করতে এলাম। আমার আবার রাত্রে ঘুম হয় না। কথা বলার লোক না পেলে বিপদ ঘটে। রাণীসাহেবার সৌন্দর্য-নিদ্রার দরকার। কাজেই আপনার শরণাপন্ন হ'লাম।"

"কোথাকার রাণী উনি?"

শুনিলাম বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রমহিলা। ছোট গেঁয়ো হিন্দু রাজার স্ত্রী। হাওয়া পরিবর্ত্তনে আসিয়াছেন। জমিদার মহাশয়ের সহিত ট্রেনে আলাপ।

"হাওয়া বদলাতে ডাকবাংলো?"

"এখানে দু'দিন থেকে দেখছেন। জায়গাটা ভাল লাগলে তবে বাড়ী নেবেন। রাণীসাহেবার খেয়াল।"

"রাজাসাহেব কি—?"

আমার অহেতুক কৌতূহলে বিব্রত ভদ্রলোক কথাটা চাপা দিলেন, "না রাজাসাহেব সঙ্গে নেই। ওঁর পুরানো আয়া আছে। তা, আপনি কতদিন থাকবেন?"

"বলা শক্ত"। ক্ষণপূর্বে অচিরাৎ স্থান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলাম। ভদ্রলোক আলাপী, সহজেই গল্প জমিয়া উঠিল।

ভদ্রলোকের নাম চন্দ্রাপীড় চৌধুরী। অবকাশ-যাপনের জন্য নির্জন স্থানটি মনোনয়ন করিয়াছেন। ডাকবাংলোতে কয়েকদিন থাকিয়া এখানকার একটি ছোট জমিদারী ক্রয় করিবেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিয়াছেন। স্থানীয় রাজার ম্যানেজার তাঁহাকে সমস্ত সংবাদাদি যোগাইতেছে। শীঘ্রই চৌধুরী মহাশয় মনস্থির করিয়া ফেলিবেন।

বুঝিলাম, রাণীসাহেবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। চন্দ্রাপীড় চৌধুরী জমিদারী কিনিলে রাণীসাহেবার অবশ্যই হাওয়া পরিবর্তনের নিমিত্ত ভাড়াটে বাসার সন্ধান করিতে হইবে না। অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রৌঢ় ধনীর সহিত সুন্দরীর পথে যোগাযোগ! এখন জল কতদূর গড়ায় লক্ষণীয়।

প্রশ্ন করিলাম, "আপনি কি পূর্বেই জমিদার ছিলেন?"

অস্বচ্ছন্দ উত্তর আসিল, "কি না ছিলাম, অমিতবাবু? তবে, প্রধানতঃ আমি ব্যবসায়ী।"

বাঁচিয়া গেলাম। বংশপরম্পরায় যে অভিজাত্য, তাহার সম্মুখে আমি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি। মনে হয়, নিজের সঙ্কীর্ণ ও সাবধানী জীবন-যাত্রা

প্রণালী কত অসম্পূর্ণ। তাহা হইলে তো ভদ্রলোক আমার সমগোত্রীয়। হৃদ্যতায় অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলাম।

"আপনার ব্যবসাটা কি, চৌধুরী মশাই ?"

"সামান্য, অমিতবাবু। আপনাদের মত ঝুনো ব্যবসায়ীদের কাছে বলবার নয়। ও সব কথা যেতে দিন। এমন চমৎকার রাত্রি ব্যবসার জন্যে নয়, অমিতবাবু। স্বাস্থ্য পান চলে কি ?" সর্বনাশ! আমার সঞ্চয়ের সোনা যে তাহা হইলে সোনালী পানীয়ে গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। প্রাচীন-পন্থী পিতার নিষেধ আছে। তবু আজ নগরী হইতে দূরে অখ্যাত বিহারী পল্লীতে রাত্রির নির্জন যামে অপরিচিতের প্রস্তাব অসঙ্গত মনে হইল না। যেন আমার পূর্বতন সত্তার কোন ধ্যান-ধারণাই বর্তমান পরিস্থিতিতে খাপ খাইবে না। অতি কষ্টে নিজের লুপ্তপ্রায় পূর্ব সত্তাকে সংহত করিয়া বলিলাম, "না, আমি ও সব খাই না।" তখনি নিজেকে কেমন দীন মনে হইল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম "তবে, আপনি খান না। খানসামাকে বলে দেই।"

হুইস্কী সেবন করিতে করিতে চন্দ্রাপীড় অন্য লোক হইয়া গেলেন। ডাক-বাংলোর মাঝারি আকারে গৃহটিতে যেন তিনি আর ধরিতেছেন না। সারা ঘর পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে তাঁর নববর্ধিত ব্যক্তিত্ব। যেন অনেক রূপ আছে তাঁহার। আমি ঠাট্টা করিলাম, "নামটি চমৎকার মানানসই তো আপনার—চন্দ্রাপীড় চৌধুরী।

আমার কথাকে আবৃত করিয়া আবার সেই অ : স্বরছন্দে বাজিয়া উঠিল :—

"অন্ধকার মরণের ছায়
কতকাল প্রণয়ী ঘুমায় ?—
  চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার।
বসন্তের বেলা চলে যায়,
বিহগেরা সান্ধ্যগীত গায়,
  প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার।"

মোহিত হইয়া শুনিতেছিলাম। চন্দ্রাপীড় চুপ করিলে বলিলাম, "তারপর ?"

"তারপর আর নেই। তারপরে এই।" এক চুমুকে সুরার পাত্র শেষ

করিয়া কাচের গ্লাসটি তিনি অগ্নিস্থলীর কাঠে ছুঁড়িয়া মারিলেন। ঝন্ঝন্ শব্দে কাচের টুকরা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

"শুভরাত্রি, অমিত সেন।" টলিতে টলিতে চন্দ্রাপীড় চৌধুরী বাহির হইয়া গেলেন।

কোথায় গেলেন উনি? নিজের ঘরে, না কি সেই রাণীসাহেবার কক্ষে? এতক্ষণ হয়তো রাণীসাহেবাকে নৈশ প্রসাধনের সুযোগ দেবার জন্য আমার ঘরে বসে কথাবার্তায় প্রতীক্ষার দুঃসহতা কাটাচ্ছিলেন। সৌন্দর্য-নিদ্রা? রাণীসাহেবা অবশ্য সুন্দরী। যেমন তদ্‌গতচিত্তে চৌধুরী মশাই রাণীসাহেবার নাম বলছেন, তাতে প্রেমাসক্ত, সন্দেহ নাই। দু'জনেই ডাকবাংলোর অতিথি। চমৎকার!

ধন্য সেই হিন্দুকুলতিলক রাজা, যিনি বিধর্মী নারীকে রাণী করলেন। রাণী নিশ্চয় অপূর্ব রূপসী। দেখার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু আজ রাত্রে তো সম্ভব নয়।

কিন্তু, অমিত সেন, বেশতো তুমি? একটা বুড়ো মাতালকে সহ্য করে গেলে এতক্ষণ অনায়াসে? এমনকি, তার পানাসক্তির খোরাক যোগালে তুমি। তুমি না মদ-মাতালকে ঘৃণা করতে? আশ্চর্য।

দূর হইতে রাত্রির নির্জনতায় ক্ষীণ আবৃত্তি আবার শোনা গেল:—

"My heart is sad, my hopes are gone,
My blood runs coldly through my breast;
And when I perish, thou alone
Wilt sigh above my place of rest."

ধাতব হাসির ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল করুণ আবৃত্তির গাম্ভীর্য ব্যাহত করিয়া। ক্ষণপূর্বে কাচ ভাঙ্গার শব্দের কথা মনে পড়িল। উভয় শব্দের যোগসূত্র আছে। নিজেকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ক্ষয় করা!

কতক্ষণ নিদ্রাগত ছিলাম জানি না। কানের কাছে দরজায়-জানালায় আঘাত করিয়া কে যেন ডাকিতেছে, "অমিট্‌বাবু, অমিট্‌বাবু!" গলা বিদেশিনীর।

আচমকা জাগিয়া উঠিলাম। দরজা প্রথমেই না খুলিয়া জানালার কাছে আসিলাম। অবাঙ্গালী আয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছে, "অমিট্‌বাবু শিগ্‌গীর আসুন। রাণীসাহেবা ডাকছেন।"

রাণীসাহেবাকে চক্ষেও দেখি নাই। তিনি আমাকে ডাকেন কেন?

"চৌধুরী সাহেব যেন কেমন করছেন। আপনি আসুন।"

কে জানে ইহারা কে? গভীর রাত্রে আমাকে গৃহের বাহির করার অজুহাত কিনা। হয়তো ইহারা ডাকাত। কিন্তু, আমার সঙ্গে টাকা নাই, আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আমার ভয় কি?

রাত্রি দ্বিপ্রহরে চলিয়া আসিলাম রাণীসাহেবার গৃহে আয়ার সহিত। বারান্দায় টুলের উপর গোবেচারী পাঙ্খাকুলী দড়ি টানিতেছে। ঘরের আলো নীল রেশমের রুমালে ঢাকা। স্তিমিত জ্যোতিতে দেখিলাম, যা ভাবিয়াছিলাম তাই। রাণীর শয্যায় অচেতন চৌধুরী সাহেব—খানসামাকে ডাকিয়া ডাক্তার আনিতে বলিয়া প্রাথমিক চিকিৎসায় মন দিলাম।

সাদা বিছানায় সিল্কের পা-জামা-পরা চৌধুরী মশায়ের অচেতন দেহ। খয়েরী কর্ডেড ভেলভেটের ড্রেসিং গাউন। খাটের নীচে পায়ের চটি রাণী-সাহেবার জরিদার জুতোর পাশাপাশি। সৌখীন পুরুষ বটে।

ব্যভিচারের ফল বেশী বয়সের মদ্যপকে আক্রমণ করেছে নিশ্চয়। সারা ঘর বহুমূল্য রক্ত গোলাপে আবৃত—প্রেমিকের উপহার। টেবিলে অবসিত পানপাত্র, মাংসের হাড়, পোলাউএর দানা। খানা-কামরায় ওঁরা যাননি। এখানেই পান-ভোজন শেষ করেছেন। ভেবেছিলেন, আমি-রূপ বাধা খানা-কামরায় উপস্থিত থাকবো। তারপরে, আমার নিদ্রার সময়ে, খানসামা প্রভৃতির শয্যা গমনের সুযোগে রাণীসাহেবার ঘরে প্রবেশ করলেন প্রৌঢ় প্রেমিক চন্দ্রাপীড় মন্মথের পীড়নে। এত অনাচার এমনভাবে দেখব আশা করিনি। এখন আমিসুদ্ধ জড়িয়ে পড়লাম।

সারা ঘরে যেন লালসার চিত্র বিদ্যমান—শয্যার দলিতরূপে, টেবিলের রৌপ্য-প্রসাধন-সামগ্রীতে, হাল্কা গালিচার ওপর ছেড়ে রাখা ময়ূরকণ্ঠী বেনারসীতে আর বাসনার মূর্তি অজস্র রক্তগোলাপে। কিন্তু, রাণীসাহেবা কই? ওই যে, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা শাড়ী-পড়া পশ্চাদ্দেশ দেখছি কেবল—কাল কবরীর একাংশে জরির ফুল স্থানচ্যুত। কী আশ্চর্য দেহ-সুষমা, যেন সর্পিণীর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হরিণীর ভীরুতায় গঠিত! না জানি, সুন্দরীর মুখ কেমন অপরূপ! আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছেন, অসময়ের আগন্তুক, নির্লজ্জ প্রেমলীলার অবাঞ্ছিত দর্শক? তাই মুখ ফিরিয়ে আছেন। কিন্তু, বিপরীতমুখিনীর রূপেই তো আমি

চমৎকৃত। বিদিশা, বিদিশা, আমাকে রক্ষা করো। এক পুরুষের বাসনা-কামনার নিবৃত্তির পরে রূপসী বীতরাগা। কিন্তু ও মুখ আমার দিকে ফিরলে আমি কি স্থির থাকবো? আজন্ম সংযত আমি? বিদিশা, আমার কথা এই মুহূর্তে তুমি চিন্তা করো।

নীল রেশমের রুমালখানা তুলিয়া লইলাম। গৃহ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হইয়া উঠিল। চৌধুরী সাহেবের নাড়ী দেখিলাম। অসুস্থ গতি নাড়ীর। চন্দ্রাপীড়ের মুখ বিবর্ণ-ঘর্মাক্ত। কিন্তু তিনি একেবারে অচেতন নন। চাপা আর্তনাদে বিরাট দেহ তাঁহার মাঝে মাঝে কম্পিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের বাসর-শয়ন খাটটিও সতরঞ্চি-ঢাকা মেঝের উপর কাঁপিতেছে। চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম স্পষ্ট উচ্চ স্বরে, "কি হয়েছে? কি করব ইসারা করে বলুন। ডাক্তারকে খবর দিয়েছি।"

অতি কষ্টে চৌধুরী মহাশয় একটি হাত উঠাইয়া হৃদয়ের দিকে দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। অন্য হাতের আঙুল বিস্তৃত করিয়া অপর কক্ষের দিকে দেখাইয়া মুখবিবর নির্দেশ করিলেন।

বিবর্ণ-ঘর্মসিক্ত মুখের কি আশ্চর্য ভাবাভিব্যক্তি! অতি সহজে মুখের রেখা দেখিয়া তাঁহার মনের কথা আমি পাঠ করিতে পারিলাম। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের রোগ আছে। তাঁহার নিজের কক্ষে ঔষধ—আনিয়া সেবন করাইতে হইবে।

চন্দ্রাপীড়ের ঘরে গেলাম। যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহা নয়। বিলাস ও ঐশ্বর্যের চিহ্ন দেদীপ্যমান দেখিলাম না। হাল্কা একটি বাক্স, বেডিং। তবে পরিচ্ছদাদি, যাহা বাহিরে রহিয়াছে, সব বেশ সৌখীন। টেবিলে জলের গ্লাস, পাশেই ঔষধের বাক্স রক্ষিত। বুঝিলাম চন্দ্রাপীড়ের সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়।

ঔষধ লইয়া পুনরায় রাণীসাহেবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। মুখে ঔষধ দিতে না দিতে পাণ্ডুতা হ্রাস হইল, স্বাভাবিক হইল অক্ষিতারকা। কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি মুখে ফুটিল। নিমেষে চন্দ্রাপীড় গভীর নিদ্রাগত হইলেন।

বিপদ গণিলাম। ডাক্তার এখনই আসিবেন, হয়তো সঙ্গে কম্পাউণ্ডার যন্ত্রপাতি লইয়া আসিবে। স্থানীয় লোক তাহারা। এ কক্ষে রাণীসাহেবার উপস্থিতি কেমন দেখাইবে? অদ্ভুত নারী! মুখ তিনি একবারও ফেরান নাই।

তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলাম। আয়া বাবুর্চিখানায় জল গরম করিতে গিয়াছে। চন্দ্রাপীড়ের হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তাই সেঁক দিতে বলিয়াছি। এখন রাণীসাহেবার সহিত কথা বলা প্রয়োজন।

অপরিচিতা মুসলমানকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব? ব্যভিচারিণী নারী সে। তবু 'রাণীসাহেবা' ডাকিতে মন চায় না। সাদা শাড়ী জড়ানো তন্বী মূর্তি; বিষাদে মলিন যেন। পিঠ শুধু দেখা যায়—লজ্জায় বেদনায় যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। কিছু পূর্বের লালসাযজ্ঞের রঙ্গিণীর চিহ্ন এই মৌন মূর্তিটির কোথাও লেখা নাই।

কি আশ্চর্য পেলব তনুদেহ। প্রৌঢ় চন্দ্রাপীড়ের উন্মাদনার কারণ বুঝিলাম। অজন্তার মূর্তি ঈষৎ হেলিয়া দণ্ডায়মানা। ক্ষীণ কটির উর্ধ্বে অনাবৃত পৃষ্ঠদেশ, চোলি ব্লাউজের রেখার নীচে। শুভ্র মর্মরের মত গাত্র দেখা যায়। লুব্ধ হইয়া ওঠে মন। আমি অমিত সেন, জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বিখ্যাত। স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীতে, লিপ্সা নাই। আজ আমার মনে ভাব-বৈলক্ষণ কেন? গভীর রাত্রে প্রবাসে কি করিতেছি আমি মদ্যপ লম্পটের শয্যাপার্শ্বে ব্যভিচারিণী মুসলমানীর পশ্চাতে? আমার ঘৃণা কই? কোন বিতৃষ্ণা-বিয়োগের চিহ্ন নাই। বিদিশা, আমাকে রক্ষা করো।

অন্ধকার আবর্তিত হয়ে উঠল। সাবধান, অমিত সেন। তোমার সংস্কার আজই বোধ হয় ধুয়ে যাবে ফেনিল সুরা-স্রোতে। যেখানে সেখানে আসা, যার-তার সঙ্গে মেশার ফল নেই?

মা! মা! অনেক দূর থেকে বাতাসের স্রোতে ভেসে এল কার কণ্ঠ? কে যেন ডাকছে, 'মা, মা'! বিদিশার কণ্ঠ! বিদিশা আমার প্রার্থনা শুনেছে। দূর থেকে বিদিশা আমাকে বলে দিচ্ছে, কি আমি করব। তাই হবে।

—"মা!" স্থির-নিশ্চিত কণ্ঠে রাণীসাহেবাকে সম্বোধন করিলাম, "মা, আপনি পাশের ঘরে যান। এখানে এখনি লোকজন আসবে। আয়াকে বলুন, আপনার শাড়ীটাড়ীগুলো লুকিয়ে ফেলতে। আপনার কোন নিন্দা হবে না মা, আমি থাকতে।"

রাণীসাহেবার দেহ একবার নড়িয়া উঠিল মাত্র। তিনি কথা শুনিলেন, কিন্তু মুখ ফিরাইলেন না।

"মা, আমার দিকে তাকাবেন না? আমি তো আপনার ছেলে।"

রাণীসাহেবা ফিরিয়া চাহিলেন এতক্ষণে। বিস্মিত স্বরে বলিলেন' "আমাকে মা বলিলেন ?"

এতক্ষণে সেই মুখ দেখিলাম। সুন্দরীর অপরূপ মুখ! ওঃ ঈশ্বর তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এমন ব্যর্থ কেন ? দক্ষিণ গণ্ডের সমগ্র অংশ শুষ্ক ক্ষতে বিকৃত-বিবর্ণ। বামপার্শ্বের অনবদ্য মুখশ্রী বীভৎস করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণে প্রকাণ্ড ক্ষতের দাগ। বিতৃষ্ণায় কণ্ঠ রোধ হইয়া আসে। ইহাকেই চন্দ্রাপীড় ভালবাসিতে আসিয়াছিলেন!

ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চন্দ্রাপীড় আমাকে ডাকিল, "অমিতবাবু, শুনুন। বড় খাটাচ্ছি আপনাকে। একখানা তার করতে হবে।" জমিদার মহাশয়ের নায়েব ইত্যাদিকে তার করিতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করিয়া ঠিকানা দিলেন চন্দ্রাপীড় নকুলেশ্বর লেনের এক বাড়ীর। "আমার বোন থাকে।"

"আপনার নিজের বাড়ীতে তার করলেন না ?"

ত্রস্তে চন্দ্রাপীড় উত্তর দিলেন, "ওতেই হ'বে।"

"এই শরীরে ভোরের গাড়ীতেই রওনা হ'বেন। একদিন অন্ততঃ বিশ্রাম নিন।"

"না, ভাই অমিত। কিছু মনে কোর না। তোমাকে তুমিই বলছি। তুমি অনাত্মীয় হয়ে বিদেশে আমার এত করেছ। জীবনে ভুলবো না।"

"কি আর করতে পারলাম ? এক রাত্রের আলাপ মাত্র। চলেই তো যাচ্ছেন।"

ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে শুনিলাম, "মৃত্যু পশ্চাদ্ধাবন করছে, অমিত। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে আবার আক্রমণ হ'তে পারে। আপাততঃ নিশ্চিন্ত। তাই পালিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাব বোনের কাছে।"

"তা সত্যি, কলিকাতায় আপনার লোকজন আছে কত। চিকিৎসা হ'বে।

"বোন ছাড়া কেউ নেই। এ রোগের চিকিৎসা হয় না। আবার আক্রমণ হলেই হয়তো—।" একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গীতে নিজের মনে বলিয়া চলিলেন, "লোভ হ'ল শেষ ভোগের জন্যে। ভোগ আর কি করেছি ? সারাটা জীবন ছায়া নিয়ে কাটালাম।"

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাণীসাহেবা ?"

প্রভাতের আলোর আভাস পূর্ব গগনে দেখা দিয়াছে। সাঁওতাল বাড়ীতে

মোরগ ডাকিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রাপীড় আলোর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল মুখ আমার দিকে ফিরাইলেন—যন্ত্রণাভোগের অন্তে শ্রান্ত-ক্লান্ত, শিথিল-পেশী প্রৌঢ়ের মুখ। গত রাত্রে যাঁহাকে রোমান্টিক নায়ক বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ নিশা শেষে তাঁহাকে বৃদ্ধ লম্পটরূপে দেখা গেল। গত রাত্রের রং করা মুখ প্রভাতের আলোয় সঙের মত দেখাইতেছিল। খয়েরী ভেলভেটের প্রাচীনতা চোখে পড়িতেছিল। বৃদ্ধ বয়সে তরুণ নায়ক সাজিবার প্রচেষ্টা হাস্যকর। সঙ্গিনীটিও উপযুক্ত। বিধর্মীবীভৎস রমণী একটি।

অন্য সময় হইলে চন্দ্রাপীড়কে ঘৃণা করিতাম। কিন্তু গত রাত্রে যে ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, আজ প্রভাতে তাহাকে কোন কারণেই ঘৃণা করা চলে না। তাছাড়া, ঘৃণাও আমি করিতে পারিতেছি না—ভালবাসিতেছি। আমি, অমিত সেন, অন্যরূপ ধারণ করিতেছি।

চন্দ্রাপীড় বলিলেন, "রাণীসাহেবা আমার সঙ্গী নন—ওঁর দায়িত্ব আমার নয়। পথের আলাপ পথেই শেষ হবে। তুমি দেরী করোনা ভাই, আমার ব্যাগ খুলে টাকা নিয়ে টিকেটটা করে আন, আর তারখানা পাঠাও। নইলে, দুটি ভাতও পাব না যেয়ে।"

ধনী ব্যবসায়ীর কণ্ঠের দীনতায় বিস্মিত হইলাম, "আচ্ছা, আপনার ব্যবসাটী কি? কোথায় কর্মস্থল?"

"আমার ব্যবসা আমার সঙ্গে, অমিত। ভয় নেই, সবই বলে যাবো। তবে, রাণীসাহেবার ইতিহাসটাই আগে শোন। উনি রাণী মোটেই নন—হিন্দু রাজার রক্ষিতা ছিলেন। দেওয়ানের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল, তাই গালের ওই দাগ রাজার শাস্তি। ক্ষত্রিয়ের তরবারির চিহ্ন। রূপ যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িতা হলেন। নামমাত্র মাসোহারায় দিন চলে অতিকষ্টে। পুরনো আয়াকে সঙ্গে নিয়ে এখানে-ওখানে বেড়ান। ফুফুর বাড়ী চলেছিলেন। ট্রেনে আমার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে নেমে পড়লেন ভবিষ্যতের আশায়।'

চমৎকৃত হইলাম, "এ সব উনি বলেছেন নিজে?"

চন্দ্রাপীড়ের মুখে বিচিত্র-বিদ্রুপাত্মক হাস্য দেখা দিল, "না। উনি একদিন সামাজিক জগতে স্বনামধন্য ছিলেন। ওঁর ইতিহাস সবাই জানে। ওঁকে আমি অনেক দেখেছি। শুধু ওঁর মিথ্যা কাহিনীকে সত্য বলে নিয়েছি—ভান করছিলাম। ভান করছিলাম ভালবাসার।"

"কি আশ্চর্য! কেন?"

"এ যে আমার জীবনের শেষ অভিনয়। অমিত, আমি জমিদার নই, ব্যবসায়ী নই—পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পেশাদার অভিনেতা। বয়স হয়েছে, কালব্যাধি ধরেছে। শেষ সম্বল কয়েকটি টাকা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। সারাজীবন আমাকে করতে হয়েছে রাজা-জমিদারের ভূমিকা। ইচ্ছা হয়েছিল, সামান্য কয়েকদিনের জন্যে অন্তত তাই সাজি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এসে উঠলাম ডাকবাংলোয়, জমিদারের চালে কয়েকদিন থাকবো বলে। ফিরে যেতে হবে বোনের অন্ধকূপ গলির বাসা-বাড়ীর বাইরের ঘরখানাতে। নটকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। তাতে সহায়-সম্বলহীন গরীব। সেইখানেই যে-কয়েক-দিন বাঁচি কৃপাদত্ত অন্নে বাঁচব। আজকের ইতিহাস আমার শেষবারের ভোগ।"

এতক্ষণে মনে হইল। হ্যাঁ, চন্দ্রাপীড় চৌধুরী সেকালের রঙ্গমঞ্চের নায়ক। আধুনিক নাট্য-বিবর্তনে স্থানচ্যুত চন্দ্রাপীড়। আমরা তাঁহার কথা মনে রাখি নাই! শিশুকালের স্মৃতি মনে পড়ল :—

"জন্ম দৈবায়ত্ত, কিন্তু মনুষ্যত্ব করায়ত্ব মোর"—কর্ণবেশী চন্দ্রাপীড়কে চোখের সম্মুখে যেন আবার দেখিতে পাইলাম। সে অভিনয় এখন যাত্রা নামধেয়। বিগতযৌবন, ব্যাধিগ্রস্ত নট, তাই চরিত্রানুযায়ী নব-ভূমিকার অভিনয়ে বিহারী ডাকবাংলো নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ধন্য অভিনেতা! তবু অনেক কিছু অবোধ্য আছে। প্রশ্ন করিলাম, "টাকা খরচ করছেন, তাহ'লে ওইরকম স্ত্রীলোককে"—

"ওইতো অভিনয়, অমিত ওকে বুঝিয়ে দিলাম ও এখন সুন্দরী। ওর কুৎসিত মুখ এখনও লোভনীয়। এখনও ধনশালী বিশিষ্ট পুরুষ ওকে চায়। এ প্রমাণে ও জীবনে আবার বেঁচে উঠবে। অভিনয় আমার সার্থক হয়েছে। এই আমার শেষ ও শ্রেষ্ঠ অভিনয়।"

টাকার ব্যাগ অত্যন্ত হাল্কা। চন্দ্রাপীড় ব্যাগ হইতে একশো টাকার নোট বাহির করিলেন, "সম্বল আমার কম। জীবনের শেষদিন কয়েকটাও চলে যাবে না। যদি না চলে, ভিক্ষা করতে হবে। রাণীসাহেবার সঙ্গে আর দেখা করব না। এখানা আমি চলে গেলে ওঁকে দিও।" একমুহূর্ত পরে হাত বাড়াইয়া চন্দ্রাপীড় একটি রক্তগোলাপ লইলেন, "এটা ধরো। নোটের সঙ্গে ওঁকে দিও।"

মাথা নীচু করিলাম। "আপনার ঠিকানাটা, দাদা? কলকাতায় যেয়ে দেখা করব। "

"কি দরকার ভাই ? আমাকে তুমি হয়তো মঞ্চে দেখেছিলে রাজার বেশে। এখানে দেখলে রাণীসাহেবার শয্যায়। এইটুকুই আমার যথার্থ পরিচয় থাকলো তোমার কাছে। এটাই আমার সত্য অমিত, বাকী সব মিথ্যা।"

চন্দ্রাপীড়ের ভাড়াগাড়ী ডাকবাংলোর হাতা ছাড়াইয়া গেলে রাণীসাহেবার নিকটে গেলাম। নিজের কক্ষে খাটে বসিয়া নির্বিকার চিত্তে পান চিবাইতেছেন ও মধ্যে মধ্যে মেজের পিকদানীতে পিক ফেলিতেছেন। আয়া চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত।

রাত্রির আলোকে যাহাকে রহস্যময়ী মনে হইয়াছিল, দিনের প্রখরতায় চাহিয়া দেখিলাম সাধারণ রমণী, বিকৃত মুখখানি। আচারে-আচরণে কোন অসামান্যতা নাই। উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের ছাপ এখনও দেহের প্রতি অংশে, অঙ্গুলির প্রত্যেকটি প্রান্তে। বিগত জীবনে যিনি রূপসী, ভোগময়ী ছিলেন, পরিণতি বিয়োগান্ত।

নোটখানি হাতে লইয়া রাণীসাহেবা বিরস কণ্ঠে বলিলেন, "একবার দেখাও করলেন না! সামান্য একখানা একশো টাকার নোট না পাঠালেই হ'ত!"

"সঙ্গে তো গোলাপ আছে।"

"ও গোলাপ সবগুলোই তো উনিই কিনে এনেছিলেন। আবার ঘটা করে একটা পাঠাবার মানে কি ?"

দিনের আলোক অভিনেতাকে করিল মহৎ—আসল মানুষকে করিল দীন!

"ওঁর পক্ষে বেশী দেওয়া সম্ভব ছিল না।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পিক্ ফেলিয়া রাণীসাহেবা বলিয়া উঠিলেন, "সে তো বুঝতেই পারছি। ট্যাক যে গড়ের মাঠ তখনই সন্দেহ হয়েছিল। আসল চীজ এত দেখেছি যে, নকল রাজা-জমিদার দেখলেই চিনি।"

"আপনি ওঁকে চিনিতে পেরেছিলেন ?"

রাণীসাহেবা গালে হাত দিলেন, ও মা! ও ভান দেখে কে ভোলে ? তাছাড়া, আমি তো ওকে থিয়েটারে অভিনয় করতেই দেখেছিলাম। সে কথা বলিনি অবশ্য!"

কলিকাতার অখ্যাত গলিতে অন্ধকূপ গৃহে বোনের কৃপাদত্ত অন্নে বিগত-যৌবন অভিনেতা দিনযাপন করছে, এ কথা সেখানে পৌঁছবে না। কারণ, আমি অমিত সেন, সত্যই বদলে গেলাম। ব্যবসার বাইরের জগৎ আমাকে অবশেষে অনিবার্যরূপে টেনে নিল।

আমি তোমার ঠিকানা খুঁজে নেব, চন্দ্রাপীড় চৌধুরী। বেদনা ও ব্যর্থতার শৃঙ্খলে তুমি যে আমাকে বেঁধে ফেলেছ। এজীবনে আমার আর তোমাকে এড়াবার উপায় নেই।

কিন্তু, তোমার কাছে যাব না, চন্দ্রাপীড়। অর্থলিপ্সু স্থূল মনে আমার তোমার সূক্ষ্ম রসজ্ঞান প্রবেশ করেছে। জন্ম-অভিনেতা তুমি। বাস্তবের অকপট প্রকাশকে ভয় করো, মিথ্যা নিয়ে ব্যবসায় তোমার। তোমার দরিদ্র-জীবন তুমি আমার চোখের সামনে তুলতে চাও না। যে ভূমিকায় অভিনয় করেছ, সেটাই রেখে যেতে চাও।

আমার সঞ্চয় লোভী সংকীর্ণ, সাবধানী সত্তার উপহার যাবে তোমার কাছে—অজানা 'ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে'—অর্থের উপহার। চন্দ্রাপীড়, তুমি যে আমারি আজ থেকে।

দিনের পর দিন কেটে যাবে। হয়তো তুমি সেরে উঠবে, হয়তো উঠবে না। তোমার শেষ অভিনয়ের গৌরব-স্মৃতি তোমার সান্ত্বনা থাকবে।

কিন্তু, চন্দ্রাপীড়, অভিনেতার জীবনে তুমি সফল হওনি। দর্শক তোমাকে আর চায়নি। তাই, সুরার পাত্রে শেষ সঞ্চয় ব্যয় করে নাট্যমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছ। শেষ তোমার অভিনয় করে এলে—তোমার শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রাপীড়! তোমার সান্ত্বনা তোমারি থাক। আমি তোমাকে কখন বলব না। আমি তোমাকে কখন বলতে পারব না তোমার শেষ ও শ্রেষ্ঠ অভিনয় কতটা ব্যর্থ।

———

মাটির মূর্তি

মাধবী মিত্র ও তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্রী রঞ্জনা একসঙ্গে থাকতে পারে না। ঝাউগাছ মাথা হেলিয়ে বলে দিল, আমার চলে যাওয়াই মঙ্গল।

মাধবীদি বললেন, "এভাবে চলে যাচ্ছ, রঞ্জনা! আজ না গেলেই হ'ত না?"

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ—শাদা চুলে, কালো চুলে ঘেরা বেষ্টনী। রাণীর মত সেইমুখে অনেক রেখার দাগ আজ। সেই প্রশান্ত কপালে কয়েকটি আঁচড়। আমার মন বলল: না গেলে হত না। তোমার চরম পরাজয় তো আমি দেখতে পারব না। প্রকাশ্যে মাধবী মিত্রের ছাত্রী রঞ্জনা পালিত বলে উঠল, "না গেলেই নয়"।

কৃষ্ণচূড়ার গাছে অনেক ফুল—আগুন জ্বলে উঠেছে পাতার আগায় আগায়। মাধবীদি আনমনা চেয়ে রইলেন।

ফুলের গাছে আগুন, সূর্যের পরিমণ্ডলে কাল মেঘে আগুনের ভস্ম আর ধোঁয়া। আমার মনে? নৃশংস বসন্তের সর্বগ্রাসী আমন্ত্রণ। কেঁপে উঠলাম। বলে উঠলাম, "যেতেই হবে।"

মাধবী মিত্রের ছাত্রী ছিলাম। ছাত্রী জীবন শেষ হ'বার পরেও যোগ ছিল শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে। জ্ঞানদাত্রী হয়েছিলেন আত্মীয়া। চল্লিশের ঊর্ধ্বে তাঁকে আবার অতি কাছে থেকে দেখছি দীর্ঘদিন পরে।

মনে পড়ে গেল বিগত দিনের কৃতজ্ঞতার সমস্ত স্মৃতি। যেন আলনায় এলোমেলো রঙ্কিত পোষাক। একটায় টান পড়লেই একে একে খসে যায়।

মনে পড়ে গেল—অলস দিনে, দেহাতের তেঁতুল পাতা দোলানো বাতাসে মনে পড়ে গেল, মাধবীদি আমার কত করেছেন। শিক্ষা দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে আমার কিশোর জীবন উনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অযাচিত দাক্ষিণ্যে তাঁর অভ্যস্ত ছিলাম। প্রতিদানের কথা মনে আসেনি। তিনি যেন দিয়েই কৃতার্থ হতেন। আমি নিয়েই কেবল আমার পরম কর্তব্য করে গেছি। এতদিনের অলক্ষিত ঋণ তাই অবশেষে নির্মম হাত বাড়িয়েছিল। আবার নিতে এসেছি। এম-এ পরীক্ষার পরে রোগ ধরেছিল। জীবনে হয়তো

স্বাস্থ্য ফিরে পেতাম না। মধ্যবিত্ত সংসারে মাতৃহারা কন্যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়তো হত না। নিরানন্দ আমার গৃহে নিষ্কর্মা দিনযাপনের রুগ্ন গ্লানি থেকে মুক্ত বাতাসে ডেকে এনেছেন ইনি। যে যত্ন বিগতা জননী দিয়ে যেতে পারেন নি, সে যত্ন পাচ্ছি এরই কাছে। তিনি শুধু আমাকে শিক্ষা দেননি, তিনি যে আমাকে জীবনও দিলেন। তবু—শেষ পর্যন্ত আমাকে চলে আসতে হ'ল।

বসন্ত-বিহ্বল বনের প্রান্তে, ছোট টিলার ধারে, নীলাভ হ্রদের সীমায় আমার মৃত স্বাস্থ্য পুনর্জীবন লাভ করতে প্রস্তুত হ'ল। মাধবীদি'র দুই-একটি রেখাসঙ্কুল মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্রদের তীরে ঘাসে বসে সন্ধ্যার আকাশে চেয়ে ভাবলাম: তরুণীর জননী হ'বার বয়স অদ্যাপি অর্ধ-প্রৌঢ়ার আসেনি। তবু শিথিল-পেশী মুখের প্রতি রেখার মাধুর্যে তিনি যে স্নেহের কিরণ বিকীর্ণ করছেন, মাতৃস্নেহের মাধুরী ভিন্ন কি বলি? অনূঢ়া জননী তিনি—ভার্জিন মেরী। দ্বিতীয় খৃষ্টের প্রতীক্ষায় অতন্দ্রা।

মনে পড়ে গেল অতীত। অর্থ ও আভিজাত্যে বহুদৃষ্টিস্নাতা বিদুষী মাধবী মিত্রকে। অক্সফোর্ডি বিদ্যায় সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা, দীপ্তি ও খ্যাতিতে অনন্যা।

তারপর—? অতি পুরাতন সে কাহিনী। সমুদ্রের তরঙ্গ এল জীবনে। মাধবীর প্রসাধন মুছে গেল রাজনীতির ঘর্মক্ষরণে। বিচ্যুত হ'ল আভরণ জনসভার মঞ্চতলে। মিছিলের ভিড় অঙ্গে তুলে দিল—গৈরিক খদ্দর; পথের ধুলোর মিল ছিল সেখানে।

মহনীয়ার পরিবর্তন হয়েছিল অসাধারণ। সরকারী গণ্ডীর বাইরে মাধবী মিত্র ছিটকে পড়লেন। যাঁকে উদ্দেশ্য করে এত ত্যাগ, সেই প্রেমিক কারাবাসে বিনষ্ট হ'লেন।

অস্তরাগে রঙীন হ্রদের ধারে বসে একটি প্রশ্ন বারে বারে মনে ফিরে আসে। নিঃশব্দ উপস্থিতি মাধবীদির থাকে পাশেই—তর্জনী তোলা তাঁর: রঞ্জনা, তোমার সন্ধান আমাকে পীড়া দেবে কেবল। তুমি যে আমার সন্তানের মতই।

মনের অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। দেহাতী গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র খুলে নূতন জীবন গড়ে তুলেছেন মাধবীদি। দেশকে আবৃত করে এঁর জীবনপটে একদিন মানুষ জেগেছিল তাঁর প্রেম নিয়ে। ছাত্রীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহে

অধ্যাপনার দিনও ছিল তন্ময়। সেই আবেগ, সেই নিষ্ঠা নিয়ে প্রেমপাত্র—নিরপেক্ষ জীবন ইনি কি করে যাপন করছেন ?

আমার চরম শ্রদ্ধার পাত্রী, আমার পরম প্রেমাস্পদা কি জীবনকে অস্বীকার ক'রে অতীতের গুহা-তিমিরে মৃত প্রেমিকের অস্থি-সংগ্রহে ব্যস্ত ? তাই কি এমন স্বেচ্ছানির্বাসন ?

না, না। আপনি ব্যর্থ হতে পারবেন না। দেখুন চেয়ে হ্রদের বদ্ধ জলেও স্রোতের গতি। দেখুন, আমার মৃতপ্রায় যৌবনের উজ্জীবন। এখানে কিছুই মৃত থাকে না। শুধু কি আপনিই জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন ?

মুখে কিছু বলা হয় না—আমি যে ওঁর ছাত্রী. শুধু মনে হয়, সূচীর মত মন অনুপ্রবিষ্ট হোক ওই মনে। আমি খুঁজে পাই মাধবী মিত্রের অকথিত গোপনতা। এই নির্জন দেহাতী গ্রামে একলা পড়ে আছেন তিনি কেন ? ভালবাসার পাত্রী সম্পর্কে সজাগ মন মাধবীদি সম্পর্কে কিছু জ্ঞানী হ'ল অহরহ অনুধাবনে। মাধবীদি মৃত নন, তিনি প্রতীক্ষু। কিসের প্রতীক্ষায় সতর্ক তাঁর সত্তা ? দূরের লাইনে দ্রুত ট্রেন—তার দিকে চেয়ে কি ভাবেন মাধবীদি ? অথবা আমারি কল্পনার ভুল ?

বাড়ীর কোণে কোণে মাধবীদির প্রতীক্ষা—সন্ধ্যামণির সান্ধ্যরাগে, চাঁদের আকাশে হেলেশোওয়াতে। কে যেন আসছে, কে যেন আসতে পারে !

একদিন মাধবীদি জানালেন—"রঞ্জনা—কাল নীলাঞ্জন কর আসছেন এখানে। নাম শুনেছ কি ?"

ভাস্কর ও শিল্পী নীলাঞ্জনের নাম আমার জানা ছিল। মাধবীদির সঙ্গে তাঁর এত বন্ধুত্ব জানা ছিল না।

আকাশের চাঁদের ছায়া পড়েছে মাধবীদির ললাটে,—"এখানকার মাটি চমৎকার। মাটির মূর্তি পাথরের মত হয়ে যায়। যখনই মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার ইচ্ছা হয়, উনি এখানে চলে আসেন। ওঁর জন্যে একখানা ঘর বন্ধ রাখাই আছে।"

সেদিন অপরাহ্ণের ভ্রমণে আমাকে একাই যেতে হ'ল। মাধবীদি অভ্যর্থনার জন্য বাড়ী রইলেন।

হ্রদের জল আজও অস্তরাগে রঙীন—প্রত্যাবৃত-স্বাস্থ্য ক্ষীণ দেহ নিয়ে ওখানেই বসি। এই জলের দিকে চেয়েই তো আজ একমাস মাধবীদির ইতিহাস পড়তে চেয়েছি। আজ তো জলে নূতন স্রোতের চিহ্ন—দূর আবর্তের

ভেসে-আসা ফেনস্পর্শ। এঁরই প্রতীক্ষা তাহ'লে মাধবী মিত্রের জীবনে মৃত্যুর অধিকার বিক্ষুণ্ণ করেছে। মাধবী মিত্রের আঙিনার সন্ধ্যামণি, আকাশের চাঁদে তাহলে এঁরই পদচিহ্ন—এই যিনি আসছেন ?

আমার অনুসন্ধানী মন এতদিনে প্রশ্নের উত্তর পেল। নীরবতার হৃদয় থেকে আহৃত অনুভূতি বলে দিল মাধবী মিত্রের আবেগধর্মী মন বনালয়ে আশ্রয় গড়ে তুলেছে আবার একজনকে কেন্দ্র করে। ভালবাসার শক্তি ওই মনের অপরিসীম। প্রৌঢ়ত্বের সোপানে পা দিয়েও প্রেমশূন্য জীবন সে গ্রহণ করতে হয়তো পারে না।

আমার তো আনন্দ হ'ল—হওয়াই উচিত। মাধবীদি এতদিনে বিবাহ করবেন নিশ্চয়। এতক্ষণে নীলাঞ্জন এসে গেছেন—ওই যে ট্রেনের ধোঁয়া। দুইজনের দেখার সময়ে ইচ্ছা করেই বাইরে চলে এসেছি।

মাধবীর মাধবের মূর্তি ভেবে নিলাম—সৌম্য শান্ত প্রৌঢ়, বিশাল নয়নে শিল্পীর প্রতিভা, ভাবুকের গভীরতা। তাঁর মুখ করুণায় সুন্দর। ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, এবার বাড়ী ফিরি। সে বাড়ী এতক্ষণে মিলনের রাসমঞ্চ হয়েছে।

মাধবীদির ডাকে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তিনি। হঠাৎ আমার সমস্ত মনে চমক লাগল, সমস্ত ধারণা বদলে গেল। দীর্ঘ সবল শ্যাম দেহ। সঙ্কীর্ণ চোখে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—অজগরের। আশ্চর্য! কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। তাতে ক্ষতি কি ? কিন্তু, ইনি যে তরুণ যুবক—এই নীলাঞ্জন !

নীলাঞ্জন আমার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করলেন। সত্যই তাঁর দৃষ্টিতে সর্প-সম্মোহন।—"এ বুঝি সেই শান্ত মেয়ে, যার কথা তুমি লিখেছিলে, মাধবী ?"

মাধবীর মুখে আজও চাঁদের দাক্ষিণ্য, কিন্তু আমার অতিসন্ধানী দৃষ্টিও মধুর স্নেহ ভিন্ন সেখানে কিছু খুঁজে পেল না। তাহ'লে গুণমুগ্ধতা ও প্রীতি এ সম্পর্কের ভিত্তি ? আমার সংশয়ী মন আশ্বাস খুঁজে বেঁচে উঠল—নীলাঞ্জন মাধবীর বল্লভ নয়। ভুল করেছিলাম।

দীর্ঘ অজগরের মত দীর্ঘ দেহ তাঁর—জানিনা কি আছে তাঁর। আমি যে —আমি যে প্রথম দেখায়—। থাক, থাক। মাধবীদি বন্ধুও আমার শ্রদ্ধেয়।

স্রোতের বেগে দেহাতের সেই দিনগুলো ঝরা ফুলের মত একটি একটি করে খসে ভেসে যেতে লাগল। জ্ঞানী-বৃদ্ধ সোলোমনের 'সকল গানের গান'

বাজতে লাগল আমাদের এই দিনগুলির ভ্রমর গুঞ্জনে। ফুলের মত ফোটা দিন আমাদের। যাধার পূর্বরাগ-কামনা-ক্ষিন্ন-অবসন্ন-বসন্ত দরজার পাশে অযাচিত ফুল ফুটিয়ে গেল!

সারাদিন সে কাজ করত—নীলাঞ্জন। মাটি দিয়ে কাজ করত ইচ্ছামত। মাধবীদি প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে সেবার আয়োজনে নিযুক্ত থাকতেন। আমিও রইতাম তাঁরি সঙ্গে। অপরাহ্ণ একত্র ভ্রমণে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠত। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি।

হ্রদের পার এখন শ্যামল, এখন পুষ্পময়। এখন আকাশে বাতাসে অনেক প্রতিশ্রুতি। আমাদের তিনের জীবন চমৎকার একখানি ছন্দ মিলের কবিতা। মেরীর প্রত্যাশা সফল হয়েছে—ক্রাইষ্ট এসেছেন তাঁর ঘরে; দেবকীর বুকে কাল শিশু।

মনে প্রশ্ন ওঠে তবে কি প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য বড় নারীর জীবনে? তরুণ নীলাঞ্জনের সঙ্গে প্রৌঢ়া মাধবীর যোগসূত্র ওই তো গোপালের যশোদা ঐতিহ্যে। মাধবীদি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন নীলাঞ্জনের আগমনে। কিন্তু, তাকে প্রাত্যহিক যত্নে, আহার্য-রচনায় প্রতি মূহুর্তে যে ভাব ক্ষরিত হয় মাধবীদির, তা অবশ্যই মাতৃস্নেহ। যাঁর মুখগ্রন্থী বয়সের প্রণয়-আশ্লেষে শিথিল, যাঁর জীবন প্রেমের মৃত্যুভূমি, তিনি আর কি পেতে হাত বাড়াবেন? সংসার তাঁকে যা দেয়নি—সন্তান। তাঁর জীবন মৃত নয়। তাঁর প্রতীক্ষা স্নেহাস্পদের প্রতীক্ষা।

তাই পুরাতন ছাত্রী রঞ্জনাকে প্রীতি-নিগড়ে নূতন করে আজ বেঁধেছেন তিনি। তাই রঞ্জনার রুগ্ন অবসাদে নূতন করে আলো জেলেছেন তিনি। কৃতজ্ঞতা? তুচ্ছ—প্রতিদান। রঞ্জনার মাতৃহীন জীবন সে এই মহীয়সীর পায়ের নীচে বিছিয়ে দিতে পারে তাঁর পদক্ষেপের নিমিত্ত।

তিনি আমাকে এনে দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সুযোগ—জীবনে প্রথম অসামান্যের সাক্ষাৎ পেলাম। আমার জীবনে প্রথম পুরুষ সে।

দীর্ঘ চিত্রিত অজগর—মসৃণতা তার ধর্ম। কখনই যে উচ্চারিত উপস্থিতি নয়। তার শিকার-সংগ্রহ পর্যন্ত নিঃশব্দে—তার মৃত্যুগ্রাস তারই মত নীরব। পর্যটন তার সরল—মসৃণ দোলনে। কোথাও মৃত্যুর রুক্ষ কঠোরতা, উচ্চধ্বনি নেই। আফিম ফুলের সর্ব-নির্বাপিত সুপ্তি সর্পের বিষস্পর্শে। অজগর নীরবতা-ধর্মী।

সম্মোহন সেদিনও তার চোখে ছিল। আমার দৈনিক সাথী হ্রদের পাশে সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যে দুইটি চোখ, আমার বসনমুক্ত যেটুকু শরীর দৃশ্যমান, তাই দেখছিল সে চোখে আমি পেয়েছিলাম আফিমফুলের বিষ, গোলাপের মধু।

"তোমার মূর্তি গড়ব এবারে, কি বল শান্ত মেয়ে?"

প্রাণপণে আত্ম সংবরণ করে নিলাম। তার হাত দৃঢ়তায় লগ্ন হয়েছে আমার কাঁধের হাড়ের ওপর।

"আমার তো এখনও শরীর সারেনি। তাছাড়া, ঠিক মূর্তি গড়ার মত মডেল কি আমি?"

ধীরে ধীরে হাতখানা আরও দৃঢ়, আরও কঠোর হয়ে উঠেছে—"শিল্পীর ব্রত অপূর্ণকে পূর্ণ করে তোলা। যা সম্পূর্ণ, তা নিয়ে নিজের সৃজন-প্রতিভার গর্ব চলে না। সে হয় কপি বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র। আমি পূর্ণতা দেব। শিল্পী দিতে চায় নিজেকে বার বার। মাটি মূল্য পায়।"

আমার মুখ থেকে সেই দৃষ্টি নামল আমার এখনও মৃত-যৌবন দেহে—দেহের প্রতিটি চূড়ায় চূড়ায় ওই দৃষ্টির বিচরণ। নির্লজ্জ, বর্বর প্রার্থী। এই কি ঈশ্বরের সমকক্ষ সৃজন-দক্ষ শিল্পী?

বললাম, মাধবীদির একটা মূর্তি গড়ুন না। সে মূর্তি কখনও গলে যাবে না।

এবারে তার দুই হাত উঠে এলো আমার দেহ প্রাকারে, অলঙ্ঘ্য কিন্তু অনুচ্চারিত আদেশ সে হাতের। ভাস্করের হাত।—"মাধবীর অনেক মূর্তি গড়া হয়েছে। ওর সঙ্গে তো বহুদিনের যোগাযোগ। আমার গড়া সব মূর্তিই হাতের ছাপ পাথর করে রাখে।"

"আচ্ছা মাধবীদি তো আপনার চেয়ে অনেক বড়—তবু তো নাম ধরে ডাকেন?"

অবান্তর কথা বলে যেন কোন অনিবার্য মুহূর্তকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় আছি।

"আমি শিল্পী, বয়স আমার কাছে বাধা নয় কোন। মাধবী আমার সর্বপ্রধান আশ্রয়।"

"আশ্রয়?"

"হ্যাঁ। বাংলা দেশের শিল্পীর এমন একজন অনুগ্রহদাত্রী দরকার হয়। ও আমাকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করে।"

"উনি আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।"

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে—দূর ট্রেনের দিকে চেয়ে নীলাঞ্জন গভীর কণ্ঠে বলল, "ওর দেবার অনেক আছে। তাই নিতে হয়।"

"এইমাত্র বলছিলেন না শিল্পী দিতে চায়? তা'হলে শুধু নিতে চায় কেন?"—আমি ব্যগ্র প্রশ্ন করলাম।

"আমার দেওয়ার রূপ ফুটেছে আমার গড়া মাধবীর মূর্তিতে, আমার আঁকা ওর ছবিতে"।

"কি সে রূপ?"

"সে রূপ? সে রূপ—" উগ্র উত্তেজনায় নীলাঞ্জন সর্পের তির্যক ভঙ্গীতে মাথা তুললেন। "সে রূপ—আঙুর-লতাকে শক্ত আঙুলে পীড়ন করার মধ্যে পাবে—একমাঠ সোনালী শস্যকে কাস্তে দিয়ে কাটার মধ্যে পাবে। মাধবী মেয়েদের সেই রূপ। আমাকে দেখিয়েছে! চিরদিন তাকে ধন্যবাদ জানাই।"

শত-সহস্র শীতের দেশের পারে যে হিমার্ত পূবালী বায়ু বাস করে; যে বাতাসে গাছের ডাল রিক্ত, পাখী স্তব্ধ, সে বাতাস আমার বসন্ত নিথর—তুহিন করে দিল। যুগান্তের হিমানীর স্পর্শে যেন আপাদ-মস্তক কম্পিত হয়ে বললাম, "শুধু ওইটুকুর জন্য ধন্যবাদ! আর কিছু নয়? এত যে সাহায্য, টাকা—"

"সে আমি না নিলেও আর কেউ নিত—" লঘুস্বরে নীলাঞ্জন অনায়াসে বলল, "না, মাধবীকে সত্যি ভালবাস দেখছি। কিন্তু, এত মাধবীর কথা কেন? নিজের কথা কি কিছুই নেই?"

অতি আদরে তার স্বর বিগলিত, কিন্তু স্পর্শে রুক্ষ পর্বতের কাঠিন্য—দুই হাতের একাগ্র,—নিবিড় পীড়নে হঠাৎ আমার পূর্বার্ধ তৃণ-শয্যায় লুণ্ঠিত হ'ল।

"একি, একি!" আর্তনাদ করে উঠলাম।

"ভয় পেয়োনা। তোমাকে কি রূপে দেখব, তাই দেখছি মাত্র।" তীক্ষ্ণ-নির্মম দৃষ্টি আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হল—বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসায় সেই দৃষ্টি তখনি নির্লিপ্ত স্থির হয় গেল।

"সুন্দর! রঞ্জনা, তোমার হাড়গুলো বড় সুন্দর। মাংস না থাকায় তাদের রূপ আরও স্পষ্ট হয়েছে।"

আমার অঞ্চল আমার গায়ে ছিল না। কিন্তু, লজ্জা পেলাম না। আমার সম্মুখের পুরুষ তখন নিরপেক্ষ দর্শক, কঠোর বিজ্ঞানী। সে দৃষ্টিতে নারীর

জন্য আর কোন সম্মোহন লেখা নেই। মাথা নীচু হয়ে গেল পরাজয়! এযে এক মুহূর্তে আমার জগতের কত উর্ধ্বে চলে গেল। নিবিড় আলিঙ্গনেও এ অদৃশ্য। আস্তে উঠে বসে বিগতশ্রী, সামান্যশ্রী দেহকে আঁচলে ঢেকে বললাম, "এতক্ষণে মাধবীদির সত্তা শেষ হয়ে গেছে। বাড়ী চলুন ওঁর কাছে।"

আজ এই কাহিনী স্মৃতি মনে এনে দেয় দুঃসহ অপরাধবোধ, কিন্তু সেদিন এ ছিল আনন্দময়। শরীরের উন্নতিকল্পে বিছানায় যেতাম রাত্রি নয়টার মধ্যে। দীর্ঘ রাত্রি নীলাঞ্জনের ঘরে মাধবীদির গুঞ্জন চলত, এই সময়টাতেই দুই অসম বয়সের বন্ধু পরস্পরের সাহচর্য-সুখ লাভ করতেন। মাধবীদির শিক্ষাকেন্দ্র খুলে গিয়েছিল। ত্রয়ীর নিত্যকার ভ্রমণও ব্যাহত হয়েছিল।

আজও নীলাঞ্জনের পরদার আড়ালে বাহির দিকে চেয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। খয়েরী পরদার দোলন সে বাতিকে কখনও ঢেকে দেয় কখনও তুলে ধরে। লুকোচুরি খেলা খেলছে আমার চক্ষে বাতি আর পরদা।

একলব্যের কথা মনে পড়ে গেল। বালিশে রেখে মুখ রেখে ভাবতে লাগলাম। দ্রোণাচার্য একলব্যের আত্মীয় ছিলেন না, শিক্ষাচার্য। বর্তমান জগতে গুরুশিষ্যের অতি হৃদয়স্পর্শী, অতি অপরূপ সম্পর্ক নেই। কিন্তু, আমি তো একলব্যের মতই গুরু-দক্ষিণা দিতে চাই।

নীলাঞ্জন—আমার নীলাঞ্জনকে মাধবীদি কি এবারে ডেকে এনেছেন আমারি জন্য? না, প্রায়শঃ অতিথির এই এই আগমন আকস্মিক মাত্র? উনি কি চান নীলাঞ্জন আমারি হোক? আজ নীলাঞ্জনের ব্যবহারে ছিল আমার অস্বস্তি, কিন্তু, ভয় কি? মাধবীদি দেখছেন। বুঝতে পারি, অত্যন্ত সতর্ক তিনি নীলাঞ্জন ও আমার সম্পর্কে। সেটাই স্বাভাবিক। অনূঢ়ার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন।

চোখ আচ্ছন্ন করে এল তন্দ্রা, এল নিদ্রা, এল স্বপ্ন।

সমগ্র জীবন যার আবির্ভাবে উত্তেজিত, দেখলাম তাকেই। পাহাড়িয়া পথে ঝোপের ধারে—নীলাঞ্জন আর আমি। দেখলাম, দুইহাত তার হাত নয়—চিত্রিত অজগর। মনোহারী অজগরের লুব্ধ গ্রাস আমি। চীৎকার করে ডাকলাম, "মাধবীদি, কোথায় আপনি?"

স্বপ্ন ভেঙে গেছে। শয্যার সামনে দেহাতী ঝি ধরে দিল চা টোষ্ট, ডিম। আমি উঠতে আদিষ্ট হয়েছি বেলা করে। মাধবীদিই সংসার বাসুকীর মত মাথায় ধরে রেখেছেন।

ঝি-এর সঙ্গেই প্রায় হাজির হলেন মাধবীদি নিজে। সকালেই পোষাকের পারিপাট্য নিমন্ত্রণ বাটীর উপযুক্ত। অবশ্য, বাইরের লোক, শিল্পী অতিথি হওয়ায় তাঁর সজ্জার মধ্যে যত্ন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, আজ তাঁর শাড়ীতে জরির তারা বোনা, আমার কাটে তারুণ্যের জয়-নিশান উড়ছে।

'এখনও শুয়ে আছ তুমি?' আজ থেকে না নীলাঞ্জন তোমার মূর্তি গড়বে?"—মাধবীদির স্বর রুক্ষ।

বিছানায় উঠে ট্রে টেনে নিয়েছিলাম,—"কই আজকের কথা তো—?"

'যখন রাজী হয়েছ, তখন প্রস্তুত হয়ে ওঘরে যাও।" মাধবীদির স্বর তীব্রতর।

বুঝলাম। আস্তে জানালাম, "আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে রাজী হইনি। আর—আমার মূর্তি গড়ার মত কিছু তো নেই আমার।

মাধবীদির মুখ যেন জাগরণ-ম্লান, মুখের স্নিগ্ধ মাধুরী শুষ্ক-বৈশাখী ঝড়। নীলাঞ্জন ও আমার যোগাযোগে সজাগ ভীতি তো শিক্ষয়িত্রীর ধর্ম। মনে সঙ্কল্প করলাম: মূর্তি গড়া মূর্তিতেই শেষ হ'বে। মাধবীদির মনে ব্যথা দিয়ে প্রগল্‌ভতা আমি করব না।

"আপনি না বললে আমি যাব না, মাধবীদি।" বিছানা ছেড়ে আলনার দিকে গেলাম।

"আমি তোমাকে যেতে বলছি।"

অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দেহাতী ঝি চায়ের ট্রে ফেরৎ নিতে এসেছিল। ওকে বললাম, "নীলাঞ্জন বাবুকে খবর দাও আমি আসছি।"

ঝি যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে জানাল, "খবর দিতে হ'বে না। সাহেব নিজেই তো মাকে বল্লেন আপনাকে ডেকে দিতে।

তার পরের দিন শ্বাসরোধকারী দিন কতকগুলি। সারাদিন কেটে যেত শিল্পীর মডেল সেজে। মাধবীদি পরীক্ষার খাতা দেখতে ব্যস্ত ছিলেন, কথাবার্তাও কম হত।

প্রায় দুই মাস হয়ে গেল। বাড়ী ফিরবার রাগিণী ডাকছে। সেই নিরানন্দ নীলাঞ্জন-হীন দিন,—মাধবীর মাধুরী বর্জিত। রুগ্ন দেহ এখনও সবল হয়-নি। এই লাল মাটির ঢিপির নীচে, কাপাস গাছের ছায়ায় মনের সমাধি রচনা করে ফিরে যাব কি?

দুরাশার দিবস্বপ্নে বেজে ওঠে সানাই তরঙ্গে পিলু: এল, এল, এল! সাদা পট্টবস্ত্রে কে নেমে এল আমাদের পটল-ডাঙার বাড়ীর দরজায়? ময়ূরপঙ্খী-সাজানো ফুলের গাড়ী; গলায় ফুলের মালা, ললাটে চন্দন-লেখা। এই জনতার এখন সে আর আমার মধ্যে যোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন। লজ্জাবস্ত্রের নীচে অতি পরিচিতের আবার দেখা পেলাম। বাঙালী মেয়ের চিরদিনের স্বপ্ন।

অসম্ভব! রূপহীনা মধ্যবিত্ত দুহিতার এ স্বপ্ন ব্যর্থ। কিন্তু, আমার আশ্বাস, শিল্পী হয়তো সাধারণকে ভালবেসেছে। তাই, নিবিড় সহচর্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেও মাধবীদি বাধা দেন না। মাধবীদি ভাল না বুঝলে আমাকে কখনও মডেল হ'তে দিতেন না। আমার মাধবীদি আছেন। অঙ্কের মত দিনের হিসাব মিলিয়ে গেলাম কেবল। টুকরো—টুকরো—অঙ্ক। উত্তর ঠিক হ'ল কিনা দেখবার উপায় নেই।

শিল্পীর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্কল্প প্রয়োজন ছিল না। সে এখন নির্লিপ্ত বিজ্ঞানী। কাগজে অজস্র রেখায় আমার ছবি। মাটির মূর্তিরও কাঠামো তৈরি হয়েছে।

অজগরের সম্মোহন এখন দূর থেকে কেমন করে বলব, নির্লিপ্ততার অবকাশ দৃষ্টি তার চুম্বনের মত শক্তিধর? কেমন করে জানাব যে আলিঙ্গন না করেও নিবিড়তার আস্বাদ আনা যায় দেহ ভাঙ্গিতে? যেন তার দৃষ্টি শব-ব্যবচ্ছেদের ছুরি। আমার সংযত দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকটি অণু পরীক্ষা করে দেখছে। পূর্ণবসনা নারীর দেহ সে দৃষ্টির কাছে বিবসন। আমি কেমন করে কিছু বলব? আমার হাত যে কোথাও পড়ছে না! শুধু অনুভূতি।

তার পরের ইতিহাস এমন সযত্ন-সজ্জিত, লাল ফিতের বাঁধা ফুলের গোছা নয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, খণ্ড খণ্ড ঘটা। এই কাহিনীর সূত্রে তাদের গাঁথা শক্ত, শুধু তাদের অনিবার্য পরিণতি, সমষ্টিগত ঐক্যের কথা বলা চলে।

অনিবার গতিতে যে বন্যা এল, যে ঝড় মাথার ওপরের আশ্রয় উড়িয়ে নিল, তার কথা বলা চলে। স্রোতের নীচে যে ধারা কাজ করেছে, যে মেঘে আকাশে ঝড় গতি সঞ্চয় করেছে, সে কথা অবান্তর।

সত্যই আকাশে মেঘ জমেছিল। কালবৈশাখী। এতদিন পরে সে রাত্রির কথা মনে পড়ে যথার্থ ভাবে।

মনে পড়ে, একদিন মাধবীদি আমাকে কি একটা কথা বলতে যেয়ে চুপ

করেছিলেন হঠাৎ। হয়তো তিনি বলতে আরম্ভ করতেন নীলাঞ্জন বিষয়ে গূঢ় কোন কথা। আবেগ তপ্ত ছিল সেদিন মুহূর্তটি। আমার মন কোন কারণে কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করে উঠেছিল। কিন্তু কেন মাধবীদির বলা হ'লনা সে কথা, আজ মনে নেই আর। অশুভ ইঙ্গিতে একটা যেন থেমে গিয়েছিল।

মাটির মূর্তি প্রায় শেষ হয়ে এল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি চলে যাব। বাবার চিঠি এসেছে। তার তার আগে-কি জেনে যাব না সে কি চায়?

দরজায় আস্তে টোকা পড়ল। জানালার কাছে সরে গেলাম। হাত পা কাঁপতে লাগল! আবার পূবালী ঝড় শীত নিয়ে এসেছে। শিক চেপে ধরে দাঁড়ালাম।

এতক্ষণ বিনিদ্র শয্যা যার স্মৃতি-তপ্ত, এত আলোচনা-মনের যাকে নিয়ে, গভীর রাত্রে সে—ই এসেছে।

"দরজা খোল। কথা আছে। দিনের বেলায় সুযোগ থাকে না।"

মাধবীদির দৃষ্টির প্রহরায় শিল্পীর মডেলের সঙ্গে শিল্পীর গোপনীয় কথা চলে না। মাধবীদি শিক্ষা-কেন্দ্রে আবার ছুটি দিয়েছেন। অবশ্য শিল্পীর চোখের দৃষ্টির ওপর প্রহরা ছিল না। সে যা জানাবার জানিয়েছে।

মুখে শুনতে পাবার লোভে ঘরে আনলাম তাকে। দীর্ঘ বাহুবেষ্টনে দৃঢ় বক্ষে সে—আমাকে গ্রহণ করল।

জোর করে ছাড়িয়ে নিলাম। মাধবীদির অনুচ্চারি[illegible] াদেশে নিজেকে পরিচালনা করতে হ'বে আমার।

"এত রাত্রে কেন?"

"কি হয়েছে?"

"কুমারী মেয়ের ঘরে আসার এটাই কি সময়?"

"শিল্পী নিয়মের উর্ধ্বে"।

"আমি তো শিল্পী নই।"

"তুমি আরও বড়—শিল্পীর মানসী"।

অবশেষে সেই কথা এল, যা আমার মনের চরম কামনা। কিন্তু, কাব্যিক কথায় বাস্তবের মিল পাওয়া দায়। চুপ করে রইলেন।

চেয়ার থাকতেও বিছানায় বসল সে—, "দিনে কাজের ভিড়ে কথা-বার্তা বিশেষ হয়না—। তাই রাত্রে এসেছি। "জানো তো, শেষ রাত ছাড়া আমার

ঘুম আসেনা। মূর্তি তো শেষ হয়ে এল। এধারে চলে যাচ্ছ শুনছি। মূর্তিকরকে কিছু দেবার নেই ?"

সাধারণ কথা। গৃহস্থ প্রেমিকের মত সহজ উক্তি। ভয় কেটে গেল। এতো শিল্পী অসাধারণ বাক্যবিন্যাস নয়। গভীর রাত্রে নিরালা উপস্থিতিও স্বাভাবিক মনে হল।

সহজ গলায় উত্তর দিলাম। তার অস্তিত্ব আমার এখন এই খাটিয়ার মত, ওই লেবু গাছটার মত অনেক বেশী চেনা অস্তিত্ব। তাকে আমার ভয় নেই। আমার ভয় নেই। আমার বিশ্বাস আছে, আমার আশা আছে। উত্তর দিলাম, "দিলেই কি নিতে পারবেন ?"

"আমার কিছু নিতেই বাধা নেই, রঞ্জনা। যত পাই ততই লাভ"।

তাড়াতাড়ি অবচেতনের নির্দেশে অন্য কথা তুললাম, "আমার মূর্তির কি নাম দেবেন ?"

"নাম কাল রাত্রে এই সময়ে তোমাকে বলে যাব।"

"সে কি ? না, না। আর এভাবে কাল আসবেন না।"

"রোজ আসব। তোমার ভবিষ্যৎ আমার হাতে এখন।"

আবার সাধারণ মানুষ শিল্পীর জটিলতায় ফিরে গেল। আমি পীড়িত হয়ে উঠলাম। সামান্যের স্বাধীন সত্তার ওপর অসামান্যের পীড়ন। এ সহ্য হয়না।

বললাম, "এখন আপনার নিজের ঘ'র যাওয়াই ভাল।"

"ভয় পেয়ো না। চকিতে আমার দেহ তার কালগত হ'ল। আমার ভীত—অনিচ্ছুক অধরে বন্যার মত নেমে এল চুম্বন।

আমার সর্বতো সমর্পণ সে চুম্বনের নীচে। আমি বাধা দেবার যোগ্যতা হারালাম।

নীলাঞ্জন চকিতে আবার দূরে সরে গেল, "আজ যাই। কাল রাত্রে আসর এমনি সময়ে। কাল তুমি না বলতে পারবে না।"।

"কিন্তু,—কিন্তু—"

"আমার ওপরে সব ভার—ছেড়ে দাও।" শেষ কথার আশ্বাসে আমার ভীরু চিত্ত শান্ত করে সে সহজ মসৃণতায় অদৃশ্য হল। এত কাছে যে এল, এত নীরবে, তার মসৃণ পেলব গতি সাপের গতি। তবু তাকেই আমার চাই। হয়তো তার মধ্যে মৃত্যু আছে, তবু তার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই।

বলব, মাধবীদিকে বলব এই বর্ষাব্যাকুল রাতের কাহিনী? আমার দিক থেকে সামান্য গোপনতাও যেন না হয়। কিন্তু, ও'তো আমার ভার নেবে। ও—ই নিশ্চয় বলবে।

তবু, ওর কাছ থেকে আরও একটু শুনতে চাই। দরজা খুলে বা'র হয়ে এলাম দ্রুতগামীর পেছনে। কলাগাছের চওড়া পাতায় দুলছে বর্ষার জল। টুপ টুপ ক'রে বাড়ীর হাতায় পাতাবাহারে জল ঝরছে। বড় অন্ধকার।

সেই অন্ধকার বিদীর্ণ করে কার হাতে উগ্র বিজলী হাত-বাতি জ্বলে উঠল? মর্মভেদী স্বরে শোনা গেল, "কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"দূরে নয়। বর্ষার রূপ দেখতে।" একটি হাত আর একজনের পিঠে উঠে এল। তারা পা-টিপে-টিপে চলতে লাগল। টর্চের আলো নিভে গেলেও চিনতে ভুল হ'লনা।

নীলাঞ্জন কর ও মাধবী মিত্র আমাকে বোকা ভেবেছিলেন। আমি বোকা নই, অসাবধান। একচক্ষু-হরিণের মত সম্ভাব্য দিকে চেয়ে থাকি, ব্যতিক্রম আমার লক্ষ্যে আসেনা—। আমার জীবনের অনভিজ্ঞ সারল্য—সেই দিনই শেষ হ'ল।

অনেক দিনের অনেক অঙ্ক মিলিয়ে এবারে যে উত্তর পেয়েছি, মাধবী মিত্রের সেই টুকুই কাহিনী।

দেশ-প্রেমের স্রোত রেখে গেল নীরস কর্কশ ভূমি। নিঃসঙ্গা মাধবীর আত্মসমর্পণে উৎসুককে মন খুঁজে পেল আধার। প্রায় বেকার শিল্পী নীলাঞ্জন। সাধারণ মানুষ মাধবী মিত্র, অনন্যা হলেও শিল্পী নন তিনি। সাধারণ তাঁর ছাত্রী রঞ্জনা। একজন তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীকে মনে করে নিল অসামান্য। তার নাটুকেপনাকে তারা প্রতিভা বলে ভুল করল—দারুণ অসংযমকে স্বর্গীয় প্যাশন বলে শিহরিত হ'ল।

টাকা ছিল মাধবীর আশ্রয় পেল শিল্পী। মাসিক অর্থ সাহায্য প্রেমের পরিবর্তে। নগরের পথে পথে এমন শিল্পী ঘুরে বেড়ায়। ক্ষুধিত দৃষ্টি তাদের। আধো অন্ধকারে অশুভ ছায়ার মত গলিতে গলিতে তারা ফেরে, মাটি চায়। সে মাটি দিয়ে ইচ্ছমত মূর্তি গড়বে তারা। মাধবী নিঃশেষে তলিয়ে গেলেন।

বয়সে বহু ছোট, তাতেই বা কি? অসাধারণের জন্য কি সাধারণ লৌকিক প্রথা? বিবাহ-বিরোধী নীলাঞ্জন। সমাজ ও নীতির বাইরে চলে এলেন মাধবী।

বুঝলাম নীলাঞ্জনকে আমার উদ্দেশে ডাকা হয়নি। রুগ্না রূপহীনা

ছাত্রীকে নীলাঞ্জনের দৃষ্টিযোগ্য মাধবী মনে করেন-নি। না হলে, রঞ্জনা ও নীলাঞ্জনের দেখা হ'তনা। নীলাঞ্জনের আসাও আকস্মিক—তিন মাসের মধ্যে আসবার কথা ছিল না। সে কাশ্মীরে ছিল।

মাধবী মিত্রের প্রহরা অনূঢ়া কন্যার দায়িত্বভাবে নয়, প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বের পূর্বাভাষ। নীলাঞ্জনের নূতন শিকার তাঁর সন্তান প্রতিমা ছাত্রী কিনা, সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে না পারলেও তিনি সতর্ক হয়েছিলেন। শিক্ষা-কেন্দ্রে ছুটি দিয়ে প্রহরী ছিলেন। তবে নীলাঞ্জন যে তাঁর চেয়েও সতর্ক। ধরার বাইরে তার লক্ষ্যভেদ।

মাধবীর সম্পূর্ণ পরাজয় সেদিন সকালের চটুল প্রসাধনে। রঞ্জনার মূর্তিগড়া ভাল লাগেনি তাঁর; নীলাঞ্জনের মূর্তি গড়ার সঙ্গে তাঁর যে প্রচুর পরিচয় আছে। কিন্তু নীলাঞ্জনকে বাধা দেবার সাহস ছিল না। লোভনীয়া করে তোলার প্রয়াস ছিল। জানি না কতবার নীরবে মাধবী মিত্রকে এমনি দীনতা স্বীকার করতে হয়েছে। কতবার মরুভূমির বালি জলবিন্দুকে এমনি নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।

যে মুখ বয়সের তাপে শিথিল হয়ে গেছে সে মুখে প্রণয়ের উগ্রভাব বিকাশ সম্ভব হ'তনা। প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়মে সে মুখে জননী-সুলভ ভাব লিখে গেছেন সময়ের ধর্মে। তাই রঞ্জনা প্রেমের আত্মসমর্পণকে জননীর স্নেহ বলে ভুল করেছিল।

আজন্ম নাগরিকার অভিজাত্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন এই দেহাতী গ্রামের অখ্যাত নির্জনতায়। সকলের কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন তিনি এই নিষিদ্ধ প্রেম—প্রৌঢ়ার উন্মাদ প্রেম যৌবনের প্রতি। নীলাঞ্জন এখানেই আসত। রঞ্জনাকে প্রেম-অন্ধ করে দেবার পূর্বে মাধবীর প্রত্যাক্ষা সে দেখেছিল। অনেক ছোটখাটো কথা অনেক হাল্কা দৃশ্য একসঙ্গে গেঁথে তুলে মুহূর্তেই সত্যকে পেলাম।

আজ রাত্রে ওদের কোন সতর্কতা প্রয়োজন ছিল না যে। কোন দৃষ্টিকে এড়াতে যেয়ে সহজে বন্ধুত্বের অভিনয় করে যেতে হয়নি। মাধবীর পিঠে হাতখানা নীলাঞ্জনের তাই রাত্রির নির্জনে বড়বেশী মালিকানা প্রকাশ করে ফেলেছিল। দুই অসম বয়সের বন্ধুর মধ্যে এ ধরণের অন্তরঙ্গতা অবশ্য আগেও রঞ্জনা দেখেছে। কিন্তু আজ আলিঙ্গনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, ওই হাতের সব কিছু জানা আছে—ওই হাত অধিকারী।

মাধবীর শিথিল দেহভঙ্গীতেও স্বীকৃতি—সমর্পণ অধিকারীর কাছে। বহুদিনের বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় প্রকাশ প্রয়োজন হয় না, তারা পরস্পরকে পেতে অভ্যস্ত। তাদের দেখে প্রেমিক-প্রেমিকা বলে বোঝা শক্ত হয়। রঞ্জনা বুঝেছিল, তার সন্দেহমুক্ত চোখে এই দুইটি লোকের জটিল সম্পর্ক বন্ধুর সহজতা বলেই মনে হয়েছিল।

কিন্তু আর? স্বতঃসিদ্ধ আলিঙ্গন, মাধবীর নীলাঞ্চলের কাছে দাঁড়ানোর ভঙ্গী—সব কিছুই বলে দিল অভ্যাস, বহুদিনের অভ্যাস। মাধবীর ওঘরে খিল দেবার আগেই বোঝা গিয়েছিল।

এরা জীবনের চোরা-বালিতে এত তলিয়ে গেছে যে এদের টেনে তোলা অসম্ভব। ঈশ্বর জন্মলগ্নে দুইটি নিষ্পাপ আত্মা দিয়েছিলেন যাদের, তারা সে আত্মা হারিয়েছে।

কিন্তু আমি? পরকীয়া প্রমত্ত, সস্তা পোটোকে কেন মন দিলাম? কেন ওর ল্যাম্পট্যকে ভালবাসা বলে ভুল করলাম? কেন, কেন না জেনে আমার মাতৃসমার অধিকারে হাত বাড়ালাম? আমি, যে একলব্যের মত গুরুদক্ষিণা দিতে চেয়েছিলাম, সে অত ঋণের কি এই প্রতিদান দিল?

আমার ভুল গুরুতর, আমার পাপ আরও বেশী। মনে মনে যাঁকে মা ডেকেছি, তাঁর অবৈধ প্রণয়ীও আমার কাছে পিতার মত নমস্য। না জেনে অপরাধ করলেও পাপ তাতে যায় না। বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ দুঃখের নায়ক অয়দিপউস (Aedipus) যাকে তিনি না জেনে স্ত্রী করেছিলেন। অজানিত অপরাধেও তিনি দেবতাদের কাছ থেকে ক্ষমা পাননি। বাংলার শ্যামল-সুকোমল মৃত্তিকায় আমার পাপের প্রতিরূপ পাইনা। আমার অপরাধ ওই অয়দিপউসের অপরাধ।

আমি কাল সকালেই পালিয়ে যাব। কাল রাত্রে সে আসবে। এই বিভীষিকা থেকে পালিয়ে বাঁচব। প্রেম, তুমি আমার জীবনে কেন এত পাপ, এত বীভৎসতা নিয়ে এলে? প্রেম, তুমি আমার মন চাওনা শুধু। তুমি আমার আত্মাকে চির-অভিশপ্ত করতে চাও।

অনিদ্রার পরে জিনিসপত্র গুছিয়ে বেলায় ঘরের বার হলাম। আমার আজই চলে যাবার কথা। মাধবীর চোখে এতদিনে জ্বালা নিভে গেল। মূর্তি গড়ার দিন থেকে জ্বালা দেখেছি।

গলার তীব্রতা আমার স্নেহমধুর চেনাসুরে ফিরে গেল। আজ সব কিছুর অর্থ বুঝলাম।

যিনি আমাকে সত্য বলবার শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর কাছে মাথা নামিয়ে মিথ্যা বললাম, "রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বাবার অসুখ। আমাকে যেতেই হবে।"

সকাল থেকে বৃষ্টি রাত্রির জের টেনে চলেছে। ঝড় উঠেছে। মাধবীদি আপত্তি করলেন। কিন্তু, সে আপত্তি ভদ্রতা মাত্র। তাঁর অনুভূতি তাঁকে বলে দিতে চাইছিল: রঞ্জনা আর তোমার ছাত্রী নয়।

তিনি ভয় করছেন আমাকে। যার জীবন তাঁরি দান, তাকেও তাঁর ভয়! মাধবী মিত্রের এত বড় পরাজয় তাঁর ছাত্রী তো দেখতে পারবে না।

শিল্পীর পরদা-ঘেরা ঘরের দিকে তাকালাম। সে আমার ঘৃণার্হ—তবু একবার যাবার আগে তাকে দেখে যাই।

আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে মাধবীদি জানালেন, 'নীলাঞ্জন ভোরে উঠে শিকারে গেছে পাশের গ্রামে। ঘোড়ায় চড়ে গেছে, ফিরবে বিকালবেলার মধ্যেই। ঝড়-বৃষ্টি দেখে নিষেধ করেছিলাম, শোনেনি। আগেই ঠিক ছিল কিনা। তুমি চলে যাবে জানলে ওকে ধরে রাখতাম।"

কিন্তু, আমার চলে যাওয়া কি অতই সহজ? ষ্টেশন থেকে ফিরতে হল। ঝড়-বৃষ্টি গাড়ীকে লাইনচ্যুত করেছে।

সেই প্রবল ঝড় মানুষের আর্তনাদের মত ঘরের-চালে আঘাত করতে লাগল। যেন সে আরব্য কাহিনীর জিন, মুক্তি চায়। সেই বৃষ্টি সারা পৃথিবীতে আবার প্রলয় ডেকে আনল। প্রলয়-পয়োধি-জলে কোন্ কেশব তাকে ধারণ করবেন?

সন্ধ্যার পরে বিছানায় চলে গেলাম। মাধবীদি আলো নিয়ে প্রতীক্ষায় রইলেন। অশ্বের খুরের শব্দ কই শোনা তো যায় না? সে ঝড়-বৃষ্টিতে বাধা পেয়েছে, মাধবীর তবু পথ চাওয়ার শেষ নেই।

মনে ভাবলাম: সস্তা নাটকের সস্তা নায়ক শিকারে গেছে ঘোড়ায় চেপে—সবটাই নাটুকেপনা। সুলভ পরিচিত কোন নাটকের ছক। শিল্পী প্রেমের ভান করে জমি তৈরী রেখেছে। আদিম হী-ম্যানের বেশে পুরুষ এবার গ্রহণ করবে নারীকে। শিকারী বাইরে সারাদিন থাকবে, তার মনের ভাব গোপন থাকবে মাধবীর কাছে। রক্তমাখা হাতে জীব-হত্যার শেষে সে ফিরে আসবে

অন্ত শিকারের সন্ধানে। কল্কি-অবতারের মত ঘোড়ায় চেপে সে আসছে ধ্বংসের আশায়।

সে আসছে, তার ঘোড়া এগিয়ে আসছে ঝড়-বৃষ্টি বিদীর্ণ করে। পৃথিবীর বুকের মধ্যে বিদ্ধ আছে যে নিষিদ্ধ অপবিত্র পাপের মোহ, পাকা ফলের মত দু'হাতে তুলে আনছে সে। ইভ, এবার আদমই তোমাকে লোভ দেখাবে। ওই ফলের স্বাদে স্বর্গ থেকে নির্বাসন, তবুও কি লোভনীয়!

পৃথিবীর চেয়ে পুরনো পাপের উত্তরাধিকার। সে আসছে—আমার দরজায় সে কালপুরুষ আসছে। ওই বুঝি অশ্ব খুরধ্বনি শোনা যায়!

আদিম পাপের মত আদিম সাহারা বালির সোনায় খুরের দাগ, ক্লান্ত অশ্বের হ্রেষাধ্বনি মরুভূমির খিন্ন-ল্যু-এর বাতাসে। যে রুক্ষ-কর্কশ খেজুর ফলেছিল, সেওতো শুকিয়ে গেছে। সাহারায় পিপাসা পায়ে পায়ে হাঁটে—আগুনজ্বলা, হাঁফধরা বাতাসে চোখে মরুজ্বালা; কণ্ঠে মরু-তৃষ্ণা। জ্বলন্ত মরুভূমি—সেখানে মানুষের পাপ চলে আসছে উল্কার বেগে। ঘোড়ার পায়ে আগুনের চক্‌মকি, বালুতে—নালে।

আমার মূর্তির নাম আজ বলে দেবে—'রিক্তা' একমাত্র নাম হতে পারে। হারিয়ে গেলাম মানুষের ওপরে বিশ্বাসকে। মাধবীর বিচার আমি করব না। তাঁর কোন পাপ আমার বিচারযোগ্য নয়। কিন্তু, নিজেকে কি করে ক্ষমা করব? না-জানা অপরাধও তো পাপ।

সাহারা পেরিয়ে উঠল কলির ঝড়, আর জলের আভাস নেই সে ঝড়ে, সে শুকিয়ে বালি হয়ে গেছে। তার মধ্যে বাতাসের আর্তনাদ, হু-হু করে আসছে ঘোড়া। চক্রধারী পুরুষোত্তম তুমি আমাকে বাঁচাও।

সমগ্র মরুভূমি ঢেকে গেল জলে। প্রলয়-পয়োধি-জলে কেশব দেখা দিলেন সাহারা মরুতে। ঘোড়ার খুর ডুবে গেল।

সারারাত্রির বিনিদ্রা মাধবীর কাছে এল প্রিয়ের জুতোজোড়া শুধু। অন্ধকার সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটে আসছিল বর্ষার জল কেটে। চোরাপাঁক গিলে খেয়ে ফেলেছে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারকে। নরম পাঁক,তলায় তার রাক্ষস স্রোত হাঁ করে লুকিয়ে থাকে। যে মাটিতে মূর্তি গড়ে নীলাঞ্জন খেলা করেছে এতদিন, সে মাটি শেষ মুহূর্তে তাকে আশ্রয় দিল না। অন্ধকারের রাজ্যে সমস্ত ডুবে গেল।

ফিরে এলাম। মাধবীদির কাছে তো আমি অবিশ্বাসী হইনি। আমার অপরাধে ছিল অজ্ঞানতার কুয়াশা। কেন নিজেকে ক্ষমা করব না?

কিন্তু সমস্ত মন মথিত করে সন্দেহ জাগে। সেদিন রাত্রে যে ঘোড়ার খুরের শব্দে কান পেতে ছিলাম, সে চাওয়ার মধ্যে কি শুধু আশঙ্কা ছিল? যদি সে আসত, চিত্রিত অজগর, তাকে কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারতাম? সব জেনেও মাধবীদির কন্যাসমা ছাত্রী কি ঘৃণার বস্তুকে ঘৃণা করে সরিয়ে দিতে সক্ষম হত! পৃথিবীর ওপরে বিশ্বাস হারিয়েছি—নিজের ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে বাঁচা চলে না।

অনেক দূরের দেশে সে কোথায় যে আছে পঙ্ক-সমুদ্রে অর্ধ-প্রোথিত হয়ে অর্ধ-নিমজ্জিত হয়ে কর্দম মিশ্র জলস্রোতে? গভীর রাত্রে আমার সুপ্তির কানে ধাতব স্বরের অমানুষিক ভাণ শুনি, তীব্র হাসি দেখি। সে বলে : সত্যই কি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতে তুমি?

প্রায় সমাপ্ত মাটির মূর্তি সেখানেই পড়ে আছে, পড়ে আছে সেখানে আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখ—ঘৃণার্হকে ভালবাসার বেদনা, ভালবাসার পাত্রীকে ঘৃণা করার বেদনা।

জীবন, আর তো আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। তুমি বড় ভয়ঙ্কর, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

———

তুহিন-ক্রান্তি

তুষার-জর্জর কক্ষে আবর্তিত হয় ব্যর্থ পৃথিবী। সাগরের পথ পায় না হিমানীবদ্ধ নির্ঝর। ধারা-তারল্যে যুগসঞ্চিত তুষার কবে নেমে আসবে?

মানুষ তার জন্মগত অধিকার পাবে—জীবনের অধিকার।

(মৃত্যুর পদধ্বনি)

সারা পৃথিবী তোলপাড় ক'রে বৃষ্টি নেমেছে সেদিন। বৃষ্টি-কুয়াশা-মথিত স্বপ্নের দেশ দার্জিলিং।

কার্ট রোডের অনেক নীচে স্যানিটেরিয়াম। বাইরের জগৎ ধুয়ে গেছে ধারাপাতে। শ্যামলীর মুখে বিশদ গুণ্ঠন, ফগের স্ফটিক আচ্ছাদন। বিগত তিনদিনের বর্ষাবিহ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিং বিষাদ-স্তিমিত মৌনতার আড়ালে ধ্যান করছে মহাকালের। পাহাড় যেন উদ্যত-তর্জনী কাল-পুরুষের। নিঃসীম খাদের গহ্বরে গোপন রহস্য সৃষ্টির আদিযুগ থেকে গুপ্ত রয়ে গেল। গুপ্ত রয়ে গেল পাতা ঝরাবার অলঙ্ঘ্য-কাঠিন্যের ইতিহাস। পৃথিবী নূতন জন্ম যদি নেয় গোলাপগুচ্ছে, তরুপল্লবে; তবে কেন মৃত্যুর অধিকারে সমাপ্তি নামে না? পুরাতন পাতার, মুমূর্ষু কুসুমের ব্যর্থবিলাপে বনশ্রী পায়ে পায়ে অশ্রু ঝরায়। বিন্দু বিন্দু জীবন ক্ষরিত হয় ধ্বংসের বিষগুহায়।

তবু, দূরে পাইনবনে বাতাস মর্মর তোলে। আকাশে ওঠে জ্যোতিঃ-কলাপী চন্দ্র। বনে বনে জাগে রতি স্বপ্ন। অশোক-কিংশুকের তীরে ভরে ওঠে অদৃশ্য তূণীর। হিমানী দ্রবীভূত হয় সলিলসাগরে। পাতায় পাতায় সেখানে জীবনের মহোৎসব।

বর্ষাকাতর দিনে তবু শৈবাল বেশ করছে। বর্ষাতি-বিলুপ্ত অবস্থায় আজ সে যাবেই বাইরে। বর্ষায় ভেজা তো পাহাড়িয়া মৃত্যু! সাবধানী মন যুক্তির অবতারণা করল।

স্যানিটেরিয়ামের জলযোগ তৃপ্ত করে না স্বাস্থ্যকামীর নূতন বুভুক্ষা। কার্ট রোডে উঠলেই বাঙালীর মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার। পরিধি-বৃহৎ আহার্যে তৃপ্ত হওয়া যাবে। চা অবশ্য ওখানে ভাল নয়। সুতরাং যেতে হবে ম্যাকেঞ্জি রোডে মাসীর ননদের বাড়ী।

সত্যই কি স্কুল উদ্দেশে যাওয়া? তবু, কোটের সুতোয় গাঁথা হ'ল বটনহোল্ গোলাপ! হয়তো, এমন দিনে সুজাতা বার হয় নি।

শৈবালের অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাহীন শূন্যতা। পাঠ্যজীবন শেষ হয়ে গেছে। এখন কি করা যায়? কি পাওয়া যায়? কাকে নিয়ে এ দিনের রচনা হবে?

ম্যালেরিয়া সেরে গেলেও সম্পন্ন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এল দীর্ঘ পাহাড়-পরিক্রমায়। পরিক্রমা কিন্তু লক্ষ্যে নিয়ে যায় না।

কার্টরোডে উঠে এল শৈবাল চড়াই-উৎরাই করে। কে বলবে এপ্রিলের প্রকৃতি? স্যানিটেরিয়ামের পাতাল এমন সর্বরিক্ত বেশ দেখাতে সক্ষম হয়নি।

আজ সাবধান, আজ বড় সাবধান। একপা দূরের রাস্তা দেখা যায় না কুগে। দূরের ষ্টেশন থেকে বেজে উঠল বাঁশী। মন উদাস হয়ে যায়! ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা করে সীমাহীন অনির্দেশে।

পদস্খলন হ'তে হ'তে বেঁচে গেল শৈবাল। কার্টরোড থেকে নীচু হয়ে নেমেছে একটি পথ, স্যানিটেরিয়াম থেকে উঠে এসেছে বুক দিয়ে। তারই মোড়ে একজনের উপস্থিতির অতি কাছে এসে শৈবাল থমকে দাঁড়াল—"দুঃখিত!"

ঝরনার মত এক টুকরো হাসি ভেসে এল, "আমিও দুঃখিত।"

"সুজাতা! এমন দিনে বেরিয়েছ যে বড়?"

"সে কথা আমিওতো প্রশ্ন করতে পারি, শৈবাল?"

"আমি তোমাদের বাড়ীই যাচ্ছিলাম।"

কুগে-ঢাকা মূর্তি সুজাতার অতিকাছে স্পষ্ট হ'ল। সবুজ একটি কোটে সাদা শাড়ী ঢাকা—মুখে গোলাপের দ্যুতি।

মুগ্ধ শৈবালের সেদিন মনে হয়েছিল সবুজ পাতায় ঢাকা গোলাপ একটি। কিম্বা শৈবালবেষ্টিত রক্তোৎপল।

"চল, আমিও যাব।" শৈবালের স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব মনোহারী হ'ল। আহারাদির অবান্তর যুক্তির প্রয়োজন মিটল। কৃতার্থ শৈবাল চলল সুজাতার পাশে।

"তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে, সুজাতা?"

"এই একটু বেড়াতে। বিশেষ কোন জায়গায় না।" সুজাতা দ্রুত

কথাটা শেষ করে মোড় ঘোরাল; "তুমি এম এ-র পর কি করবে, ঠিক করেছ, শৈবাল?"

পুরনো ব্যথায় হাত পড়ল। জীবনের ধূ ধূ শূন্য রূপ। হতাশার একটা প্রতিক্রিয়া চাপল্য। শৈবাল সহজ হাস্যে বলে দিল "কি আর করব? বাঙালীর শেষ করণীয়—বিবাহ করে ফেলব হয়তো।"

সুজাতা গাছের গোলাপ ম্লান করে হেসে উঠল। একটু দূরত্ব রাখা, একটু গম্ভীর সুজাতা নয় যেন।

সাহসী শৈবাল উল্টে প্রশ্ন করল, "আর তুমি? তুমি বিয়ে করছ না কেন, সুজাতা?"

ডালিম-রংএর কাচের মালা সুজাতার গলায়, দার্জিলিংএর পাথর। সরে গেছে শ্যাওলা। ডালিমে জমেছে জল—মেঘের জল। মেঘ-গলানো সরিৎ পুঞ্জ-পুঞ্জ জমেছে চুলের কাল-মুকুটে, কাঁধের শাড়ীর পাড়ে, জামার আস্তিনে। দীর্ঘদেহীর পটভূমিকায় সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস। পায়ের বাদামী জুতোর হিলে উঁচু পথ বিক্ষত। একপাশে খাদে কুয়াশা জমেছে ঘন ধোঁয়ার মত। ঝরে-পড়া পাতা সলিলবিদ্ধ হয়ে পথেই প্রসারিত। আজ সে আঁকাবাঁকা রাস্তা জনশূন্য। কার্টরোড থেকে উঁচু জমিতে উঠবার কচ্ছপের মত গড়ানো-পিঠ পথ।

সুজাতার মুখ ফেরান ছিল খাদের দিকে। ধীরে ধীরে বলল সে, "কেন করছি না, বলা চলে না।"

"তাহলে, আমি ঘটকালি করি, কেমন? বেকারকে পছন্দ হয়?"

এবারে মুখ ফিরল, "শৈবাল, ভুলে যেওনা আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়।"

"সেটা কোন বাধা নয়।"

চুপ করে পথে চলল সুজাতা। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে তার। একটু এগিয়ে গেল চড়াই পথে। শৈবাল গতি বাড়াল।

বীতরাগার মুখের দিকে সভয়ে চেয়ে অগত্যা মামুলী কথার অবতারণা করতে হ'ল,—"এত তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথ ধরলে কেন, সুজাতা? একটু বেড়িয়ে গেলে হ'ত না? দু'দিন পরে যদি আজ বার হাওয়া গেল।"

"আমি রোজই বার হয়েছি, শৈবাল। বেড়াবার দরকার নেই আমার।

"এ-কি, এই বাদলায়? সুজাতা, কাল যে কুকুরও রাস্তায় বেরোতে পারেনি। নিউমোনিয়া হয়ে মরতে চাও নাকি?"

"আমার কখনো কিছু হয় না, শৈবাল।" বাড়ীর রাস্তার শেষ মোড়ে বাঁক নিল সুজাতা।

"ওকি, জল কেন চোখে? কি হ'ল।"

আরক্ত কপোলে সুজাতার কয়েক-বিন্দু অশ্রু। চোখের জল ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জীকৃত সলিল-সঞ্চয়ে সামঞ্জস্য রেখেছে। মুখ সরিয়ে নিল সুজাতা।

"ও কিছু না। হঠাৎ চোখটা জ্বালা করে উঠল! এসো, শৈবাল।"

অনেকদিন তারপর দুর্জ্ঞেয়াকে খুঁজে ধরবার চেষ্টায় শৈবালের দার্জিলিং-এর আকাশে নেমেছে মেঘ। অনেকদিন আকাশ প্রবালবর্ণ হয়ে উঠেছে একটু মনোরক্তিমার স্পর্শে।

নালিশ করেছে শৈবাল মাসীর ননদকে, "সুজাতা আমার চেয়ে সামান্য একটু বড়। অথচ দেখুন না সব সময় আমাকে ভয় দেখায়, যেন উনি কতই বৃহৎ।"

মাসীর ননদ বললেন, "আমার মেয়েটা ওইরকম। কেমন সর্বদা গুমট ভাব। যেন ওর কিছুতে আনন্দ নেই।"

সম্মুখে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা এত কথার উদ্দেশে যে, আপাত দৃষ্টিতে অতি সৌখীন কুমারী—চুলের কায়দায়, পোষাকের বিন্যাসে সে যুগধর্মের প্রতীক। মুখে কিন্তু নির্লিপ্ত সুদূরতা। শৈবাল ভেবে দেখল, সত্যি যেন ওর কিছুতে আনন্দ নেই।

বিকালবেলা বাড়ী থাকে না, কারুর সঙ্গে অথচ যাবে না কোথাও। যত কেন না ঘুমে পিকনিক, বাতাসিয়া ল্যাপে পদচারণ, বার্চহিলে অশ্বধাবন—প্রস্তাব কর, সুজাতা কোন না কোন অজুহাতে যোগ দেবে না। কিন্তু, বাড়ীর কোণেও বসে থাকার মেয়ে নয়। বেড়িয়ে যেত নিজের মনে। কারুর সঙ্গে যোগরক্ষণে তার একান্ত অনিচ্ছা।

হাসে, গল্প করে, একেবারে পাথর নয়। তবু আছে কোথাও ঘনীভূত হিমানী! ঝরনার জলও সেখানে জমাট-বাঁধা তুহিনিকা।

মাসীর ননদ দুঃখ করেন, "পড়তে গেল এম-বি। কি না, ডাক্তার হবে। দিল ছেড়ে পরীক্ষা না দিয়ে। কত বলি বিলেত যা, কিছু শিখে আয়। তা মেয়ের কানে যায় না।"

শৈবাল মুচকে হেসে বলেছিল, "সংসারী করে দিন না কেন?" অপাঙ্গে তাকিয়ে হেসেছিল।

"ক্ষমা দাও, বাবা। কাজ নেই আমার। একবার বিয়ে ঠিক করে খুব শিক্ষা হয়েছে।" মাসীর ননদ চুপ করে গেলেন। অকথিত উক্তিতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার ইঙ্গিতে শৈবালও কুটে মরতে লাগল নৈশব্দের ভারে। স্থিরভাবে সুজাতা কেক্ কেটে পরিবেশন করল। ফল ছাড়িয়ে দিল। কানের পাশ, কপোলের সীমায় একটুও রং লাগল না।

শৈবাল চায়ের শেষে প্রস্তাব করল, "আজ একটু গল্প করা যাক, এসো।" সুজাতা ধীরে বলল, "মাথা ধরেছে, খোলা বাতাসে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"চলো, আমিও যাচ্ছি।" শৈবাল বেরিয়ে এল।

"না, না। তুমি থাকো, তুমি থাকো। এক্ষুণি ঘুরে আসছি আমি।" অনুনয়স্বরে মানা।

"বারে যদি বলি বেড়াতে চল, তখনও মাথা ধরে। যদি বলি ঘরে বোস, তখনও মাথা ধরে। কারণ কি?"

"শৈবাল, একঘণ্টা সময়। ফিরে আসছি আমি। কারুর সঙ্গে আমার হাঁটতে ভাল লাগে না ঠিক এই সময়টা। সকালে তো যাই একসঙ্গে।"

"আমি সঙ্গে থাকলে আপত্তি কি?"

মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, "মেমসাহেব হয়েছেন। একা চলফেরায় বাহাদুরি। বোস এখানে। রোজ রোজ বিকেলবেলা ভূতের মত একা ঘোরা হ'বে না। শৈবাল এসেছে গল্প করতে। বেচারী একা বিদেশে আছে। কালও বৌদি চিঠি দিয়েছেন, ওকে দেখাশোনার কথা বলে।"

বসে পড়ল সুজাতা কথা না বাড়িয়ে। ছটফট করতে লাগল। ঘড়ির কাঁটা যেন বুকে ঘা মারছে ওর।

শৈবাল উঠে পড়ল, "আমি চললাম। বিষণ্ণ গম্ভীর তার মূর্তির দিকে চেয়ে সুজাতা বলল, চল শৈবাল, তোমার স্যানিটেরিয়াম পর্যন্ত না হয় যাচ্ছি।"

স্যানিটেরিয়ামে পৌঁছে আর রাখা গেল না তাকে। হাতে-বাঁধা ঘড়ির দিকে চেয়ে সুজাতা ব্যাকুল হয়ে বিদায় চাইল। নখরচর্চিত ম্লান গৌর হাতে বাঁধা ঘড়ির কাঁটা কেন সুজাতাকে নির্দেশ পাঠায়? অধরে হয়তো রঞ্জনীরাগ আছে একটু। এত স্বাভাবিক বোঝা যায় না। অধরও ম্লান গোলাপী। সব কিছুই ম্লান সুজাতার। হাল্কা নীলাভ শাড়ী অতি গৌরবর্ণের কাছে মলিন হয়ে গেছে! চোখে পড়ার মত উচ্চ কিছুই নেই

তার দেহে, তার ব্যক্তিতে। এই যে হাতখানা—ফ্যাকাশে রং-এর রূপোলী ঘড়ি—প্ল্যাটিনামে হীরার আংটি। মনে মনে শৈবাল বলল—

"Pale hands. I loved, beside the river Shalimar—And paler throt".

পাণ্ডু গৌরকণ্ঠে একসারি রূপোলী মুক্তা যে এত উদাসীন, সে কেন নিজেকে এত শোভন করে তোলে?

সুজাতা চলে গেল। নীচে নেমে এল শৈবাল। ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না তার। দিনটি পরিষ্কার ছিল। স্যানি-টেরিয়ামের মাঠে তরুণেরা ব্যাড্‌মিণ্টন খেলছে। ডাকল ওরা শৈবালকে। যোগ দিতে পারল না শৈবাল। লাইব্রেরীর ভুটিয়া লাইব্রেরিয়ানের কাছে একটা বই চেয়ে নিল। ঘরে পড়া যাবে।

তখন আলো জলে উঠেছে অর্ধেক রাস্তা উঠলেই কার্টরোড। আবার যাবে নাকি শৈবাল? মাসীর ননদ বই চেয়েছিলেন। নিয়ম না থাকলেও দিয়ে আসবে?

উঠে এল কার্টরোডে। পাগলামি জেনেও এগিয়ে চল্ল সুজাতার বাড়ীর দিকে। একটু এগিয়ে কিন্তু বিস্মিত হ'তে হল।

আস্তে আস্তে নীচের রাস্তা বেয়ে উঠে আসছে সুজাতা। মাথাটা নীচু, তাই বোধহয় দেখতে পায়নি শৈবালকে। কাছে এসে হঠাৎ মুখ তুলে সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"একি সুজাতা, তাড়াতাড়ি চলে এসে এখানে বেড়াচ্ছ? আশ্চর্য।"

"না, আমার মাথাধরা ছাড়ল না। তাই একটু আশেপাশে ঘুরে বাড়ী যাচ্ছি।"

"আমাকে বললে না কেন?"

"তা হ'লে তুমি আসতে চাইতে সঙ্গে। আমার এ সময়ে একা বেড়ানো দরকার। বোঝ না কেন?"

শৈবাল ভাল করে কথাটা বুঝবার আগেই সুজাতা লঘু-চঞ্চল কণ্ঠে বলল, "তুমি যে রোজ বাতাসিয়া ল্যুপে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাও, এখন চল না। আজ ভারি আনন্দ লাগছে।"

জল্‌জলে মুখ সুজাতার, ম্লান কপোলে আবার ফুটেছে। একটু আগের ম্লান সুজাতা যেন অন্য লোক ছিল সম্পূর্ণ। নীলাভশাড়ীর নীলিমাও যেন

গাঢ়তর হয়েছে দীপ্তিময়ী সুজাতাকে ঘিরে। পাণ্ডু কণ্ঠতটে যৌবনসুলভ শোণিতোচ্ছ্বাস।

শৈবাল চেয়ে রইল, উদাসিনীর পরিবর্তনে। "থাক, সুজাতা, রাত হয়ে গেছে। চল, একটু আগিয়ে দিই।"

বাধ্য-মেয়ের মত সঙ্গে চলল সুজাতা। পাহাড়ের শ্যামলতার মধ্যে মধ্যে বিজলী বাতি। শ্যামলে অগ্নিশিখা। চেয়ে চেয়ে বলে উঠল সুজাতা, "কি সুন্দর! দেখ শৈবাল, মানুষের জীবন এই আলোর মত। জ্বলে ওঠে, চারিদিকে বন্ধুরা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যখনি নিভে যেতে নেয়, নিভে যায় সকলে। ভগবান জীবন দিয়ে কত আনন্দ দিতে পারেন!"

চকিতে শৈবাল ফিরে তাকাল, "সুজাতা সত্যি করে বলতো তুমি কি এসময়ে নির্জনে কোন মন্ত্রতন্ত্র বা ধ্যানের অভ্যাসে যাও? তোমার কি ও বাতিক আছে?"

"ধ্যানই বটে। বাজে কথা ছাড়ো, শৈবাল। কতদিন আর আছো এখানে?"

"তুমি কতদিন আছ আর?"

"আমার ঠিক নেই। দারোয়ান আর নানী পুরনো। অনেক সময় একাই থাকি।"

"সুজাতা, তোমার কি কোন অসুখ আছে?" শৈবাল আবার রহস্যার্ণবে ডুব দেবার চেষ্টা করল।

"না, না। আমার কোন অসুখ নেই।" সুজাতা চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, "অসুখ যেন কারুর না হয়।"

চারপাশে মালার মত তারাহারা দার্জিলিং। পথের দুধারে দীর্ঘ গাছের সারি। সব নির্বাক হয়ে আছে গভীর মৌনতায়। তাদের মতই রহস্যনীরব সুজাতা।

আকাশে-বাতাসে বেজে ওঠে বহু পুরাতন, চির-নূতন সঙ্গীত। শুধু আনন্দ নয়, বেদনাও উপজীব্য।

পাহাড়ের বুকে পর্বতদুহিতা পার্বতীর দেখা মিলেছে, মেলেনি শুধু প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর। দিন থেমে থাকে না। অনন্তকালকে স্তব্ধ হ'তে আদেশ দিলেও অপ্রতিহত গতি সে। গোলাপ-ঝরানো দিনে ঝরে যায় জীবনের সঞ্চয়। এগিয়ে আসে যাবার দিন। মৃত্যুর পদধ্বনি।

অহরহ অনুধাবনে সূক্ষ্ম-মনন সুজাতা সম্পর্কে তথ্যে উপনীত হ'ল। বিকাল-বেলা সুজাতা বার হয় নিছক খেয়ালে নয়, পরিকল্পিত বিহারে। আসে সুজাতা স্যানিটেরিয়ামের কাছে কোন জায়গায় নিশ্চয়। অন্বেষণশীল চক্ষুকে এড়িয়ে লঘুচারিণীর নিত্য ভ্রমণ। ধরা যায় না। পাহাড় প্রতারক। এক লক্ষ্যে উন্নীত হবার শত পথ পেতে রেখেছে, এক কেন্দ্রভ্রষ্ট মাকড়সা জালের প্রথায়। পথে প্রহরা তাই ব্যর্থ। ঘুরে ঘুরে বেড়ালেও কদাচিৎ দেখা হয় সুজাতার সঙ্গে। সতর্কা সুজাতা।

অনেকদিনের চেষ্টায় পরে দেখা হল। সকালের আসরে আজ উজ্জ্বলা ছিল সুজাতা। এখন হয়েছে মলিনা। নিভে যাওয়া তারা। পাণ্ডুবর্ণ কলিমালিপ্ত, ক্ষীণ কপোল ভেঙ্গে গেছে। চোখ বিগতজীবন, পদক্ষেপে হতাশা।

চমকে গেল শৈবাল, "কি হয়েছে, সুজাতা ?"

"কি আবার হবে ?" বিরক্তিবিকৃত স্বরে সুজাতা উত্তর দিল।

"শরীর খারাপ নাকি ?"

"না, শৈবাল, না। বলেছি তো আমার অসুখ করে না।"

"আজ একটু বেড়াবে, সুজাতা ? চলনা, নীচে ভিক্টোরিয়া ফলসের ধারে বসিগে।" সুজাতার দ্বিধাবিরক্তিজড়িত কণ্ঠের "না" শুনবার পূর্বেই শৈবাল অনুনয়ে ভেঙে পড়ল, 'চলোনা, সুজাতা। আজ একটু এক সঙ্গে বেড়াই। আমার যে চলে যাওয়ার দিন এসে গেল।

আজ বৃষ্টি নেই। আজ শুধু কুয়াশা। আজ ঝরনার জল হিমানীমণ্ডিত নয়, করুণায় বিগলিত।

পাথরে বসেছে উভয়ে। কিন্তু পাথরেই তো ফুল ফোটে, জমে ওঠে শৈবাল। আজ আকাশে নীলাভ মেঘ। আজ বাতাসে শ্রুতি-সুখকর রাগিণী।

"সুজাতা, একটা কথা বলব ? সাহস দাও ?"

ক্লান্তস্বরে উত্তর এল, "সাহসের অভাব দেখছি কোথায় ?"

"শোন, সুজাতা, রোজ বিকালবেলায় তুমি আস একই দিকে। প্রত্যহ। কারুর সঙ্গে দেখা কর নাকি ?"

কাল হয়ে ওঠে সুজাতার শ্রান্তমুখ, "এ কথা বলছ কেন ?" চমকে উঠল সুজাতার দুই চোখ, "মা কিছু বলেছেন ?"

"না, না। আমারি অনুমান।"

"ও, অনুমান?" মধুর হাসি নিশ্চিততার আভাস দিয়ে গেল। ঝরনা একটু স্তব্ধ হয়েছিল, আবার নূপুর-নৃত্যে অগ্রসর হ'ল উপলখণ্ডের গায়ে।

শৈবাল কিন্তু অধৈর্য আজ—"তুমি একা আস কেন? বল, কাকে দেখা দিতে আস?"

উঠে দাঁড়িয়েছে সুজাতা—ভয়ানক দেখাচ্ছে ক্রুদ্ধ মুখ তার, দুই চোখে মেডুসার অগ্নিদহন—"ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে একটা কথা আছে। তুমি অনধিকার অনুসন্ধান কোরনা।"

পাথর সুজাতার পায়ে আর্তনাদ করে উঠল। চলে যাওয়া পায়ে পায়ে। ঝরনা আবার নিশ্চল হয়ে গেল।

"যেওনা সুজাতা, রাগ করে। আজ যে আমার জানতেই হ'বে। কতদিন ধরে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সুজাতা, সব সাধনারই তো সিদ্ধি আছে?"

"নেই, নেইই সব সাধনায় সিদ্ধি নেই। জানোনা তুমি? মৃত্যুর সাধনায় জীবনের সিদ্ধি নেই। সিদ্ধি নেই।" পলাতকার পলায়ন ব্যাহত হল পাথরে পদাহত হয়ে। চোখের জলে ঝাপ্সা হয়েছিল সুজাতার ক্রুদ্ধ চোখ। জলে মিশে গেল সেই জল। ঝরনার জল সাগ্রহে পান করে নিল কুমারীর অকথিত কোন বেদনার অশ্রুক্ষরণ। এমন একবিন্দু অশ্রু বহুদিন পায়নি উপোসিত নির্ঝর। এমন অশ্রুপ্রবাহে সে তো ভেসে যেত, ডুবিয়ে দিত শুকনো পাথর, সমুদ্রকে পেত সে মুহূর্তে।

ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্রের সীমিত নির্দেশ শৈবাল; ছুটে এল তারই পাশে, নির্ঝরের ধারায় যার শোকাশ্রু মিশে যাচ্ছে। ক্ষণপূর্বের বিভীষিকা মেডুসা ক্রন্দনশীলা নায়োবীতে প্রস্তরীভূতা গেছে।

"কি হল, সুজাতা? বলো, না বুঝে কোথায় ব্যথা দিলাম? ক্ষমা করো আমাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করব না আর।"

শৈবালের দৃঢ়বাহু বেষ্টন করেছে ক্ষীণ কটী। শৈবালের আকর্ষণে জীবনের উত্তপ্ত হৃৎস্পন্দনের তালে তালে প্রস্তরীভূতা নায়োবী একটু করে চলে আসছে প্রাণের মহোৎসবে। ঝরনা এতক্ষণে নিশ্চলতা ত্যাগ করে বয়ে চলল। শোকার্তা কুয়াশা আস্তে গলে পড়ল ঝরঝর করে পুঞ্জ-পুঞ্জ সরিৎকণায়। জমে গেল অশ্রু চোখের পাতায়।

"সুজাতা, কতদিন ধরে ভালবেসেছি। তোমার গোপন জানতে চাইনা

আর। কিন্তু একটুও কি আশা নেই আমার? বল, কি করলে তোমার যোগ্য হবো?"

সারা বনে মিনতি মাখা। আকাশের ধূসর কুহেলি নীলমেঘের ছায়া মুছে ফেলেছে। কুয়াশা অলক্ষিতে জমে উঠেছে পাইনবনের সবুজ পাতায়। স্তব্ধ পার্বতী প্রকৃতি। ধ্যান-সাধনার শেষে দেখা দেবে বুঝি শৈলেশ্বর। উমার কর্ণে দোদুল কর্ণিকাকুণ্ডল, উমার হাতে শুষ্ক পদ্মবীজের মালা। যেখানে জপমাল্যেই ধৃতি। তাই উমাপঞ্চতপা পার্বতী। মৃত্যুঞ্জয়ী যে নীলকণ্ঠ, পার্বতীর সিদ্ধি সেখানে। বৈভবের, ভোগের আসুর বীর্যে বিমুখী সাধিকা। মুখ তার জীবনের দিক থেকে ফেরানো।

সরে গেল চকিতে সুজাতা। শৈবালের উষ্ণ নিঃশ্বাস শীতল—গত জীবন, সাদা গোলাপে একটু রক্তরাগ আনল না। বহুদিনের পার্বত্য প্রকৃতি—দেখেছে "কুমারসম্ভবের" লীলা। রতিপতি পঞ্চশরের তূণীরে ঘুমিয়েছে অশোক, কিংশুক। শৈলেশ্বরের ধ্যান ভেঙেছিল। উমার ধ্যান ভাঙল না।

"শৈবাল, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ভুলে যাও কেন?"

"বয়সে বড়র গর্ব কবে যাবে, সুজাতা। তুমি—তুমি কি অদ্ভুত রক্ষণশীল!"

"আমার মন রক্ষণশীল। সব কিছুই রক্ষা করে চলা আমার মনের ধর্ম!"

"তাহলে, এখানে, এখানে এই মাটি ছুঁয়ে শপথ করলাম, একদিন তুমি আমার কাছে আসবে। আমার ভালবাসা ছেলেখেলা নয়। তাকেও রক্ষা করবে তোমার মন।"

সুজাতা চলার পথে নেমে এল—"শৈবাল, সাধারণ মানুষ আমি। একটার বেশী রাখার ক্ষমতা আমার নেই মনের।"

লাফিয়ে এল শৈবাল, চলমানার পাশে। হিংস্র দীপ্তি চোখের তারার। বনের মর্ম থেকে জাগরিত হ'ল উগ্র সিংহের আত্মা আধুনিক যুবকের রোমান্স-মথিত সত্তায়।

"তাহলে? তাহলে, বলো তোমার প্রেমিক আছে অন্য? উদাসীনতা তোমার ভান মাত্র। শালিমার তীরের পাণ্ডু করতলে সবলে বজ্রমুঠিতে পেষণ করে ধরল শৈবাল, তোমাকে যেতে দেব না।"

"ছাড়, শৈবাল। সে তোমার জগতের জীব নয়। আমার সাধনা মৃত্যুর সাধনা।"

হাত স্খলিত হয়ে পড়ল আপনা থেকে। কি বলছে সুজাতা? ঘনীভূত

কুয়াশার পথ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পাহাড় জেগে উঠেছে ভীষণতা নিয়ে। নীচে, অনেক নীচে নির্ঝর, হয়তো সে-ও শীলিভূত। এ কি কথা? শবাচারী কাপালিক কি দীক্ষা দিয়েছে কুমারী সুজাতাকে?

কুমারসম্ভবের রমণীয় প্রকৃতি সহসা বামাচারীর সাধনভূমি হয়ে উঠেছে। উঠেছে। অদৃশ্য গুহা মুখবিস্তার করেছে পাহাড়ের ফাটলে। ভয়, ভয়! ভীতির বাষ্প পথের গোলাপগুচ্ছ আবৃত করে দিল। পাইনের মাথায় মাথায় সবুজ পাতা ঝলসে উঠল। কালো হয়ে গেল সারা বন। "সুজাতা, তুমি কি কোন পারলৌকিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে? ও কিন্তু ভুল পথ। এ যুগে তুমি পাগলামি করছ না কি?"

"কিছুই করছি না। নিশ্চিন্ত হও, শৈবাল। আমাকে বুঝতে চেয়োনা শৈবাল। আমাকে বুঝতে চেয়োনা শুধু। আমার যা গোপন, আমারি থাক।

আর্তনাদ করে উঠতে লাগল পাকদণ্ডির পথ ফেরার গতিপথে। মৃত্যু গুঞ্জনে পূরিয়া বেজে উঠল বিদেশী কবিতা উচ্চারণের তালে তালে।

"Come lovely and soothing death
Undulate round the world,
serenely arriving, arriving,
In the day, in the night to all, to earth,
Sooner or later delicate death".

পাকদণ্ডির পথে অগ্রগামিনীর পেছনে উঠতে লাগল নিঃশব্দ শৈবাল শৈল-শিখরে। স্তব্ধ প্রকৃতি, মৌন হিমালয়। মৃত্যুর নির্বাক উপস্থিতি পাথরের প্রান্তে। যেখানে জীবনের অন্ত, সেখানেই মৃত্যুর পদক্ষেপ।

ফার্ণ গাছের চিকিমিকি পাতা আতঙ্কে মর্মর ভুলে গেল। পাইন গাছের ডালে সঙ্গীত বেজে উঠল—শবযাত্রার একঘেয়েমী বিলাপন। নিষেধের তর্জনী প্রতিহত করে রাখল কৌতূহল। রহস্য পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল আশঙ্কা।

আশঙ্কিত বনবীথি। সুন্দরের সাধনাবিস্মৃতা উমা কি শরণ নিয়েছে ধ্বংস দেবতার দেহলী সীমান্তে? আতঙ্ক পায়ে পায়ে জেগে উঠতে লাগল। হিমালয় পাথর হয়ে গেছে। শ্যামলিমা ধূসরে কবলিত।

উঠে চলেছে সুজাতা পাহাড়ের সমুচ্চতা লঙ্ঘন করে। তার পদধ্বনি শুনছে নতশীর্ষ শৈবাল। পথ শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে থাকবার দিন। ঝরে যায় জীবনের ব্যাকুল সঞ্চয়।

জানেনি শৈবাল মৃত্যুর পদধ্বনি।

(সমাপ্তিতে)

দিন চলে যায়। ক্ষুরধার গতি তার। শৈলশিখরের সঙ্গীত সমতলভূমিতে কারুর বা সারা জীবন ধরে বাজে।

যা পায়না, মন তাই চায়। বাহুর বাইরে যে ঈপ্সিতা, তাকেই খুঁজে বেড়ায় শূন্য বাহু সকলেই ভুলতে পারে না।

কেউ কেউ ভুলতে পারে না। তাই লেখা হয় 'ভিটামৃতা', গড়া হয় তাজমহল।

জৈবিক ধর্ম অনেক সময় সোজা পথে চলে না। স্বাভাবিককে অতিক্রম ব্যতিক্রম। শৈবালকে দেখে অনেকে অনেক চিন্তিত হ'লেন।

বহুদিন চলে গেল। রৌদ্রপ্রসন্ন সমতল কিন্তু বৃষ্টি কুয়াশাবৃত পাহাড়কে মুছে দিতে পারলনা। রহস্যাবৃত কাহিনীর একটি অক্ষরও পড়া যায়নি। তবু, নৈরাশ্য পরাস্ত করেনা কালজয়ী প্রেমকে।

অনেক দিন বয়ে যায়। এল বিজয় একদিন, শৈবালের মাসতুতো ভাই। "আমার সঙ্গে চল। দেখে এস নিজের চোখে। অযথা তুমি জীবনটা নষ্ট করছ, শৈবাল।"

"আমি যাবোনা। ওকেই আসতে হ'বে আমার কাছে।" শৈবাল নিজের কাজ দেখছিল। কর্মক্ষেত্রে এখন সে অবতীর্ণ।

"তোমার পাগলামি দেখে মা পাঠিয়ে দিলেন পুরুলিয়া থেকে। দিব্যি বিয়ে-থা করে সংসারী হ'বে, না বয়সে বড় এক মেয়ের জন্য চিরকুমার থাকার পণ নিয়েছে। যা পাবার নয়, তার আশা কেউ রাখেনা।"

"পাবার নয়, জোর করে বোলনা, বিজয়দা।"

"তার বর্তমান অবস্থাটা দেখলেই বুঝবে কেন বলছি।"

"কি, কি হয়েছে সুজাতার ?"

"আজ বিকেলে নিয়ে যাব। কেউ জানেনা ও এত কাছে আছে। আমি কিছু বলবনা, শুধু দেখাব।"

রিজেন্ট পার্ক ছেড়ে নামল কাঁচাপথে গাড়ী। গোড়ের খালের ধারে থামল। ছোট গলা। "এবারে নেমে আয়, শৈবাল। আর গাড়ী চলবে না।"

কাঁচা মেঠো পথে চলছে শৈবাল। শৈল-শিখরের সৌন্দর্যস্বপ্নের পরে এমন ছন্দপতন ?

"এমন জায়গায় থাকে সুজাতা। কেন?"

"নিরিবিলি আত্মগোপন করেছে একা। এখানে ওদের একটা বাড়ী তো ছিলই। শিবের মন্দির সঙ্গে ছিল। তাই পূজারী একজন বারোমাসই থাকতেন। মালীও ছিল। এখন সুজাতা এখানে থাকায় আরও লোকজন এসেছে। দার্জিলিং-এর বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। সে দারোয়ানও এখানে আছে।"

দুই পাশে ছোট নূতন বাড়ী দুই-একটা। কুঁড়ে ঘর, মাটির ঘর বেশীর ভাগ। ছোট ছেলেমেয়ে লাফালাফি করছে। সারমেয় শয়নে আছে। মার্জার-মহিষীর নিশ্চিন্ত আলস্য। ঢেঁকিঘর, মাছের জাল। নিছক গ্রাম্য পরিবেশ।

পথে আবার চলা। শৈলদুহিতার সন্ধানে শৈলভ্রমণ নয়। গঙ্গা ছোট হয়ে নিজেকে গুটিয়ে পথ চলেছেন। মাটির মায়ায় শিখরবাসিনী মর্তের ছোট গঙ্গ হয়েছেন। শৈবলিনীর সাগ্রহ আত্মদান।

সেই পথের শেষ কি এখানে মিলবে? পাইনবনের ঘন রহস্য আজও কুয়াশা-লীন হয়ে আছে অনেক দূরের দেশে অনেক উচ্চ পর্বতের গুহায়। সেখানে বসন্ত বাতাস বয় না, কিন্তু স্মরণের সূর্য উদয় হয় চিরদিন। এখনও সেখানে সন্ধানী চাঁদ জেগে আছে। গহন রাত্রে কণ্টাকত ফার্ণের কুঞ্জে কুঞ্জে চন্দ্রিকা বিনিদ্র বাতি জ্বালায়। অস্ত যায় চাঁদ, জেগে ওঠে পূর্বাশয়ে আবার প্রতীক্ষ সূর্য। অস্ত-উদয়ের তারে গাঁথা চির জাগরূক স্মরণ শৈবালের।

মাটির বাড়ী, সৌখিন গ্রাম্যতায় পরিচ্ছন্ন। পাশে প্রস্তরমন্দির দেবতার। ত্রিশূলধারী মন্দিরের পায়ের কাছে অবলুণ্ঠিত শ্যামল তৃণ-খণ্ডে একটি বঙ্কিম পাকা দালান। অতিথির জন্য। যদি মাটির মন্দিরে রুচি না হয় গৃহবাসী যাবেন ওখানে। সেখানে অনুচরেরা স্থান পেয়েছে। গৃহকর্ত্রী থাকেন মাটির গৃহে। দরজা-জানালায় গৈরিক পতাকা। রঙিন-কঞ্চির মনোহারী বেড়া। এক-পা করে এগোতে লাগল শৈবাল কুণ্ঠিত দ্বিধায়। মৃত্যুর পদক্ষেপ কি এই মহামৌন সমাধিতে শেষ হয়েছে? জাগ্রত ক্ষুধা শান্তি পেয়েছে তার সুপ্তির চেতনা-হীনতায়?

বিজয় এগিয়ে এল। পাশে জলাধার, দুই একটি শাপলা ওঠানামা করছে স্রোতে। পা টিপে টিপে অগ্রসর হ'ল শৈবাল। অজ্ঞাত কোন সমাধি যেন এখানে। তাই নীরবতা প্রয়োজন।

এখানে পথের দুপাশে ঝাউ আছে। সন্‌সন্‌ বাজছে সঙ্গীত। কিন্তু, আনন্দ নেই এখানে। পাইনবনের শবযাত্রায় সঙ্গীতই এখানে আজও বেজে উঠেছে। জীবনের অন্তে সমাধির চির-স্তব্ধতা।

বাতাস বলে গেল অশ্রুত গুঞ্জনে আর একবার—

> স্তিমিত-দুর্বল আলো বৃক্ষশাখা চিরে
> সহসা উজ্জ্বল করে আশ্রয় আমার
> যুগান্তের বিষাদের গাঢ়তমো ঘিরে
> যেখানে সমাধিরচা তৃপ্ত বাসনার।—

সুজাতার সন্ধান পাওয়া গেল।

শৈবাল তড়িতাহত চেয়ে রইল নির্নিমেষে। ক্ষীণ দেহে সমস্ত আভরণ বর্জিত হয়েছে, আবরণ হয়েছে গৈরিক। চুল অযত্ন হ্রস্বকর্তিত। সুজাতা।

"তুমি শৈবালকে আনলে কেন, বিজয়? ও কষ্ট পেয়েছে।"

"আনব না? নিজের চোখে দেখে যাক। অযথা আশা রেখে লাভ কি?"

ঘরে ভদ্রোচিত আসবাব ছিল। আদর করে বসাল সুজাতা।

"এর কারণ কি? সংসারে কি জায়গা পেলে না? গেরুয়া ধরে নিজেকে দুর্লভ করার অর্থ বুঝি না।"

অনেকদিন আগেই বিধাতা আমার জন্য গেরুয়া রেখেছিলেন সযত্নে তুলে। আজ রহস্য রাখব না শৈবাল। রাখবার কারণ তো শেষ হয়ে গেছে। আমি আজ বলব আমার কথা। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর এখানেই পাবে।"

ঘরে আলো দিয়ে গেল। ক্ষীণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠল শুভ্রদেহী সুজাতা। বুদ্ধের সেবিকা সেই পুরাকালের সুজাতা। নির্বাণ তার অন্তরের মন্ত্র। সর্বরিক্তা ভিক্ষুণী সুজাতা।

প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা—সঙ্ঘের শরণার্থিনী সুজাতা। তক্তাপোষে শয্যায় আস্তৃত অজিনাসন। সুজাতা কাহিনী সুরু করেছে—

শৈবাল, আমার এ কাহিনী নূতন নয়। বাংলাদেশে ঘরে ঘরে এমন গল্প প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেয় অনিবার্য গতিতে। তুমি হয়তো বুঝে দেখনি সম্পন্ন গৃহবাসী তুমি। আমিই বা কি করে জানলাম, তুমি ভাবছ শৈবাল? বাইরের ঐশ্বর্যে তো আমার অভাব ছিল না? আমি জানলাম নিজে জড়িত হয়ে পড়ে।

তুমি জানতে না শৈশব থেকে মনের লক্ষ্য পেয়েছিল একজনকে। আমাদের বাড়ী আসত। ধরে নাও আমার একটা কোন শিক্ষার ভার ছিল ওর ওপরে নাম কি? ধরে নাও নাম ছিল 'অপূর্ণ।'

তাকে কেউ আমার যোগ্য মনে করেনি, তাই শাসন শিথিল ছিল। প্রেম অনায়াসে জন্ম নিল।

শৈবাল, ভালবাসা কাকে বলে জাননা। গুণবিচার করে, ভবিষ্যতে আস্থা, রেখে মনের আশ্রয় প্রীতি, প্রেম নয়। কোন এক লগ্নে কারুর সঙ্গে শুধু চোখের দৃষ্টি বিনিময় হয়। কোন অতর্কিত মুহূর্তে একটি স্পর্শ আসে। সমস্ত জীবন নূতন রূপে ফুটে ওঠে দুর্বার শক্তি দুইজন প্রাণীকে এক করে যায়। কারুর ক্ষমতা থাকে না পৃথক্‌ করে।

জানি শৈবাল, তুমি কি বলতে চাও। তুমিও আমাকে ভালবাস কিন্তু সে ভালবাসা এমন যুক্তিতর্কহীন ব্যাকুলতা নয়। আমার ছিল দৈহিক রূপ। সকলের ওপরে ছিল আমার রহস্য, যা তুমি এখনি জানবে।

আমার জীবনের একমাত্র নায়ককে যখন 'অপূর্ণ' বলেছি, তখন বুঝতেই পারছ জীবনে কোন আশা বা আয়াস তার পূর্ণ হয়নি। সে ছিল গরীবের ছেলে। বৃহৎ পরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত। অল্প বয়স থেকেই দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

ভাল থাকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি তার। অপূর্ণ থাকত উত্তর কলিকাতার অন্ধকার গলির—গলি, দুর্গন্ধ বাড়ীর ভাঙা পেছনের অংশে। বাতাস ঢুকতনা সেখানে, আকাশ ছিল সত্যাগ্রহী। শৈবাল, আজ তো দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু, কেন, কেন জাতীয় সরকার ভেঙে ফেলছে না ওইসব বাড়ী? কেন এখনও অমন গলি শহরের বুকে পঙ্কিল করে রেখেছে? মৃত্যুর যে ওখানেই বাসা।

অপূর্ণ ছিল আমারি মত দেখতে অনেকটা। আত্মীয় বলে অনেকে ভুল করে নিত। আমাদের রুচি ছিল এক। তাহ'লে বুঝবে সে কেমন ছিল।

মাঝে মাঝে অসুখ হ'ত তার। ডাক্তার দেখাবার সামর্থ ছিল না। গায়ের ওপর দিয়ে রোগ নিতে হয়েছে। তাই আমি ওকে বলতাম, আমি ডাক্তার হয়ে তোমাকে নীরোগ-সুস্থ করে তুলব। সে বলত, তাই তো পুষে রাখি অন্ততঃ, তোমাকে তো ডাক্তারির সুযোগ দিতে হ'বে।

আই. এস. সি, পাশ করে তাই ডাক্তারী পড়তে গেলাম। কিন্তু ডাক্তার হ'বার আগেই সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

ছুই-চার বছর আমার পড়ার পরে একদিন অপূর্ব আর বিছানা থেকে উঠতে পারল না। তার যক্ষ্মা হয়েছিল।

শৈবাল, এখনও ট্রাজেডির সুর লাগেনি। অল্প আহার, অতি পরিশ্রমে নরকবাসের অনিবার্য ফল ঘটল মাত্র। বাংলায় এ তো স্বতঃসিদ্ধ তথ্য। জাতীয় ত্রুটির প্রথম বলিদান চিরকালই বাংলার তারুণ্য।

কিন্তু, ট্রাজেডি এই যে, অপূর্ব বাঁচতে চাইল। তার মধ্যে যে অপূর্ব প্রতিভা ছিল, অশান্ত আবেগ সে প্রতিভার। মৃত্যুর সঙ্গে তার যে মর্মান্তিক যুদ্ধ চলল, চোখে দেখা ভিন্ন বর্ণনা চলে না। তার চলল সংগ্রাম আমার চলল সাধনা।

শৈবাল অপূর্ব চাকুরি করত। ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে চলে এল সে দার্জিলিং-এর যক্ষ্মাবাসে। তোমাদের স্যানিটেরিয়ামের নীচে, দেখেছ বোধহয় আমিই এ ব্যবস্থা করেছিলাম। কলকাতায় সে থাকলে বাড়ীর চোখ আমি এড়াতে পারতাম না।

ছুই বছর সে ছিল সেখানে। আমি শরীর খারাপের অজুহাতে পড়া ছেড়ে দার্জিলিং-এ থাকতে লাগলাম। যখন মা-বাবা যেতেন, অসুবিধা হ'ত। কলকাতায়ও থাকতে হ'ত কখনও কখনও। সে ব্যথার উপমা নেই।

আমার নিজস্ব যা-টাকা ছিল, সবই গেল। একে একে গোপনে গয়না বিক্রী করতে লাগলাম। মুক্তোর মালা ছিঁড়ে কতকগুলো মুক্তো জহুরীর দোকানে দিলাম। ছোট হয়ে গেলে মালা। কেউ লক্ষ্য করল না। হীরের আংটি হারাবার ভান করলাম।

সে সব মিথ্যা, সে ছলনার ইতিহাসে দরকার কি? কত কষ্ট পেয়েছি, কত অসাধ্যসাধন করেছি, জানিয়ে লাভ নেই কোন।

তাই শৈবাল, রোজ বিকেলে ওখানে যাওয়ার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠতাম। যদি সে একটু ভাল থাকত, আমার আনন্দ দেখতে। চোখে জল পেতে যদি অসুস্থতার বৃদ্ধি ঘটত। তাই বলেছিলাম, আমার সাধনা মৃত্যুর সাধনা।

আমার বিবাহ স্থির করায় চলে গেলাম পালিয়ে ওরি কাছে। অপূর্ব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। 'সুজাতা, তোমার ওপরে আমারি একমাত্র অধিকার কখনও ভুলোনা। জীবনকে টেনে ধরবার চেষ্টা শুধু তোমারি দিকে চেয়ে।

এক একবার পারি না, মনে হয় ছেড়ে দিই নিজেকে মৃত্যুর হাতে। তবু পৃথিবী আমাকে কিছু না দিলেও তো তোমাকে দিয়েছে।'

সেদিন মনে মনে আমার শপথ গ্রহণ করলাম। কি বলছে, শৈবাল? জৈবিকধর্মের বিরুদ্ধাচরণ এই স্বেচ্ছানিগ্রহ?

কিন্তু আমার কাছে নিগ্রহ হয়েছিল জীবনমাধুরী।

যখন যেতাম তার কাছে তখনি সে যেন অন্য জগতের জীব হয়ে গেছে। নিষেধ কণ্টকিত উপস্থিতি তার। সন্তর্পণে দূরে বসে ডেটল্‌সৌরভিত বাতাস ভয়ে ভয়ে গ্রহণ করতাম। রুমালে রক্তের ছিটে দেখে বুক কেঁপে উঠত। একটা সূক্ষ্ম অদৃশ্য জাল দু'জনকে পৃথক রেখেছিল।

তার গৌর বর্ণ হয়ে গেল সমুদ্রের ফেনার মত স্বচ্ছ ফ্যাকাশে। বড় চোখ হ'ল পটের পুতুলের মত বিদীর্ণ। হাত-পা হ'ল বায়বীয় সূক্ষ্ম। গলার মৃদুস্বর হ'ল ঘুমন্ত।

মনে হ'ত যার সঙ্গে কথা বলছি, সে সমীরজাত সত্তা মাত্র ক্রমেই আমার ধ্যান- সাধনার করগ্রাস ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসক্ষেপে তার মৃত্যুর পদধ্বনি। ভালবাসায় আমার ভয় মিশল। তবু তার ব্যাকুলতা আমাকে টেনে নিত কাছে।

শৈবাল, বিস্মিত হ'তাম আমার কেন একই অসুখ হয় না? আমিও ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু সে রোগ শরীরের নয়। একজনকে আমি ভালবেসেছিলাম, তার ভীতিপ্রদ রোগ হয়েছে। আমার যন্ত্রণা শুধু তাই নয়।

শৈবাল, জানিনা কোন যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে মিশেছ কিনা। জীবনে প্রচণ্ড লোভ হয় তাদের। জোর করে সুস্থ মানুষের অধিকার তারা দখল নিতে চায়।

ছট্‌ফট্‌ করে মরত অপূর্ণ। আমি সুস্থ, সে অসুস্থ। পুরুষের প্রেমের মাধ্যম শরীর। শরীর আছে, বাসনা আছে। অনুমতি নেই।

শুধু বলত, বারে বারে বলত, 'কতদিন চুমো খাইনা? এত কাছে বসে আছ, অথচ—' ভিখারীর মত তাকিয়ে থাকত আমার ঠোঁটের দিকে।

মৃত্যুর গহ্বরে অর্ধসমাহিত পুরুষ, আর জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে যে নারী! সমস্ত ব্যাপারটায় করুণরসের চেয়ে বীভৎসতা ছিল বেশী।

তাকে ভোলা-আমার সম্ভব নয়।' তার আসনে আর কাউকে বসানো চলে না। তাই গেরুয়ায় নিষেধ লিখে দিয়েছি। সংসারে অনেক প্রলোভন। হয়তো লুব্ধ হব। তাই চলে এসেছি সংসারের বাইরে!

শেষ দুইদিন তাকে অক্সিজেন্ দিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রথম দিন জ্ঞান ছিল। আমার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। মৃতকে আমি দেখিনি।

সরু লোহার খাটের পাশে যন্ত্র রাখা। বালিশে উঁচু করে শোয়ানো হয়েছে তাকে। নলের বাতাস অপূর্ণ নিতে পারে না। সুকুমার দেহে তার নেমেছে নীলাভ ছায়া। হাঁ করে অন্তঃশ্বাস নিতে চেষ্টা করছে। শুধু দুটি চোখে তখনও মৃত্যুর অধিকার পড়েনি।

আমার দিকে চেয়ে রইল সেই দুটি চোখ নির্নিমেষে; সে দৃষ্টি আর বাসনা চিহ্নিত নয়—বিদায়ের না-বলা কথায় করুণ। জীবনের সব অপূর্ণতা নৈরাশ্য সংগ্রামে পরাজিত সৈনিকের যন্ত্রণা তার চোখে লেখা ছিল। শৈবাল, শৈবাল, আমি তার যন্ত্রণা ভুলব কি করে!

প্রেম ভোলা যায়, প্রেমিককে ভোলা যায়। প্রেমিকের যন্ত্রণা ভোলা যায় না।

শেষ হয়ে গেল সুজাতার কাহিনী। মন্দিরে আরতি বেজে উঠল। অজিনাসন ছেড়ে উঠে এল সুজাতা।

"তোমরা বোস। আমি প্রণাম করে আসি। এখানেই খেয়ে যেতে হবে। বামনীকে বলে দিয়েছি।"

কেউ কোন কথা বলল না। পরদা পার হয়ে চলে গেল বৈরাগিণী।

বিজয় স্তব্ধতা ভগ্ন করল, "অবাক হয়ে গেলে, না? আমরাও জেনেছিলাম অনেক পরে। এখন মোহভঙ্গ হ'ল তো?"

শৈবাল উত্তর দিল, "মোহ থাকলে ভঙ্গ হ'ত। সুজাতা ভুল করেছে। আমার ভালবাসাও তারি মত যুক্তিতর্কহীন।"

বিজয় অস্থির হয়ে উঠল, "সুজাতা সংসারের মেয়ে নয়। আমার মনে হয়, ওর মন ছিল চিরউদাসীন। যক্ষ্মারোগীকে ভাল না বাসলেও বিবাগী হ'ত ও। সারা জীবন নিজেকে এমন করে কেউ সমাধি দেয়? ও সংসারে ফিরবে না। ওর মনের গঠন স্বতন্ত্র। জীবনকে ভোগের আধার করে নেওয়া ওর সাধ্য নেই। যৌবনে সন্ন্যাস!—সত্যই বুদ্ধের ভিক্ষুণী, সুজাতা।"

মন্দিরের কাছে চলে এল শৈবাল। অন্ধকার প্রদীপ্ত দেউলে রয়েছে স্থিরকামা সুজাতা। চির ব্রহ্মচর্য তার স্বয়ংবৃত।

অনাহুত বাইরে দাঁড়িয়ে রইল নিজের চিন্তাস্রোত নিয়ে। বাংলার মেয়ের দুঃখে মনীষী বিচলিত হয়েছেন যুগে যুগে। বিদ্যাসাগর বিধবার বিবাহ দিলেন। পরাশর বিধান দিয়েছেন নষ্ট, মৃত, নিরুদ্দেশ, পতিত স্বামীর পরিবর্তন গ্রহণীয়। প্রকৃতি নারীকে রমণকামা, গর্ভক্ষমা রূপে সৃষ্টি করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাই প্রকৃতি শক্তি ব্যয় করেন নারীদেহকে উদ্দীপিত করে তুলে। নারীর কাম্য নারীর প্রাপ্য থেকে তাকে সমাজ বঞ্চিত করতে পারে না। কখনই নয়।

কিন্তু, যে মেয়ে স্বেচ্ছায় ভোগ করল না? প্রকৃতির সদম্ভ ঘোষণা যার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল? যে প্রতি রোমকূপে নিবৃত্তির সাধনা করল, যার ঔদাস্যে পক্ষে পক্ষে মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হলেন প্রকৃতি। তার কথা বাঙালীর মনের কোন্ স্তরের বস্তু? সে-ও তো এই বাংলারই মেয়ে। সে কোথায় স্থান পাবে? ভোগ হ'ল না বলে ক্ষোভে মরছে যারা, তারা কি ওর কথা বুঝবে?

শৈবাল সরে এল। মন্দিরের শঙ্খরোল যেন তাকে বলল: চেয়ে দেখ না। রমণ পরম অভীষ্ট নয় কিছু। ভোগ ভিন্ন অন্য আদর্শও আছে। চিরদিনই তোমার ঊর্ধ্বে ছিল সে। প্রেমের রূপান্তর ভক্তি। প্রেমের বাইরে যে, তাকে দাও সম্ভ্রম।

আমি তোমাকে দূর থেকে বন্দনা করি।

তবু ঘুম আসে না। তবু বিজন রাত্রি মথিত করে জাগে দীর্ঘশ্বাস। জাগে ফুলে ফুলে। ফোটা ফুল ঝরে যায়। চাঁদের সীমান্তে কালিমা ঘনায়। পাইনবনের দূর পত্রসজ্জায় খুঁজে মরে স্মৃতি। সে কি ফিরবে না? মানুষের আদর্শ পথ ছেড়ে এসেছে। মানুষের মন সান্ত্বনা পায় না। তাকেই যে চাই।

যে দেশে বাতাস বয় না, যে দেশে তারা নিভে যায়, সে তমসাবিহ্বল দেশের কাহিনী জীবনে পুনশ্চরণ করে। বঞ্চিত মানুষের বঞ্চিত কাহিনী। প্রতিকার-বিহীন পুনরুক্তি। প্রতিরোধ অক্ষম পৃথিবী চেয়ে থাকে—তারও চোখে করুণ পরাজয় লেখা। কবে সে পারবে মানুষের অকারণ ধ্বংস রোধ করে ধন্য হ'তে?

যে চলে গেল, ব্যর্থতা তার নয় শুধু। পিছনে যে রয়ে গেল, তারও যে জীবন শেষ হ'ল ওখানেই। পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়শক্তি নিয়ে মানুষকে ফিরে আসতে হয় জীবনের স্বর্ণদ্বার থেকে। কারণ, সে যে মানুষ।

যে নারীর জীবনে প্রেমিক অতৃপ্ত বাসনায় অপূর্ণতায় চ'লে গেল; চ'লে গেল অনিচ্ছায়, সে নারী ভুলবে কেমন করে? উদ্যত ওষ্ঠাধরে পানপাত্র তুলবার আগেই ছায়া পড়ে মৃত্যুর। অশরীরী প্রেত তাকে অনুসরণ করে ফেরে। দ্বিতীয় প্রেমিকের চুম্বনের মধ্যে নিরক্ত-শীতল দুইটি অধরোষ্ঠ পাহারা দেয়। চির-বঞ্চিতের অতৃপ্ত কামনা। সে ভোলে কি করে?

গর্বিত হৃদয়

"I have been faithful to thee Cynara, in my fashion."

—Dowson

যে প্রৌঢ়া সুন্দরী প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষায় ছিলেন, গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রথম শ্রেণীর দিকে এগিয়ে এলেন। জানালার পার্শ্ববর্তিনী আস্তে সরে গেলেন। পরক্ষণেই দ্বারের কাছে তাঁর মুখ শুকতারার মত ফুটে উঠল।

অপরাধী একটি মুহূর্ত। প্রৌঢ়া এবং তরুণী পরস্পরের দিকে নিমেষহারা দৃষ্টি মেলে রাখলেন কিন্তু তাঁরা যেন পরস্পরের কাছে অপরাধী।

কুলি মালপত্র তুলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বুইক গাড়িতে উঠিয়ে দিল। গাড়ি দক্ষিণ বর্ত্মে রওনা হল।

ড্রাইভারটি নতুন বোধ হয়?

তরুণীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রৌঢ়া, হ্যাঁ, নবীন বড় বুড়ো হয়েছিল। দেশে চলে গেছে।

সাদা শাড়ি ধূসর বিডিং করা, সাদা জামা, ধূসর জুতো ব্যাগ—তরুণীর পোশাক। হাতে একগাছি কারুবিহীন গিনি সোনার বালা, কানে-গলায় মুক্তা।

তরুণীর পাশে অপ্রতিভ মহিলা বিলীয়মান বর্ণশোভিত গৈরিক শাড়ি ধারণ করে অস্বস্তির ভাবে বসেছেন। কী প্রণালীতে তরুণীর সঙ্গে কথা চালাবেন, যেন তিনি জানেন না।

হঠাৎ কর্তব্যহানি সম্পর্কে সজাগ তরুণী চলন্ত গাড়ির মধ্যেই প্রৌঢ়ার পদধূলি গ্রহণ করল।

থাক্ মা, থাক্।—প্রৌঢ়া বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন তাকে, কিন্তু তরুণীর সমস্ত দেহে কঠিন বাধা।

হাতাদার বনেদী বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থেমে গেলে তাঁরা নেমে এলেন নীচের হলে। আরাম-চেয়ারে খবরের কাগজ হাতে এক বৃদ্ধ, সাদা চুল মাথায়, মুখে বিষাদ।

এত দেরি হল?—তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন।

গাড়ি লেট ছিল।—প্রৌঢ়া উত্তর দিলেন।

নির্বাক তরুণী বৃদ্ধের পায়ে প্রণত হল।

থাক্, থাক্। একটু বিশ্রাম করগে। ঘরে মালপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে?—কেমন আড়ষ্টভাবে বৃদ্ধ কথা বলছেন।

হ্যাঁ। শর্মিষ্ঠা, যাও মা, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। খাবার দিতে বলি।

কাঠের পুতুলের মত শর্মিষ্ঠা দ্বিতলে উঠে গেল।

বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়া দুজনে নিস্তব্ধ ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

জানালার কাছে নীচু বুক-কেসের মধ্যে শর্মিষ্ঠা কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ট্রেনের জামা কাপড় ছাড়বার লক্ষণ নেই কোন। কতকগুলো বই তন্ন তন্ন করে সে খুঁজছে কোন বিশেষ পুস্তক। না পেয়ে মুখ তার বিষণ্ন হয়ে গেল। নীচে ফটকের পাশে হনিসাক্‌ল কুঞ্জের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলে সে উদাস হয়ে রইল।

শোনা গেল মৃদু কণ্ঠ—

"Why, here's a house, why, here's a bed
For every lust that drops its head
in sleep—"

আস্তে অপরাহ্নের আকাশে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল।

দরজার কাছে স্বর: শর্মিষ্ঠা, এখনও গাড়ির কাপড় ছাড়লে না?

এই আলমারির পুরানো বইগুলো কোথায়?

প্রৌঢ়া থেমে থেমে বললেন, সেগুলো ও ঘরে বন্ধ আছে। বাতাস বেশী বলে এই ঘরটায় তোমার বিছানা দিয়েছি। বইগুলো কি লাগবে?

কলেজে অনেক সময় পড়াবার সময়ে লাগে। আচ্ছা, দেখে নেব পরে।

কাপড় ছেড়ে এস, মা। তোমার—। উনি বসে আছেন।

প্রৌঢ়া নিজে শুভ্রবস্ত্রভূষিতা হয়েছেন, একটি কালো পাড় ভিন্ন তাঁর শাড়ি রঙের লেখা মুছে ফেলেছে।

চা-খাওয়া শেষ হবার পরে দীর্ঘ সময় যেন কাটতে চায় না। অনেক দিন পরে শর্মিষ্ঠার এ বাড়িতে পদার্পণ, কিন্তু তিনটি প্রাণী কথার সন্ধান পাচ্ছেন না। নীরব পায়ে চাকর-ঠাকুর কাজ করে যাচ্ছে। বাগানের কোকিল পর্যন্ত নীরব বৈশাখ-সন্ধ্যায়।

দীর্ঘ একটি নীরবতা ভঙ্গ করে শর্মিষ্ঠা জানাল, পরশু আমাকে চলে যেতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি কেন?

পরীক্ষার খাতা দেখা আছে। এটা ঠিক আসবার সময় নয়। তবে আপনারা আমাকে দেখতে চাইলেন—। শর্মিষ্ঠার স্বর ক্ষীণ গুঞ্জনে মিলিয়ে গেল।

স্তব্ধতার পরে মুখে হাসি জোর করে টেনে এনে প্রৌঢ়া বললেন, তা হলে তুমি মাত্র কালকের দিনটা আছ? কাল কী করবে? সকালে ড্রাইভারকে আসতে বলে দিয়েছি।

কয়েকটা জিনিসপত্র কিনব। আমাদের ওখানে সাদা শাড়ি ভাল পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধ আর্তনাদের মত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আর সাদা শাড়ি কেন মা?

প্রৌঢ়া বৃদ্ধের দিকে রূঢ় দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, সাদা শাড়ি বড় ময়লা হয়ে যায়।

কিন্তু, আমি তো সাদা রঙ ছাড়া পরি না।

ঠাকুর এই সময়ে এল: খাবার টেবিলে দেব মা?

হ্যাঁ।—দেওয়ালের গায়ের ঘড়ি দেখে গৃহিণী বললেন, শর্মিষ্ঠা শুধু চা খেয়েছে। আগেই আজ খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক, কি বল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চল।—কর্তা উঠে দাঁড়ালেন ব্যস্ত হয়ে।

খাবার টেবিলে বসামাত্র কঠিন কণ্ঠে শর্মিষ্ঠা বলল, আমার খাবার?

কেন মা? আমরা যা খাব, তুমিও তাই খাবে।

মাংসের বাটি, ভেটকি মাছ ভাজা সরিয়ে রেখে শর্মিষ্ঠা ডালের বাটিটা টেনে নিল। ঠাকুর ইলিশমাছ আস্ত রোস্ট অবস্থায় গ্যাসের উনুন থেকে থালায় সাজিয়ে আনতে আনতে থমকে গেল।

কী দিয়ে খাবে তুমি তা হলে?

কেন? এই তো ডাল আছে, তরকারি আছে—

প্রৌঢ়ার মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আমার একমাত্র ছেলে গেছে, আমি মাছ-মাংস খেতে পারছি। তুমি পার না?

শর্মিষ্ঠার কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। সে মাথা নীচু রেখে যন্ত্রচালিতের মত গ্রাস তুলতে লাগল মুখে। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া দুজনেই মাছ-মাংস ঠেলে দিলেন। ঠাকুর রোস্ট টেবিলের কাছে না এনেই ফিরিয়ে নিল।

যে বিদ্যুৎ আলোর আভা বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়াকে পচা ফলের মত স্যাঁৎসেঁতে করে তুলল, সেই আভা শর্মিষ্ঠার মুখকে স্ফটিকখণ্ডের কাঠিন্য দিল।

সকাল নটায় ভিড় ঠেলে গাড়ি চলেছে। শর্মিষ্ঠা নির্দেশ জানাল।

ওই দোকানটায় যাবে? নতুন ভাল ভাল ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর হয়েছে কলকাতায়।

ওখানেই যাই।—প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা শর্মিষ্ঠা বলছে না। আজ প্রৌঢ়া সাদা শাড়ির তুষারে আবৃত; শর্মিষ্ঠার শ্বেত বেশ সেই তুষারে নির্মম রবিরশ্মি।

একটি বড় কাপড়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামতে শর্মিষ্ঠা ক্ষিপ্রপদে নেমে গেল। প্রৌঢ়া ইতস্তত: করে অবশেষে প্রবেশ করলেন।

দোকানের মালিক এগিয়ে এলেন স্বয়ং, দ্বিধার হাসি টেনে বললেন, অনেক দিন পরে দেখা। ভাল আছেন তো? কী দেখাব?

সাদা থান। সিল্ক বা সুতি সব রকম দেখান।—শর্মিষ্ঠা আদেশ দিল।

সাদা থান! একটু পাড়ও কি—

ভদ্রলোকের বাধ-বাধ প্রশ্নের উত্তর দিল শর্মিষ্ঠা, পরে দরকারমত পাড় বসাব। থানই চাই।

ত্রস্ত কটাক্ষে প্রৌঢ়াকে একবার দেখে দোকানী কর্মচারীদের সাদা থান দেখাতে ডাকলেন।

অনেক বেলায় অনেক জিনিসপত্র কিনে ফিরল শর্মিষ্ঠা। গোলাপী পদ্মের ঝাড় এসেছে। হলের সাদা পাথরের ত্রিপদীর বুকে কলসী ভরে সাজিয়ে দিল শর্মিষ্ঠা বৃদ্ধের সামনে। তিনি বেদনাম্লান দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন।

ও-ঘরের চাবিটা? আমার কতকগুলো জিনিস দরকার।—প্রৌঢ়ার দিকে হাত বাড়াল শর্মিষ্ঠা।

কাঁপা-হাতে হাতব্যাগ থেকে চাবি বার করলেন তিনি: আগে খেয়ে নাও না মা। কাল রাত্রে ভাল খাওয়া হয় নি। আজ তোমার জন্যে নিরামিষ করেছি। খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘর খুলো।

এখনি ঘরটা খুলি। খাওয়ার পরে আমি থিয়েটার দেখতে যাব। কলকাতার থিয়েটার কতদিন দেখি নি। আপনিও চলুন না!—চাবি নিতে নিতে শর্মিষ্ঠা বলল।

না না। আমি থিয়েটার দেখি না।—প্রৌঢ়া একটু তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন।

তা হলে আমি একাই যাব। আমার খাবার ঢেকে রেখে আপনারা খেয়ে

নেবেন। কাল সকালের ট্রেনেই রওনা হব, সকালে কিন্তু খালি চা খেয়ে বার হব।

চাবির থোকা নাচাতে নাচাতে শর্মিষ্ঠা চঞ্চল পায়ে চলে গেল।

শর্মিষ্ঠার ট্রেন তখন পরের স্টেশন পেরিয়েছে। প্রৌঢ়া ফিরে এসে একখানা সরুপাড় সাদা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে স্বামীর কাছে বসলেন। বৃদ্ধ সকালের বাসী কাগজখানা হাতে করে স্থাণুর মত বসে ছিলেন একা।

স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল গৃহিণীর: হঠাৎ টেবিলে মাথা রেখে কেঁদে উঠলেন তিনি আকুল হয়ে। মাথার পাশে শর্মিষ্ঠার সাজানো পদ্মদল হাসতে লাগল গোলাপী হাসি।

ছিঃ, নির্মলা, কেঁদো না। এতক্ষণ চোখে জল এল না, এখন কেন?

বৃদ্ধের নিজের চোখ কিন্তু ততক্ষণে সজল হয়ে উঠেছে। ক্রন্দনরুদ্ধ গলায় থেমে থেমে নির্মলা বলতে লাগলেন, দেখেছ, এই ফুলগুলোই আমাদের সামনে সাজিয়ে দিয়ে গেল? এত করে ভুলে ছিলাম আজ দু দিন শুধু ওরই মুখ চেয়ে। আমি—আগের মতই রঙিন শাড়ি পরে ওকে আনতে গেলাম। আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমার সামনে থান কিনল! আমরা ওর জন্যে মাছমাংস নিয়ে খেতে বসলাম। আর ও কিনা আমাদের কথা না ভেবে একটার পর একটা অদ্ভুত কাজ করে আমাদের মনে কষ্ট দিল এত! ও যাতে ভুলে থাকে, তাই তো মন্দারের জিনিসপত্র সরিয়ে ঘরটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। ঘর খুলে তচনচ করে থিয়েটারে গিয়ে বসল! ওর কি মন নেই?

বৃদ্ধ স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, চুপ কর। কেঁদে কি লাভ? আমাদের সবই যখন গেছে, তখন ওটুকুর আশা রেখেছিলেন কেন? নিজের ছেলে যাদের গেছে, পরের মেয়ে কি তাদের আপন হয়?

চোখ মুছে নির্মলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, টেনে নিয়ে গেল সেই দোকানটায়, যেখানে মন্দার আমাদের দুজনকে কাপড় কিনে দিত। ওর মন এত শক্ত যে কোন ছায়াই নেই মন্দারের। শুনছি, যে কলেজে পড়ায়, তারই এক প্রফেসরকে নাকি আবার বিয়ে করতে পারে। যা গেছে, আমাদেরই গেল।

তাঁর স্বামী ধীরে ধীরে বললেন, বিয়ে করে তো ভাল। ছেলেমেয়ে নেই একটা। এত অল্পবয়সে কী নিয়ে থাকবে?

নির্মলা মর্মান্তিক কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আমি যে ভাবতে পারি না আমাদের মন্দারের বউ আবার অন্যকে—

নির্মলা, আমরা ওর কাছে দোষী। অমন কিডনির ব্যারাম ছিল মন্দারের। বিয়েতে নিষেধ করা আমাদের উচিত ছিল।

নির্মলার চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল। তিনি ফুলগুলো তুলে নিলেন: যাই, ফেলে দিয়ে আসি এগুলো।

স্বামী তাঁর হাত ধরলেন: না, নির্মলা। এ ফুল মন্দার ভালবাসত—সাজিয়ে দিয়ে গেছে যে মন্দারেরই বউ! ও যাই হোক, ও যে—

তাঁর গলাও এবার রুদ্ধ হয়ে গেল।

কলকাতার অনেক দূরে অন্য একটি সম্পন্ন পরিবারের বাড়ি।

এলোমেলো ঘরখানি। যে পথিক ফিরে এসেছে, সে এখনও স্থিতিলাভ করে নি। এখানে কয়েকটা বই, ওখানে দুখানা কাপড়, জুতোর বাক্স সারা ঘরে বিক্ষিপ্ত।

কোণে একটি সোফা। তরুণবয়সী ইন্‌টেলেকচুয়াল চেহারার একজন ভদ্রলোক একখানা বইয়ের পাতা উলটে দেখছেন। ঘরের মধ্যে বিভ্রান্ত পাদচারণে ভ্রাম্যমাণ সেই তরুণী।

এই বইখানা আনলে কেন, শর্মিষ্ঠা? এটা আবার তোমার পড়তে কি ভাল লাগবে? হ্যাঁ, এককালে অবশ্য এডনা সেণ্ট ভিনসেণ্ট মিলের লেখার দর ছিল। সমালোচক বলতেন, এডনা মিলের কবিতা পড়া আর নবাঙ্কুর অরণ্যে ভ্রমণ করা একই কথা। এখন আর এই ধরনের কবিতা ভাল লাগে কি?

"Ah, I am worn out—
I am wearied out—
It is too much—I am but
flesh and blood,
And I must sleep. Though
you were dead again,
I am but flesh and blood and
I must sleep."

চুপ কর, হিরণ্ময়। এডনা মিলের কবিতা ছেলেবেলায় ভাল লাগত, তাই কলকাতা থেকে পুরনো বইখানা নিয়ে এলাম।

ওঃ !—ভদ্রলোকের বাদামী ফ্রেমের ভারী চশমায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল : ছেলেবেলা মানে দু বছর আগে, না ?

শর্মিষ্ঠা কোন উত্তর দিল না। ঘুরে ঘুরে বোধহয় সে শ্রান্ত হয়েছিল, জানালার কাছে চেয়ারটায় বসল।

হিরণ্ময় বইখানা মুড়ে রেখেছিলেন। চুপ করে কিছুক্ষণ শর্মিষ্ঠার দিকে চেয়ে রইলেন। চশমার কাচ যথেষ্ট মোটা হওয়ার ফলে চোখের ভাববিকাশ দেখা যায় না।

হিরণ্ময় বললেন, তারপর ?

তারপর কলকাতায় দু বছর পরে গিয়ে দেখলাম আমার শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁদের মৃত-পুত্রের স্মৃতি সযত্নে মুছে ফেলে দিব্যি আছেন। আহার বিহার কোনটাই বদলায় নি।

তার পর ?

ওর—মন্দারের জিনিসপত্র আমাদের ঘরটায় তালা বন্ধ। শাশুড়ী রঙিন শাড়ি পরে বেড়াচ্ছেন।

হিরণ্ময় তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে বললেন, তুমি কী করলে ?

আমি চেষ্টা করলাম অন্ততঃ , দিনের জন্যও তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে। পারলাম না। ওঁরা তাকে ভুলে গেছেন—নিঃশেষে।

তুমি কি ভুল করছ না, শর্মিষ্ঠা ?

ভুল !—দৃপ্ত ভঙ্গীতে শর্মিষ্ঠা উঠে দাঁড়াল : তুমি কী বলতে চাও, আমি বুঝেছি। আমার প্রতি অনুকম্পায় ওঁরা আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছেন, না ? কিন্তু দরকার ছিল না।

দরকার ছিল না ? শর্মিষ্ঠা ?

আবার ক্ষিপ্র অশান্ত পদে শর্মিষ্ঠা পায়চারি করতে আরম্ভ করল।

না না, দরকার ছিল না। ইংরেজীর অধ্যাপক তোমার মত মূর্খ হয় না হিরণ্ময়। দেখেও কি বোঝ না, আমি ওকে ভুলে গেছি ? তাই সাদা শাড়ি পরতে বাধা নেই, নিরামিষে অরুচি নেই। ওর ঘর, ওর চলাফেরার জায়গা কিছুই আমাকে ভয় দেখাল না। ভুলে যাবার ভানের দরকার হল না আমার।

হিরণ্ময় অস্ফুটকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

"And I am desolate and sick of an old passion,—
—I have been faithful to thee Cynara ! in my fashion."

কী বলছ ?

কিছু না। তুমি বোস শর্মিষ্ঠা, এমন ছটফট করে লাভ কী ?

হিরণ্ময়, ওর মা-বাবার কাছে আমার লজ্জা শুধু এই যে, মন্দারের কিডনির অসুখ জেনেও আমি ওকে থিয়েটারে রাত জাগিয়েছি, হোটেলে খাইয়েছি। ওঁদের জন্যে আমার ওর স্মৃতিরক্ষা করা উচিত বিধবার মত। কিন্তু আমি ভুলে গেছি ওকে, আমি গ্রাহ্য করি না। আমাকে দয়ার দরকার নেই, সেইটাই দেখিয়ে এলাম।

শর্মিষ্ঠা, চুপ কর।

তুমি চুপ করে আছ, এটাই যথেষ্ট নয় ?

চুপ আমি তো চিরকাল। তোমার বিয়ের আগেও চুপ করেছিলাম। মন্দার তোমাকে নিয়ে গেল। আবার পিত্রালয়ে ফিরে এলে তিন বছর পরে। সেও তো দু বছর। এক কলেজে এক ভাষায় দুজনে পড়াই। এখনও চুপ করে আছি। আমি বড় চুপচাপ না শর্মিষ্ঠা ? মন্দার ছিল অন্য রকম—তার পছন্দ তোমার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখে গেছে, না শর্মিষ্ঠা ?

হিরণ্ময় !

কথা যখন একবার শুরু করেছি, বলে যাই। কবি আর্নেস্ট ডাওসন তাঁর পূর্বপ্রেমিকা কিনারাকে ভোলবার বহু চেষ্টা করেছিলেন। তিনিও সার্থক হন নি। তাঁরই কবিতাটা মনে পড়ে গেল।

আমার আশাবাদী, তাই ভবিষ্যতের আশায় আছি। কিন্তু শর্মিষ্ঠা, গর্বিত মন বাইরের ভান বজায় রাখতে যত কষ্ট পায়, দর্শকের কষ্ট তার চেয়ে কম হয় না।

শর্মিষ্ঠার রুক্ষ-নির্মম চোখের জ্বালার উপর শ্রাবণধারা নেমে এল। সে হিরণ্ময়ের পাশে সোফায় ভেঙে পড়ল এতক্ষণে। আত্মবিস্মৃতির দূরত্বকে প্রয়োজন হল না।

দৃঢ়প্রতীক্ষু বক্ষে নির্বিকার হিরণ্ময় শর্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করল। অশ্রুপ্লাবিত সেই মুখখানির দিকে এগিয়ে এল হিরণ্ময়ের সহানুভূতিশীল অধরোষ্ঠ। আর— দুজনের যুগ্ম অধরের দ্বারে সজাগ প্রহরা দিতে লাগল অন্য দুইখানি ছায়া-অধর নির্নিমেষে।

বেসিক ট্রেনিং

কালো লম্বা হোল্ডারে সাদা সিগারেট ধরিয়ে মিস বোস একটু গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "তারপর ?"

আধো অনাবৃত দেহা রূপসী বীরা বলে উঠল, "তার আগে ?"

মেয়েদের এই ক্লাবটিতে জমা হয়েছেন ওঁরা সন্ধ্যার পরে। মেয়েদের ক্লাব হ'লেও নিছক নিরামিষ নয়। তাহ'লে সগু আমিষ তালিকাভুক্ত মহিলারা সদস্যা থাকতেন না। বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে ওঁরা পুরুষ বন্ধুদের ডেকে থাকেন।

মিস বোস নাক দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বা'র করে বললেন, "তার আগে আমার কাছে শুনে আর কি করবে, বীরা ? ওঁকেই ডাকনা।"

যদি কোনদিন আমার কথা ভাবো তা ভেবনা। আমাকে তোমরা ভুলে যেও। সুন্দর কোন বস্তুর কথা ভেবো, যাতে তুমি আনন্দ পাবে। আমার কথা ভেবনা।

জীবনের আরম্ভ বেশ হয়েছিল। অবস্থাপন্ন ঘরের আদরিণী কন্যা। বেশ ছিলাম, বেশ ছিলাম।

চলে এলাম বৃহত্তর পরিমণ্ডলিতে। লেখাপড়া শিখলাম। শিল্পী হিসাবে নাম হ'ল। তখনি জীবনে ঝড় উঠল।

কিসের ঝড় ? বাসনা—কামনা—ঈর্ষা—দ্বন্দ্ব। ঘিরে ধরল আমাকে পুরুষ। সকলেই চাইলো। আমিও চাইলাম।

কালোপাড় গরদপরা মধ্যবয়সী মহিলা এককোণে বসে কফি খাচ্ছিলেন। তাঁকে নিয়ে গুঞ্জরণ তিনি অনুভব করতে পারলেন। এই ক্লাবটিতে তাঁর বন্ধু মৃগনয়নী তাঁকে ডেকে এনেছে। তিনি সাধারণতঃ এই ধরণের লঘুক্রিয়ায় থাকেন না।

কলিকাতায় ছবির প্রদর্শনী দেখতে কয়েকদিনের জন্য এসেছেন তিনি। চাকুরি করেন বাইরে কোন আর্ট কলেজে। তিনি শিল্পী। তাঁর জীবন একক।

মহিলা একদা সুন্দরী ছিলেন—এখনও চল্লিশের কাছে এসে সৌন্দর্যের ছায়া ধরে আছেন।

বন্ধুর নাম মৃগনয়নী হ'লেও প্রকৃত মৃগনয়নী ভদ্রমহিলা সংযুক্তা দেবী। কালোচুলের মধ্যে এক-আধটি রূপালি তার দেখা দিয়েছে। বিষাদমিশ্রিত কোমলতা তাঁর চোখে।

সমগ্র শরীরে তাঁর বাঁধনহারা স্রোত একদা যে বয়ে গেছে, তারি চিহ্ন। সে স্রোত উর্বরতা দেয়নি, দিয়েছে ধ্বংস। শরীরের বাঁকাচোরা রেখায় তারি ছাপ।

মহিলার প্রতিরোধ ভেঙে গেছে—প্রতিরোধ আর নেই। শরীরের ধ্বংস নিবারিত করবার জন্য যেটুকু প্রতিরোধ প্রয়োজন, তাও দেবার ইচ্ছা বা প্রয়াস তাঁর নেই। সময়ের স্রোতে নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছেন।

হলের অন্য দিকে তাঁকে নিয়ে জটলা চলছে। মিস বোস স্বয়ং কুমারী চল্লিশোর্ধে, কিন্তু অন্য কাউকে কুমারী দেখলে নাকি বিস্মিত হ'ন।

মিস বোস মিহিসুরে বললেন, "তাহলে সংযুক্তা শেষ পর্যন্ত চিরকুমারী রয়ে গেল। আশ্চর্য!"

তিনি নিজে চিরকুমারী থাকাতে যদি আশ্চর্য হবার কিছু না থাকে, তবে সংযুক্তা দেবীর ক্ষেত্রে কেন আশ্চর্য হ'তে হবে, অনেকেই বুঝতে পারলো না।

যাঁরা তাড়াতাড়ি বাক্যটির সমন্বয়ে চেষ্টিত হ'ল, "আশ্চর্য এই জন্যে যে, সংযুক্তা দেবীর বিয়ে তো স্থিরই হয়ে গিয়েছিল।"

কি হ'ল? হলনা কেন?

যৌবনের সেই বাঁধভাঙ্গা স্রোতে ভেসে গেলাম বহুবার। বহুবার কূলে ফিরে এলাম। আসা-যাওয়া পথে কত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ এল। ভালবাসল, গেল। রইল না কেউ।

তুমি কি চেয়েছিলে তারা থাক? হ্যাঁ—না! আমি গৃহ চেয়েছিলাম, সন্তান চেয়েছিলাম। তবু তো পেলাম না।

এবার ক্লাবগৃহ ছেড়ে আমরা চলে যাই শান্তিরাম দাস স্ট্রীটে। সংযুক্তার বাবা যখন সেখানে বাসা বাঁধলেন।

আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তাই এরা রোজগারের চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। সংযুক্তা আর্ট কলেজের শেষ ধাপে আটকে আছে। বয়স তার যথেষ্ট হয়ে গেছে। তখন সে পুরোপুরি রূপসী।

এবার গল্প বলুক আমাদের সংযুক্তার প্রতিবেশী সুষমা। বিশেষ শিক্ষার অবকাশ পায়নি সে, স্কুলে পড়াশোনা করে ম্যাট্রিক দিয়েছে মাত্র। কর্পোরেশন

স্কুলে শিক্ষাদান করে। সংসারের কাজকর্ম মেটায় বৃদ্ধা-মা আর অলস ভ্রাতৃজায়ার হাতে হাতে। সাধারণ একটি বাঙালীঘরের মেয়ে।

সুরমা বলছে—

যুক্তাদি আমাদের পাশের বাড়ী বাসা নিলেন। আর্ট কলেজের শেষ বছর ওঁর। কিন্তু ছবি-আঁকিয়ে হিসাবে নাম হয়েছে যথেষ্ট। শোবার ঘরের পাশে বারান্দায় ইজেল নিয়ে বসে থাকতেন। দূর থেকে দেখে আমরা শ্রদ্ধা করতাম, মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমাদের কোন গুণ নেই, উনি অত গুণী।

শুধু কি ছবি? হাতের কাজ কি! সেলাই, মূর্তিগড়া চমৎকার ছিল। রান্না করতেন, জলখাবার তৈরিতে ওঁর বিশেষত্ব ছিল। সেবায় জোড়া ছিল না।

আর্থিক অবস্থা আগে ভাল ছিল শুনেছিলাম। পরে অবনতি হ'ল। কিন্তু তিনি মানিয়ে চলতেন সংসারের সঙ্গে সঙ্গে।

দেখতে ভাল লাগতো ওঁকে, সুন্দরী তো ছিলেনই। লাবণ্য ছিল প্রচুর, টানা—টানা চোখর দৃষ্টি অপূর্ব। মিষ্টি গলায় কথা বলতেন আস্তে আস্তে। মাধুর্য্য কোমলতামণ্ডিত একটি মেয়ে। বিলাসিতার আয়োজন যোগানো সম্ভব ছিল না, কিন্তু সৌখিন।

শ্যাওলা রঙের টাঙাইলের পাতলা ডুরে শাড়ি পরে ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে যুক্তাদি যখন শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তখন তাঁকে অপ্সরা বলে ভ্রম করা পুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

আমাদের সঙ্গে আলাপ ছিল। প্রথমে ভয়ই করত, অমন অসামান্যার সঙ্গে আমি সামান্য কি কথা বলি? কিন্তু পরে দেখলাম মানুষটি মিশতে জানেন। আমাদের বাড়ী ওঁর প্রশংসামুখর হ'ল।

রান্নাঘরে পিঁড়ে টেনে বসেন, আমি রুটি সেঁকতে সুরু করলে চাকী বেলুন টেনে বেলে দেন রুটি, সেই হাতে, যে হাতে তুলি ধরেছেন উনি।

আমার মায়ের গায়ের পাশে বসে ঘর-সংসারের গল্প করেন হাসিমুখে। সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করেন। ঘরের লোক যেন, অতবড় নামী শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও।

কিন্তু বছরখানের মধ্যেই আমাদের বাড়ীতে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। বহু রাত্রি পর্যন্ত কারা যেন সংযুক্তার ঘরে আড্ডা জমায়? সংযুক্তার বাবা বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজের ঘরে পড়ে পড়ে আর্তনাদ করেন। দাদা বৌদিরা নির্বিকার চিত্তে ঘরে দ্বার দেয়।

লোকে কানাকানি করতে আরম্ভ করল যে সংযুক্তার টানাটানি ; পুরুষদের মনোরঞ্জন করে টাকা নিয়ে থাকে সে।

আমি কখনও বিশ্বাস করিনি এমন কথা। আমি সংযুক্তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু যখন দেখতাম সুর্মাটানা চোখে ঠোঁট লাল করে কেমন যেন নির্লজ্জ সাজে স্কুল-বারান্দায় যুক্তাদি দাঁড়িয়ে পাশের অর্ধবয়সী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসছেন, তখন ভয় হ'ত হয়তো বা লোকপ্রবাদের মধ্যে কিছু সত্য আছে।

ক্ষিতীশ বলতো, "বাবা, তোমার যুক্তাদি যে সর্বদা পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আছেন। ধন্য!" আমি যুক্তাদির পক্ষ টেনে উত্তর দিতাম, "তাতে কি? উনি অমন গুণী, ওঁর কাছে তো লোকজন আসবেই।" ক্ষিতীশ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, ওঁর কোন ভালবাসার লোক নেই? সে সহ্য করে কি ভাবে? ওঁর কাছে তো আধাবয়সী আর প্রৌঢ় লোকেরই যাতায়াত দেখি।"

কথাটা আমাকে যুক্তাদির জীবনের একটা দিক দেখাল। ওঁর কাছে ওঁর সমবয়স্ক বা তরুণ কোন যুবকের আসা যাওয়া দেখি না। বড় গাড়ী চড়ে বুড়ো লোক নামে। হাতে একাধিক আংটি পরে দুই চারজন নামকরা লেখক, শিল্পীদেরও আসতে দেখি। তবে কি যুক্তাদির জীবন প্রেমশূন্য? অথবা এই সমস্ত বিবাহিত ও সংসারী লোকেদের দ্বারা প্রেমলিপ্সা পূরণ হয়? কিন্তু তারপর?

ক্ষিতীশ আমার চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, "তুমি যদি কোনদিন অমন চালচলন দেখাতে তাহ'লে তোমাকে আমি খুন করে ফেলতাম।"

অতি দুঃখে হাসি এল, "আমার কাছে কে আসবে, ক্ষিতীশ? আমার কি আছে?"

ক্ষিতীশ চাপা আদরের স্বরে বলল, "কেন, আমিতো এসেছি। অবশ্য আমি কর্পোরেশনের হেডমাষ্টার মাত্র। গাড়ী চড়ে তোমার দোরে আসিনি।"

ক্ষিতীশের গলায় ব্যথার আভাস পেয়ে বললাম, "আমি যে আবার তোমার চেয়ে দশধাপ নীচুর মাষ্টারনী।"

"সেই আমাদের ভাল, সুষমা। আমরা যা, তাই যেন থাকি।"

ক্রমে দেখলাম যুক্তাদির বাড়ী একজনের স্থিতিকাল অধিকতর হ'তে লাগল। একহারা চেহারার মধ্যবয়সী প্রৌঢ় ব্যক্তি, প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন এককালে। বহুজন পরিচিতি তাঁর, অর্থশালী তিনি।

তাঁকে কেন্দ্র করে সংযুক্তাদির বাড়ীতে একটি আসর বসত, প্রত্যহ সন্ধ্যা-বেলায়। মক্ষিরাণীর মত মধু বিতরণ করতেন যুক্তাদি। সজাগ দৃষ্টি মেলে মধুচক্র পাহারা দিতেন রমেশ চক্রবর্তী।

বাড়ীতে মা আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ সুরমা, যুক্তার বাড়ী অত্র যাস না। রমেশ চক্রবর্তী প্রকাশ্যে বসবাস করছে। ঘরে তার বৌ, একপাল ছেলেমেয়ে আছে।"

আমি বললাম, "আমি আর যাই কোথায়? যুক্তাদি সর্বদা ব্যস্ত থাকেন আজকাল। রমেশ চক্রবর্তী যুক্তাদির বাড়ী থাকলেই ক্ষতি কি? রমেশবাবু বাড়ীতে শান্তি পান না, তাই এখানে থাকেন।"

মা বললেন, "ওসব কথা ছাড়ো, বাছা। বাড়ীওয়ালা যুক্তাদের নোটিশ দিয়ে উঠিয়ে দেবে শুনছি।"

রমেশবাবুর সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিও আসতেন। আমি ভাবতাম সংযুক্তাদি এত জনসমাগমের মধ্যে কি করে নিজের লোকটিকে চিনে নেবেন?

অতঃপর স্বর্ণপদকসহ সংযুক্তাদি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বা'র হলেন। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে গোলমাল বেধে পাড়া থেকে চলে গেলেন। ইতি।

আজকের বিশেষ অতিথি প্রসিদ্ধ শিল্পী সংযুক্তা দেবীর মনে কি শান্তিরাম দাস লেনের ছোট দোতালা বাড়ীখানি জাগছে? নীচে একটি মুদিখানা। রকের গা বেয়ে উঠে লোহার রেলিংঘেরা সিঁড়ি। এককোণে বেগুনী-ফুলুরির দোকান।

এই অভিজাত মহিলা-চক্র তাঁকে ডেকেছে তিনি গুণী বলে। পূর্বজীবনে কখনও তিনি চিন্তা করতে পারেন নি একদিন এইখানে তিনি চলে আসবেন। অনেক পথ পার হয়ে, অনেক সূর্যাস্ত দেখে। তাঁর সেই পূর্বজীবনের সাক্ষী ছিল সেই কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মেয়েটি—সুরমা।

সুরমার সঙ্গে তারপরেও আমার দেখা হয়েছিল। পথের মোড়ে মলিন বেশে দাঁড়িয়েছিল সে, কাজের পরে বাড়ী ফিরছে। কর্পোরেশন স্কুলের হেডমাষ্টার ক্ষিতীশের সঙ্গে ওর বিবাহ হয়েছে। একটি সন্তানও হয়েছে। দু'জনের রোজগারে সংসার চলে।

আমি ফিরছিলাম একটু ব্যবসায়িক কাজ সেরে। একটা বড় ছবির অর্ডার পেয়ে প্রীত ছিলাম। সুরমাকে একটু চা-খাওয়াতে ডেকে নিলাম।

সুরমা আমাকে আগের মতই ভালবাসে। কত খবর নিল সে। আমি বললাম, 'সুরমা, ক্ষিতীশকে নিয়ে কেমন আছ ?'

সুখের হাসি ভেসে এল সুরমার প্রান্ত মুখে, "খুব ভাল আছি, যুক্তাদি।"

তারপরেই কেকে কামড় দিয়ে বলল, "আপনিও তো এমনি ভাল থাকতে পারতেন।"

চমকিত হ'লাম। সুরমা বুদ্ধিমতী এমন ধারণা ছিল না। হয়তো গৃহস্থজনোচিত সাধারণ বুদ্ধি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার কি করে সম্ভব হ'ল ?

বললাম হাসির ছলে, "যাক তুমি তো সুখী, এ'তেই আমি সুখী। কিভাবে সুখকে হাতের মুঠোয় ধরলে বলতো ? কঠিন বস্তু বলেই শুনেছি। প্রেমকে বিবাহে পাওয়া শক্ত।

"আমি যে তার জন্য হাতে কলমে শিক্ষা নিয়েছিলাম সাধনার মত।"

সুরমার মুখে উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা শুনে আমি স্তম্ভিত হ'লাম, "তার মানে ?"

ছুরি-কাঁটা ছেড়ে সুরমা রেস্তোরাঁর টেবলে কনুই-এর ভর দিয়ে এগিয়ে এল,—"যুক্তাদি, আপনাকে আর কি বলবো আমি, আমার মত একটা প্রাণী ? আপনি তো মানেন সমস্ত কিছুতেই গঠনপদ্ধতি একটা থাকে। কন্‌ট্রাক্ট করতেই হয়—ধৈর্য ধরে যত নীরসই লাগুক। আমি লেগে ছিলাম একজনকেই ধরে। তাই সুখ পেয়েছি।"

ক্লাবের কলগুঞ্জরণের মধ্যে ককটেইল বিতরণ হ'তে লাগলো। সংযুক্তা দেবী একটা সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক তুলে নিলেন।

আড়ালে কথার স্রোত বইতে লাগলো, ধনশালী রমেশ চক্রবর্তী পত্নী-বিয়োগের পরে বিবাহ করলেন না কেন সংযুক্তাকে ?

এবার আমি যা বলবার বলে গল্পটি শেষ করি। বহু চেনা গল্পটার সূত্র টানতে আর ভাল লাগছে না।

রমেশ দেখলেন সংযুক্তা তাঁকে যা দিতে পারে, তিনি আগেই পেয়ে গেছেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে নূতন করে বন্ধন কেন ?

অজস্র পুরুষ আসতো সংযুক্তার দরজায়, গৃহনির্মাণের মশলা তারা আনতো না। ওখানে রমেশ চক্রবর্তী বাঁধা থাকতে অন্যে কেন স্থান পাবে ? অতএব যাদের হাতে গৃহনির্মাণের মশলা ছিল, যারা রাজমিস্ত্রী, তারা কখনই ওখানে যায়নি।

বাসিক ট্রেনিং

সংযুক্তা দেখত, অভাব নেই তার। দিনযাপন ভরে উঠেছে, নিত্য নূতন অতিথি। কেন্দ্রবিন্দু রমেশ। প্রয়াস করতে হয় না তাকে, সহজ আনন্দে দিন কেটে যায়। একজনকে অবলম্বন করে দিবারাত্রি কাটাবার নিদারুণ একঘেয়েমি সহ্য করা কঠিন। এক প্রেমে মন দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করা শক্ত। রমেশ রয়েছেন ঠিক, অন্যেরাও আসতো, আসুক না। রমেশ বিবাহিত, অতএব অন্যদের বিতাড়িত সে কেন করবে?

গঠনের পরিশ্রম নিল না সংযুক্তা প্রেমও যে গঠনসাপেক্ষ।

চলে এল ক্লান্ত দেহে হোটেলের ঘরে সংযুক্তা। কাল চলে যাবে কর্মস্থলে। বড় চাকুরী করে সে, অর্থের অভাব নেই।

জামা-কাপড় খুলে সংযুক্তা প্রসাধন-টেবিলের কাছে দাঁড়াল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, এমনি কত প্রতিষ্ঠান তাকে অভিনন্দন জানাবে! কত দিন! কত হোটেলের ঘরে রাত যাপন করে ফিরে যাবে সে আর এক পান্থশালায়। শূন্য সে ঘর—একটি শিশুর হাসি নেই, একটি প্রেমের দৃষ্টি নেই। অথচ, জীবন তাকে কি না দিয়েছে! যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিভা।

বিছানায় শুয়ে পড়ল সংযুক্তা—কেন এমন ব্যর্থ হ'ল সে? দুইচোখে শ্রান্ত নিদ্রার আড়ালে স্বপ্ন দেখল সংযুক্তা—সে অনেকগুলি ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে ছোট হয়ে কাজ করে চলেছে। মাটি দিয়ে বেদঝরা কাজ। ইট-সুরকি গেঁথে একখানা গৃহনির্মাণ করছে তারা—বিরাট ইমারত গড়ে তুলবার পণ নিয়ে।

ওঃ, কি কষ্ট! মাথার উপর সূর্য, পায়ের নীচে গরম বালি। একঘেয়ে কাজের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ বিশ্রাম চায়। ভাল লাগে না আর!

ভাল না লাগলেও যে করে যেতে হবে।

সব মেয়ের জীবনের প্রথম শিক্ষাই এই—হাতে কলমে নির্মাণ-কৌশলের সাধনা করা।

ছোট মেয়ে হয়ে সংযুক্তা কাজ করে যেতে লাগলো।

———